# রবীন্দ্র-রচনাবলী

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

## অষ্টাদশ খণ্ড

বিশ্বভারতী
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

## অষ্টাদশ খণ্ড

ও

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

## সূচী

(ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ড)

# প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডের (সুলভ ষোড়শ খণ্ডের) নিবেদন-এ বলা হইয়াছিল: 'পূর্বপ্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গ্রন্থের উদ্‌বৃত্ত রচনা এবং কিছু অগ্রন্থিত রচনা বর্তমান খণ্ডে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংগ্রহের কাজ চলিতেছে এবং তাহা খণ্ডশ প্রকাশের আয়োজনও হইতেছে।'

অগ্রন্থিত রচনাগুলি প্রকাশ করিবার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে ঊনত্রিংশ এবং ত্রিংশ খণ্ড একত্রে বর্তমানে সুলভ সপ্তদশ খণ্ড রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। একত্রিংশ খণ্ড এবং সুলভ ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ডের সূচী লইয়া সুলভ অষ্টাদশ প্রকাশিত হইল।

সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের বিবরণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে সংকলিত হইয়াছে। অগ্রন্থিত রচনা -সংবলিত রেক্সিন বাঁধাই রচনাবলী সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলীর নির্দেশানুযায়ী গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। বর্তমান সুলভ সংস্করণ অষ্টাদশ খণ্ডেও উক্ত গ্রন্থপরিচয় সংকলিত হইল : তন্মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন সংযোজন শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তায় যুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে।

# বিষয়সূচী

# চিত্রসূচী

# কবিতা

## ব্যক্তিপ্রসঙ্গ

১

১

## জগদীশচন্দ্র বসু

জয় হোক তব জয়!
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়!
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।

জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টিকা।
অবারিত গতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।
দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।

মাঘ ১৩০৯

মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

২

## জগদীশচন্দ্র বসু

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৪

৩

## নমস্কার

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান

চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
যার লাগি নরদেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকটযাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়— সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণকরে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মতো? জয় তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়—
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা! কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল!
মোছ্ রে দুর্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল॥

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য-পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক-পরে
ছায়ার মতন! শাস্তি! শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর—
কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,
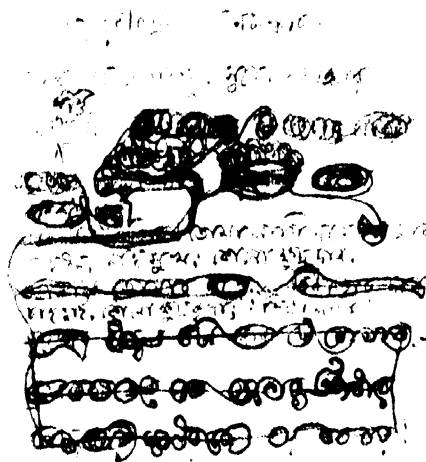
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার

পাণ্ডুলিপিচিত্র

দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত-প্রায়—
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্যকারাগারে॥

বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান-মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝংকার—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার॥

তার পরে তাঁরে নমি, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে;
যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, 'দুঃখ কিছু নয়—
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার!
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলা শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।'

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩১৪

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৪

৪

## • নন্দলাল বসু

ওঁ

শ্রীমান নন্দলাল বসু
পরম কল্যাণীয়েষু

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী চিত্ত।
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
জোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতা আশিসমন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে—
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখো অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ!
তাই তো কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।
চিরসুন্দরে করো গো তোমার
রেখাবন্ধনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক তব তুলি
চির রস-নিষ্যন্দী।

শান্তিনিকেতন
১২ বৈশাখ ১৩২১

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৫

## • নন্দলাল বসু

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু,

রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার
সে গোপন কক্ষে জানি জনম তোমার।
সেথা হতে রচিতেছ রূপের যে নীড়,
মরুপথশ্রান্ত সেথা করিতেছে ভিড়।

৩. ১২. ৪০
শান্তিনিকেতন

প্রবাসী
মাঘ ১৩৪৮

৬

## চার্লস অ্যান্ড্রুজের প্রতি

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু, এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার,
হে বন্ধু, গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছ তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার।
হে বন্ধু, প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

[ এপ্রিল ১৯১৪ ]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
শ্রাবণ ১৮৩৬ শক। ১৩২১ বঙ্গাব্দ

৭

## • প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রেম রসায়নে, ওগো সর্বজনপ্রিয়
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৩ ডিসেম্বর ১৯৩২

৮

## • রামমোহন রায়

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু-অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্‌বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

The Student's Rammohan Centenary Volume
Calcutta 1934

৯

## দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।

[ ১৩৩২ ]

১০

## • চিত্তরঞ্জন দাশ

স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে—
এসো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদীতে।

১৬ জুন ১৯৩৫

আনন্দবাজার পত্রিকা
১ আষাঢ় ১৩৪২

১১

## • আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একদা তোমার নামে সরস্বতী
রাখিলা স্বাক্ষর,
তোমার জীবন তাঁহার মহিমা
ঘোষিল নিরন্তর।
এ-মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত
করুক তারি জয়,
তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব
হউক অক্ষয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৫ আষাঢ় ১৩৪২

১২

## • আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বাঙালির চিত্তক্ষেত্রে, আশুতোষ
বিদ্যার সারথি,
তোমারে আপন নামে সম্মানিত
করেছে ভারতী।

প্রবল প্রভাবে তব বঙ্গবাণী
বাহনের রথ
জ্ঞানঅন্ন বিতরণে লভিয়াছে
অন্তরের পথ
তব জন্মভূমিতলে। কবি সেই
বাণীর প্রসাদ
পাঠায় উদ্দেশে তব বঙ্গজননীর
আশীর্বাদ।

[ বৈশাখ ১৩৪৬ ]

আনন্দবাজার পত্রিকা
১১ জৈষ্ঠ ১৩৪৬

১৩

## পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা

প্রাণঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।

হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার
ক্ষালন করিবে তুমি সংকল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার।

মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দিরপ্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশমাতার,
তোমারে জানাই নমস্কার।

নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী,
নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে জীবেরে হানি,
তারে তুমি প্রাণমূল্য দিয়ে আপনার
ধর্মলোভী হাত হতে করিবে উদ্ধার—
তোমারে জানাই নমস্কার।

শান্তিনিকেতন
১৫ ভাদ্র ১৩৪২

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২

১৪

## ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্‌বরেষু

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হতে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্য-রাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া— শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মোহান্ত পুরুষ—
তমিস্রের পার হতে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিকসীমাপ্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হতে উদ্‌বারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যসুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।
মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি,
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখিডোর।

১ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

আনন্দবাজার পত্রিকা
৪ পৌষ ১৩৪২

প্রবাসী
মাঘ ১৩৪২

১৫

## পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ-জগতে;
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

প্রবাসী
ফাল্গুন ১৩৪২

১৬

## বিধুশেখর ভট্টাচার্য

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য সুহৃদ্‌বরেষু

বিদ্যার তপস্বী তুমি। আজ তুমি যশস্বী ভারতে;
কবি তব জয়মাল্য সঁপি দিল তব জয়রথে।
এই আশীর্বাদ করি :— তব যাত্রা হোক্ অগ্রসর
অপূর্ব কীর্তির পথে উত্তরিয়া দেশদেশান্তর
দূর হতে দূরে। একদিন যবে অখ্যাত নিভৃতে
স্তব্ধ ছিলে, অন্তর্লীন আনন্দের অদৃশ্য রশ্মিতে
সিদ্ধি ছিল মহীয়সী; ভারতীর প্রসাদবৃষ্টিতে
ছিল তব পুরস্কৃতি, ছিল না তা লোকের দৃষ্টিতে।
জ্ঞানের প্রদীপ তব দীপ্ত ছিল ধ্যানের আড়ালে
নিষ্কম্প আলোকে। আজ জনারণ্যে চরণ বাড়ালে,
সেথা পরিচয় লাগি নাম মাগে উপাধির সীমা,
সেথা মহিমার চেয়ে মানে লোকে চিহ্নের গরিমা।
চিহ্ন না রহিতে তবু তোমারে চিনিয়াছিল যারা
তাদের সম্মানমাল্য জনতার কাছে মূল্যহারা।
যেথা যাহা প্রয়োজন তাই দিন সৌভাগ্য-বিধাতা,
পদবীর পরিমাপে হয় যদি হোক্ উচ্চ মাথা।
বিশ্বে তুমি দৃশ্য হও ভালে বহি রাজদত্ত টিকা,
বন্ধুচিত্তে থাকো লয়ে নির্লাঞ্ছন আত্মালোকশিখা॥

বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১২ মাঘ ১৩৪২

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২

১৭

## শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

[মাঘ ১৩৪৪]

ভারতবর্ষ
ফাল্গুন ১৩৪৪

১৮

## হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

জীবনভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত-পাথেয়,
সংসারযাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক,
জরা-আচ্ছাদনতলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক।
নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।

২ মাঘ ১৩৪৪

প্রবাসী
ফাল্গুন ১৩৪৪

১৯

## বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তি শয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি,
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পুরায়েছ হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নব যুগসাহিত্যের উৎস উঠি মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ-বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গনি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

শনিবারের চিঠি
আষাঢ় ১৩৪৫

## ২০

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে-উপবনে
নব উদ্‌বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি করিব তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদসিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।

২৪ ভাদ্র ১৩৪৫

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫

## ২১

# জলধর

বাঙালির প্রীতি অর্ঘ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।

আজি সংসারের পারে, দিনান্তের অস্তাচল হতে
প্রশান্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অন্তিম আলোতে।

পুরী
২৬.৪.৩৯

ভারতবর্ষ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

২২

## কল্যাণীয় রথীন্দ্রনাথ

মধ্যপথে জীবনের মধ্য দিনে
উত্তরিলে আজি; এই পথ নিয়েছিলে চিনে,
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে
দূরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোগের আয়োজন,
ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।
অন্তরেতে দিনে দিনে হয়েছে সঞ্চিত
পূজার নৈবেদ্য-অবশেষ,
যে পূজায় তব দেশ
তোমারে দিয়েছে দেখা দরিদ্র দেবতা রূপে
আসীন ধূলির স্তূপে
অসম্মানে অবজ্ঞায়।
সঁপেছ জীবন তব অর্ঘ্য তাঁর পায়ের তলায়।
তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিলে সমর্পিতে
আমারি খ্যাতিতে।
তোমার সকল চিত্তে,
সব বিত্তে
ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে,
তার লাগি যশ না'ই পেলে।
কর্মের যেখানে উচ্চদাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে একপাশে।
মানবের ইতিহাসে
যে-সকল খ্যাতনাম বহিতেছে উজ্জ্বল অক্ষর
তাদের অজানা লিপিকর
আপনার অকীর্তিত জীবনের হোমাগ্নিশিখায়
লাগায় রঙের দীপ্তি সে নাম-লিখায়।
প্রগল্‌ভ জনতা যত দেয় পুরস্কার
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান নিভৃতে নীরব বিধাতার।

মন্দগতি গেছে কত দিন
মন্থর দৈন্যের ভারে কৃচ্ছ্রশীর্ণ বিশ্রামবিহীন।
অকরুণ সংসারের দুঃখ তাপ শোক
যাত্রাপথে ছায়াচ্ছন্ন করেছে আলোক
বারংবার,
অকারণ প্রতিকূলতার
পেয়েছ আঘাত
অকস্মাৎ;
দুর্যোগের কুটিল ভ্রূকুটি ক্ষণে ক্ষণে
অবসাদ ঘনায়েছে কর্মের লগনে।
ভাগ্যের করুণা কাজ করে
নির্মম ঔদাস্যবেশে আকাঙ্ক্ষার দূর অগোচরে,
বিধাতার প্রত্যাশিত বর
প্রতিক্ষণে সেবা চাহে, দেয় শুধু সন্দিগ্ধ উত্তর!
সফল ভাবীর জাগরণ
ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশে যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্‌বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সংকেতে।
অবশেষে অঙ্কুরের দেখা মেলে কৃষিদীর্ণ ক্ষেতে,
প্রসন্ন অঘ্রানে
সোনার আশ্বাস লাগে ধানে।
প্রৌঢ় সেই শরতের সফল দিনের জয়ধ্বনি
অন্তর-আকাশ তব ভরুক আপনি
ঊর্ধ্ব হতে
আনন্দের স্রোতে।
সম্পূর্ণ করিবে তারে বন্ধুদের বাহিরের দান
স্নেহের সম্মান।
বিদায়প্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র-'পরে॥

শান্তিনিকেতন
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

২৩

## • কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বন্ধু, হে সাহিত্যের সাথি,
আসিছে আসন্ন হয়ে রাতি।

আছি দোঁহে দিনান্তের প্রদোষচ্ছায়ায়
পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়।
পথে দীপ ধ'রে আছে জানি না সে কোন্ শুকতারা
কোন্ প্রভাতের কূলে বিদায়ের যাত্রা হবে সারা।
মায়াবিজড়িত এই জীবনের স্বপ্নরাজ্য হতে
চির জাগরণ হবে পূর্ণের আলোতে—
মৃত্যুর আনন্দরূপ এ আশ্বাসে অন্তিম আঁধারে
দেখা দিক্ এ জন্মের দ্বিধাদ্বন্দ্ব পারে।

ইতি ১৭. ১. ৪১ সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী
আশ্বিন ১৩৪৮

# ২

# স্ফুলিঙ্গ

১

প্রথম পাতাখানি মেলেছে শতদল
তুলেছে আকাশের দিকে,
রবির কর তাহে শুভ সমুজ্জ্বল
আশিস লিপি দিল লিখে।

জোড়াসাঁকো
৪ শ্রাবণ ১৩১২

২

লিখব তোমার রঙিন পাতায় কোন্ বারতা?
রঙের তুলি পাব কোথায়?
সে রঙ তো নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয় তলে
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা?
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা?

বন্ধু তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা?
নাই যে আমার ছলা-কলা।
সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠল বেজে,
একলা কেবল জানে সে-যে মোর দেবতা।
কেমন করে করব বাহির মনের কথা?

শান্তিনিকেতন। বোলপুর
১১ আষাঢ় ১৩২১

৩

কলাবিদ্যা কুঞ্জে-কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ ফল
ভুঞ্জ তুমি রাত্রিদিন আনন্দে চঞ্চল।
কীর্তিতে রবিরে তুমি করো সমাচ্ছন্ন
লোমশ তুলিকা তব হোক ধন্য ধন্য।
সিন্ধুপারে দ্বীপতটে উচ্চ জয়নাদে
খ্যাতি যাক এক লম্ফে বায়ুর প্রাসাদে
রবি করে আশীর্বাদ। চির-আয়ুষ্মান
রবি-সুত তোমারে না দিক দৃষ্টিদান।

[১ বৈশাখ ১৩২২]
'রবিতীর্থে' (১৩৬৫)

জড়ায়ে রহে সে মাধুরী মিশায়ে
তোমাদের দিন-রাতিতে।

যে মিলনমালা বন্ধুজনেরে
গন্ধ দিতেছে মিলায়ে,
দেশবিদেশের অতিথি
নিয়ে যায় তার প্রতীতি,
আমি দূর হতে কবির ছন্দ
দিনু তার সাথে মিলায়ে॥

১০ ফাল্গুন
১৯৩৬

## ১২

পশ্চিম দিকের প্রান্তে ম্লায়মান রবি
হেরিতেছে ধরণীর গোধূলির ছবি।
সেথা তব বাতায়নতলে
আরতির দীপশিখা জ্বলে,
রবি সেই স্থির শিখা পর
বিদায়ের আশীর্বাদে মিলাইল কর।

শান্তিনিকেতন
২২ অক্টোবর
১৯৩৬

## ১৩

পরিণয় বার্ষিকী
শ্রীমতী রানী ও শ্রীমান প্রশান্ত

মিলনের রথ চলে জীবনের
পথে দিনেরাতে
বৎসরে বৎসরে আসে কালের
নূতন সীমানাতে,
চিরযাত্রী ঋতু যথা বসন্তের
আনন্দ মন্দিরে
ফাল্গুনে ফাল্গুনে আনে মাধুরীর
অর্ঘ্য ফিরে ফিরে॥

১৪ ফাল্গুন, ১৩৪৫

১৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণী ও প্রশান্ত

বর্ষ পরে বর্ষ গেছে চ'লে
ছন্দ গাঁথিয়াছি আমি তোমাদের মিলনমঙ্গলে।
এবার দিনের অন্তে বিরল ভাষার আশীর্বাণী
রবির স্নেহের স্পর্শ আনি
পশ্চিমের ক্লান্ত রশ্মি হতে
যোগ দিল তোমাদের আনন্দিত গৃহের আলোতে।

কবি

১৫ ফাল্গুন, ১৩৪৭

১৫

অন্তরে মিলনপুষ্প
সৌন্দর্যে ফুটুক,
সংসারে কল্যাণ ফলে
ফলিয়া উঠুক।

১১ আশ্বিন ১৩৩০

১৬

খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলনা দিয়ে দিয়ে গেনু ভরি।
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়।

২ ফাল্গুন ১৩৩২

'সমকালীন' বৈশাখ ১৩৬৬

১৭

পূর্বের দিগন্তমূলে
অপূর্বের ললাটের পর
পশ্চিম প্রান্তের রবি
আশিসিল প্রসারিয়া কর।

৬. ১৯২৫

১৮

নিরুদ্দেশ

শ্রীমান দিলীপকুমারের উদ্দেশে—

বহুদিন কেন তব সহাস্য
দেখি নি অমল কমল আস্য,

তব মুখ হতে স্বরসুধাস্রোতে
শুনি নি সরস ভাবের ভাষ্য!

কেন যে তোমার এ ঔদাস্য
অবশ্য ক'রে লিখো লিখো মোরে
কারণটা যদি হয় প্রকাশ্য।

সুহৃজ্জনের বিস্মরণের—
মন হতে তারে নিঃসারণের—
চর্চায় আজি হলে তুমি রাজি
এ কথা নেহাত অবিশ্বাস্য।

ইতি ৫ মাঘ
১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

## ১৯

তব জীবনের গ্রন্থখানিতে
প্রতিদিন হোক্ লিখা,
মধুর ছন্দে গভীর বাণীতে
ভরে দিক্ লেখনিকা।

৭ ফাল্গুন
১৯২৯

শারদীয় দেশ ১৩৯২

## ২০

কল্যাণীয়া
তনু,
অন্তরে তব স্নিগ্ধ মাধুরী পুঞ্জিত,
বাহিরে প্রকাশ সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মুগ্ধ মধুপ মিষ্ট রসের গন্ধে সে।
রবি দাদারে যে ভুলালে তোমার নাতিত্বে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
সেই কথাটুকু গাঁথি দিল এই ছন্দে সে।

১২ ফেব্রুয়ারি
১৯৩০

## ২১

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা-শৃঙ্খলে
সাধ্য আছে কার?
সত্যের বন্ধন পরো, সে বন্ধন প্রেমমন্ত্র বলে
করো অলংকার।

জীবন-বীণার তার অশিথিল শক্তি দিয়ে বাঁধো,
দিনেরাত্রে সুখে-দুঃখে আলোয় আঁধারে তুমি সাধো
মৃত্যুহীন প্রাণের ঝংকার।

২৪ মার্চ [১৯৩১]

## ২২

আশীর্বাদপত্রী
শ্রীমান প্রেমোৎপল
শ্রীমতী অমিয়া
বিকশি কল্যাণবৃন্তে যুগলের হিয়া
অন্তরে অমর হোক প্রেমের অমিয়া।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮

## ২৩

আকাশে চেয়ে আলোক-বর
মাগিল যবে তরুণ চাঁদ,
রবির কর শীতল হয়ে
করিল তারে আশীর্বাদ।

১২ ফাল্গুন
১৩৩৮

## ২৪

হে কল্যাণী রেবা,
তোমার জীবনধারা
বহে যাক আত্মহারা,
ক'রে যাক সংসারের সেবা।
তোমার নির্মল প্রাণ
করুক মাধুরী দান
ক্ষতি তব যা করুক যে বা।
হে কল্যাণী রেবা।

২৭ ভাদ্র ১৩৩৯
দেশ, ২৭ বৈশাখ ১৩৬৫

## ২৫

জীবনের তপস্যায় এই লক্ষ্য মনে দিয়ো রেখে
স্বর্গেরে বাঁচাতে হবে দানবের আক্রমণ থেকে॥

৩০ ভাদ্র ১৩৩৯

২৬

তোমার লেখনী যেন ন্যায়দণ্ড ধরে
শত্রু মিত্র নির্বিভেদে সকলের 'পরে।
স্বজাতির সিংহাসন উচ্চ করি গড়ো,
সেই সঙ্গে মনে রেখো সত্য আরো বড়ো।
স্বদেশেরে চাও যদি তারো ঊর্ধ্বে ওঠো,
কোরো না দেশের কাছে মানুষেরে ছোটো।

উদয়ন
দোল ১৩৩৯

আনন্দবাজার পত্রিকা
১২ মার্চ ১৯৩৩

২৭

মোহন কণ্ঠ সুরের ধারায় যখন বাজে
বাহির ভুবন তখন হারায় গহন মাঝে।
বিশ্ব তখন নিজেরে ভুলায়
আকাশের বাণী ধরার ধুলায়
ধরে অপরূপ নব নব কায়
নবীন সাজে।

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

২৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নাই হল চাক্ষুষ পরিচয়,
মনে মনে না দেখেও দেখা হয়।
অদৃশ্য পথতলে নাই মানা
কল্পনা যে আকাশে মেলে ডানা।
বাণীর সে মানসিক পথ বেয়ে
আশীর্বচনখানি যাক ধেয়ে।

শান্তিনিকেতন
১৬ বৈশাখ ১৩৪১

দেশ, শারদীয় ১৩৫৮

২৯

আমার নামের আখরে জড়ায়ে
আশীর্বচনখানি,
তোমার খাতার পাতায় দিলাম আনি।

১৫ সেপ্টেম্বর
১৯৩৫

৩০

কল্যাণীয়া শ্রীমতী উমা চন্দ

হে অপরিচিতা, লিখিয়া আমার নাম
আশীর্বাদের সেতুখানি রচিলাম।

২৪ নভেম্বর
১৯৩৪ [১৯৩৫?]

৩১

কল্যাণীয় শ্রীমান কনক ও কল্যাণীয়া লীলার
শুভ পরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ—

দুর্গম সংসার-পথে আজ হতে, হে যুগল যাত্রী,
প্রেমের পাথেয় নিয়ে পূর্ণপ্রাণে চলো দিনরাত্রি।
দুঃখে মিলাক দাহ, সুখের ঘুচুক মোহধন্ধ,
আঘাতে সংঘাতে থাক অবিছিন্ন মিলনের বন্ধ।

২৫ চৈত্র ১৩৪২

৩২

আমি তোমার শ্যালী ক্ষুদ্রতমা
আমার শক্তি ক্ষুদ্র অতি কোরো আমায় ক্ষমা।
ইচ্ছে তোমার হেঁসেলঘরে ভোজের আলো জ্বালাই
পাঠিয়ে দিলেম তাই
কাঠকয়লা কেরোসিন ঘুঁটে দেশালাই।
জমবে যখন ছাই
তাহার জন্যে যে জিনিসটা চাই
আমার মুখে পায় না শোভা গ্রাম্য তার ভাষাটা,
দাদামশায় দিলেন লিখে, তাহারে কয় 'ঝাঁটা'।

[বৈশাখ ১৩৪৩?]

৩৩

কল্যাণীয়া
শ্রীমতী দেবরাণী দেবী

যুগলমিলনমন্ত্রে নব স্বর্গলোক
নবীন জীবনে তব আবির্ভূত হোক।
কল্যাণের ধ্রুবতারা
জাগুক নিমেষহারা
থাক্ সেথা সমুজ্জ্বল প্রেমের আলোক।

নূতন সংসারখানি
বিধাতার আশীর্বাণী
বহন করুক নিত্য অভয় অশোক।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৪

৩৪

শোভনা

অস্তরবি-কিরণে তব জীবন-শতদল
মুদিল তার আঁখি।
মরমে যাহা ব্যাপ্ত ছিল স্নিগ্ধ পরিমল
মরণে নিল ঢাকি।

নিয়ে গেল সে বিদায়কালে মোদের আঁখিজল
মাধুরী-সুধা সাথে।
নূতন লোকে শোভনারূপ জাগিবে উজ্জ্বল
বিমল নবপ্রাতে।

[জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪

৩৫

তোমরা যুগল প্রেমে রচিতেছ যে আশ্রমখানি
আমি কবি তার পরে দিনু মোর আশীর্বাদ আনি।
মিলন সুন্দর হোক্ সংসারের বাধা হোক্ দূর
জীবন-যাত্রার পথ হোক্ শুভ হোক্ অবন্ধুর।

শান্তিনিকেতন
১২ জুন ১৯৩৬

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮)

৩৬

উদয়পথের তরুণ পথিক তুমি
অস্তপথের রবির স্নেহের কর
আশিস রাখিল নবজীবনের পর
তোমার ললাট চুমি।

শান্তিনিকেতন
১৫। ১। ৩৮

৩৭

শ্রীমতী উর্ম্মি দেবী কল্যাণীয়াসু
নবমিলন-পূর্ণিমায়
উর্ম্মি উঠে উচ্ছলি,

সুরলোকের আশিস নামে
　　　　আলোকে তারে উজ্জ্বলি'।
প্রেমারতির শঙ্খসম
　　　　ধ্বনিত করে চন্দ্রমা
নীরব রবে শুভোৎসবে
　　　　প্রজাপতির বন্দনা।

২৫ ফাল্গুন, ১৩৪৪

প্রবাসী

শ্রাবণ ১৩৪৮

৩৮

হাবলুবাবুর মন পাব ব'লে
　　　　করি চকোলেট্ আমদানি,
আজ শুধু মোর নামখানা দিয়ে
　　　　সাজালেম তাঁর নামদানি।

১১. ৩. ৩৮

দেশ, শারদীয় ১৩৫১

৩৯

কল্যাণীয় শ্রীমান্ সরিৎচন্দ্রের শুভ পরিণয়
উপলক্ষে আশীর্বাদ—

যুগলে তোমরা করো এক-চিতে
　　নব সংসার সৃষ্টি,
তাহে বিধাতার প্রসাদ-অমৃতে
　　হোক কল্যাণ বৃষ্টি।
চিরদিন ভ'রে অক্ষয় হোক্
　　প্রেমের মধুর বন্ধ,
নবজীবনের জ্বলুক আলোক
　　মিলনের চিরানন্দ।

কালিম্পং

৩০ বৈশাখ ১৩৪৫

৪০

ভোরের বেলায় যে জন পাঠালে রঙিন মেঘের পাঁতি
আজ সে কি সাড়া দিয়েছে তোমায় শুভ্র আলোর সাথী।

শান্তিনিকেতন

অগস্ট ১৯৩৮

৪১

লেখন আমার ম্লান হয়ে আসে
অক্ষরে
এখন গোপনে ফুটিয়া উঠিছে,
অন্তরে।
অনাহত বাণী মনে তুলে নিয়ে
রেখো তারে তব স্মরণে
স্থায়ী হয়ে যাবে যখন সে বাণী
তরিয়া যাইবে মরণে।

৩০। ৬। ৪৫
বর্তমান, শারদীয় ১৩৯৮

৪২

যূথিকা,
এসেছিলে জীবনের আনন্দ-দূতিকা
সহসা তোমারে যবে করিল হরণ
নির্ম্মম মরণ
পারে নি করিতে তবু চুরি
তরুণ প্রাণের তব করুণ মাধুরী,
'আজো রেখে গেছে তার চরম সৌরভ
চিত্তলোকে স্মৃতির গৌরব।

[ পৌষ ১৩৪৫ ]
'কবি প্রণাম' অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

৪৩

মহিষী
তোমার দুটি হাতের সেবা
জানি না মোরে পাঠাল কেবা
যখন হল বেলার অবসান—
দিবস যখন আলোকহারা
তখন এসে সন্ধ্যাতারা
দিয়েছে তারে পরশ-সম্মান।
বিক্রমজিৎ

৩ বৈশাখ ১৩৪৬
দেশ
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

## ৪৪

কল্যাণীয়াসু

পাঠালে এ যে আমসত্ত্ব
জানি গো জানি তার তত্ত্ব
শুধু কি তাতে আমেরি রস রহে?
যতন করি কোমল হাতে
মিশায়ে দিলে তাহারি সাথে
সে সুধারস দৃশ্য যাহা নহে।
রসনা যবে বাহির হয়ে রস চয়নে রতা
অন্তরেতে প্রবেশ করে নিবিড় মধুরতা।

উত্তরায়ণ
২। ৭। ১৯৩৯

## ৪৫

কল্যাণভাজন
নন্দিনী ও অজিত,
তোমরা দুজনে একমনা
করিবে রচনা
তোমাদের নূতন সংসার।
সেথা নিত্য মুক্ত রবে দ্বার
বিশ্বের আতিথ্য নিবেদনে
তোমাদের অকৃপণ মনে।
পুণ্য দীপ রবে জ্বালা;
দেবতার নৈবেদ্যের ডালা
পূজার কুসুমে পূর্ণ হবে;
চতুর্দিকে বাজিবে নীরবে
গম্ভীর মধুর
পরিপূর্ণ আনন্দের সুর,
বাজিবে কল্যাণ শঙ্খধ্বনি
দিবসরজনী॥

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দাদামশায়

১৪ই পৌষ
১৩৪৬

## ৪৬

কল্যাণীয় জয়ন্ত
তোমার নামের সাথে
জড়িত জয়ের আশীর্বাদ

তোমার জীবন মাঝে
পাও জয়লক্ষ্মীর প্রসাদ।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

৪৭

যে মিলনে সংসারের সুখদুঃখ সহস্র ধারায়
আনন্দসমুদ্র মাঝে দ্বন্দ্ব ভুলে আপনা হারায়,
সে মিলন পূর্ণ হোক তোমাদের যুগল জীবনে
লহো এই আশীর্বাদ তব শুভদৃষ্টির লগনে।

[কালিম্পং ২১ জুন ১৯৪০]
দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২

৪৮

বাঙাল যখন আসে
মোর গৃহদ্বারে,
নূতন লেখার দাবি
লয়ে বারে বারে;
আমি তাঁরে হেঁকে বলি
সরোষ গলায়—
শেষ দাঁড়ি টানিয়াছি
কাব্যের কলায়।

মনে মনে হাসে,
তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
তারপর এ কী?
সকালে উঠিয়া দেখি
নির্লজ্জ লাইনগুলো যত
বাহির হইয়া আসে গুহা হতে নির্ঝরের মতো।
পশ্চিমবঙ্গের কবি দেখিলাম মোর
বাঙালের মতো নাই জেদের অপ্রতিহত জোর।

[ উদয়ন ]
২রা ডিসেম্বর ১৯৪০
প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭

৪৯

সুধীর বাঙাল গেল কোথায়
সুধীর বাঙাল কৈ?
সাতটা থেকে আমার মুখে
নেই কথা এই বৈ।

[ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪০ ]
প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭

৫০

নাকের ডগা ঘসিয়া হাসে
দেয় না পষ্ট জবাব বাঙাল
কাজ করে সে ষোলো আনার
খাতা এবং ছাপাখানার
মাঝখানে সে বাঁধে জাঙাল।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭

৫১

সুধীর যখন কর্ম করেন সু— ধীর করক্ষেপে
ধৈর্যহারা কবি যান যে ক্ষেপে।
রেগেমেগে কাজুরামকে বলেন—'সুধীর কর-কে
বোলাও জলদি করকে।''
মাথা চুলকে বাঙাল যখন সামনে এসে দাঁড়ায়
তখন তাহার মুখের ভাবটা উষ্মা তাঁহার তাড়ায়।

৫২

লেখার যত আবর্জনা, জেনে রেখো সকলে
সমস্ত রয় কর-মশায়ের দখলে।

৫৩

আরোগ্যশালার রাজকবি
সুধাকান্ত আঁকে বসি প্রত্যহের তুচ্ছতার ছবি।
মনে আছে একমাত্র আশা
বুদ্‌বুদের ইতিহাসে সুদীর্ঘকালের নেই ভাষা।
বাহিরে চলেছে দূরে বিরাটের প্রলয়ের পালা
অকিঞ্চিৎকরের স্তূপ জমাইছে এ আরোগ্যশালা।
লিখিবার বাণী কোথা যে দিকেই দু চক্ষু বুলাই
অর্থহীন ছড়া কেটে কোনোমতে নিজেরে ভুলাই।
ধাক্কা তারে দেয় পিছে ক্ষ্যাপা উনপঞ্চাশ বায়ু
এ বেলা ও বেলা তার আয়ু।
পোষাকি যে সাজে
মাথা তুলে বসি সভামাঝে,
সে আমার রঙ মাজা খোলসগুলোয়
ঢিল লেগে তারা আজ খসেছে ধুলোয়,
সুধাকান্ত নেপথ্যেই লোক করে জড়ো,
পাঁচ জনে খুশি হয় বড়ো
যত তারা বলে বাহা-বাহা
কবিবর ঝাঁট দিয়ে আনে যাহা তাহা।

২৫ পৌষ ১৩৪৭

৫৪

সুধাকান্ত

বচনের রচনে অক্লান্ত—
মুখে কথা নাহি বাধে,
পসরা ভরিয়া রাখে বহুবিধ কুড়ানো সংবাদে,
প্রত্যহ কণ্ঠের পায় সাড়া
পাড়া হতে পাড়া।
আজি তাব আত্মত্যাগ বাক্যত্যাগে হয়েছে কঠোর
রোগীর সেবার কার্যে মোর।
ও পাশের ঘরে
দিন কাটে সঙ্গীহীন নিঃশব্দ প্রহরে।
বাধা দেয় যাদের প্রবেশে
আহা যদি কাছে পেত, এই ব'লে মরে যে ক্ষোভে সে।
তবু বিধাতার বর
আছে তার পর,
বাক্যরুদ্ধ হয়ে গেলে তবু তার কাছে
অন্য পথ আছে।
অনায়াসে শব্দ আর মিল
কলমের মুখে তার করে কিলবিল।
মোর দিনমান
মুখর খাতায় তার যাহা তাহা দিতেছে জোগান
রচে বসি তুচ্ছতার ছবি—
ভয়ে মরি ছাই-চাপা পড়ে বুঝি কবি।
মনে আছে একমাত্র আশা
বুদ্‌বুদের ইতিহাসে সুদীর্ঘ কালের নেই ভাষা।
বাহিরেতে চলিয়াছে দেশে দেশে বিরাটের পালা
অকিঞ্চিৎকরের স্তূপ জমাইছে এ আরোগ্যশালা।
লিখিবার কথা কোথা রুদ্ধ ঘরে দু' চক্ষু বুলাই।
কোনোমনে ছড়া কেটে নিজের ভুলাই।
ধাক্কা তারে দেয় পিছে খ্যাপা উনপঞ্চাশ বায়ু,
এবেলা ওবেলা তার আয়ু,
এরি মধ্যে কবি-বেশে সুধাকান্ত এল
ইহাকেই বলে না কি strange bed-fellow!

[ উদয়ন, ১২ মার্চ ১৯৪১
বিকেল বেলা ]

৫৫

খাতাভরা পাতা তুমি ভোজে দিলে পেতে
আমারে ধরেছ এসে দিতে হবে খেতে।
ভাঁড়ার হয়েছে খালি; দই আর জলে
মিশোল ক'রে যা হয় কী তাহারে বলে?
ক্ষুধিতেরে ফাঁকি দেওয়া ছিল না ব্যবসা,
বিধাতা দিয়েছে ফাঁকি তাই এই দশা।

শনিবারের চিঠি
আশ্বিন ১৩৪৮

৫৬

পথে যবে চলি মোর ছায়া পড়ে লুটায়ে,
ধরণী কখনো তারে রাখে না তো উঠায়ে।
খাতা কেন ভরো যত উড়ো কথাগুলোতে,
মুক্তি লভুক তারা, মিলে যাক ধুলোতে।

মেঘনা, ১৩৫৪

৫৭

অস্তসিন্ধু পার হয়ে
এল মোর বিদায় বারতা,
এ ছবিতে রয়ে গেল
'মনে রেখো' এই দুটি কথা।

দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮

৫৮

আপনারে তুমি লুকাবে কেমন করে
হে তাপসী বিভাবরী,
হেরো তারাগুলি তব নীরবতা ভ'রে
দিতেছে প্রকাশ করি।

৫৯

আমার বুড়ো বয়সখানা ছিল বসে একা
তোমার জন্মদিনের সাথে হঠাৎ হল দেখা।
দাঁড়াল যেই চমকে উঠে
বয়সটা তার পড়ল টুটে।

পাণ্ডুলিপি ২৯৪

৬০

উষায় কলকাকলিতে
মুখর তব প্রাণ
জাগাবে দিন সভাতলে
আলোর জয়গান।

৬১

কূল-ছাড়া যে মানুষ সাগরিক
বৃথা কেন ডাকো তারে, নাগরিক?
তোমাদের বাসাখানা সর্বথা
ঘটাইছে আকাশের খর্বতা,
দৃপ্ত সে প্রস্তর প্রাচীরিক।

মোর মন অন্তরে অন্তরে
ঊনপঞ্চাশ বায়ু সঞ্চরে,
আশ্রয় খোলা তার চারি দিক,
বৃথা কেন ডাকো মোরে নাগরিক।

৬২

জন্মদিন এল তব আজি
ভরি ল'য়ে সংগীতের সাজি।
বিজ্ঞানের রসায়নে রাগরাগিণীর রসায়নে
পূর্ণ হল তোমার জীবনে।
কর্মের ধারায় তব রসের প্রবাহ যেথা মেশে
সেইখানে ভারতীর আশীর্বাদ অমৃত বরষে।

৬৩

তব কণ্ঠে বাসা যদি পায় মোর গান
আমার সে দান, কিংবা তোমারই সে দান?

৬৪

তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।

৬৫

তোমার গ্রন্থ-দানের গ্রন্থি
বাঁধিল আমার চিত্ত।
তোমার ভক্তি ঋষির মন্ত্রে
স্মরণে রহিল নিত্য।

তব শ্রদ্ধার অমল পাত্র
ভরিয়া রহিবে দিবসরাত্র
উপনিষদের পুণ্যপদের
অমৃত বাণীর বিত্ত॥

৬৬

শ্রীমতী মায়া ও শ্রীমান পুলকের
শুভবিবাহ উপলক্ষে আশীর্বাদ

নব সংসার সৃষ্টির ভার
নতশিরে নিয়ো দুজনে,
মিলনাঞ্জলি যুগল হিয়ার
দিয়ো বিধাতার পূজনে।
কল্যাণদীপ জ্বালায়ো ভবনে
বিশ্বেরে কোরো অতিথি,
মানবের প্রেমে জাগায়ো জীবনে
পুণ্য প্রেমের প্রতীতি।

৬৭

বৈশাখের বেলফুল
তারি গন্ধখানি
মিশায় কথার ছাঁদ
রবি-আশীর্বাদ।

৬৮

যুগল প্রাণের মিলনের পরে
পুণ্য অমৃত-বৃষ্টি
মঙ্গল-দানে করুক মধুর
নবজীবনের সৃষ্টি।
প্রেমরহস্যসন্ধান-পথে যাত্রী
মধুময় হোক তোমাদের দিন রাত্রি,
নামুক দোঁহার শুভদৃষ্টিতে
বিধাতার শুভদৃষ্টি।

৬৯

যে লেখা কেবলি রেখা তার বেশি নয়
তারে নিয়ে কেন এ-সঞ্চয়?
সমুদ্রের ফেনা চাও জমা করিবারে
কতদিন রাখিবে তাহারে।
উঞ্ছবৃত্তি কর লয়ে তুচ্ছ কথাগুলি
ভর মিছে অক্ষরের ঝুলি।

৭০

লেখা যদি চাও এখনি
লিখে দেবে মোর লেখনী।
সে-লেখা কিন্তু শুধু মসীরেখা
সে-কথা কি আজো শেখো নি?

খেয়াল ঢুকেছে মাথাতে
ভরে নেবে কিছু খাতাতে,
কতক্ষণ হায়
ধরে রাখা যায়—
শিশির পদ্মপাতাতে।

৭১

শান্তা, তুমি শান্তিনাশের ভয় দেখালে মোরে,
সই-করা নাম করবে আদায় ঝগড়া করার জোরে?
এই তো দেখি বঁটি হাতে শিউলিতলায় যাওয়া
আপনি যে ফুল ঝরিয়ে দিল শরৎপ্রাতের হাওয়া।

৭২

সংগীতের বাণীপথে
ছন্দে গাঁথা তব নমস্কৃতি—
জাগালো অন্তরে মোর
প্রেমরসে অভিষিক্ত গীতি।

বসন্তে কোকিল গাহে
অলক্ষিত কোন্ তরুশাখে—
দূর অরণ্যের পিক
সেই সুরে তারে ফিরে ডাকে।

৭৩

সায়াহ্নে রবির কর পড়িল গগন নীলিমায়
মহীরে আশিসবাণী লিখি দিল ললাটসীমায়।

# প্রবন্ধ

## ব্যক্তিপ্রসঙ্গ

১৮॥ ৪

# কৃষ্ণবিহারী সেন

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় বন্ধু কৃষ্ণবিহারী সেনের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার বান্ধবেরা সকলেই অবগত আছেন অবিচলিত ধৈর্যে এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে তিনি যেমন প্রবীণ ছিলেন তাঁহার হৃদয়টি তেমনি বালকের মতো স্বচ্ছ সরল এবং সদাপ্রফুল্ল ছিল; সংসারের রোগ শোক দুশ্চিন্তা কিছুতেই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় বহু অধ্যয়নশীল উদারবুদ্ধি সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই বন্ধুবৎসল স্বদেশহিতৈষী ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 'সাধনা'র পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই মনস্বী পুরুষের সহায়তায় বঙ্গভাষা বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে আশা পূর্ণ না করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি আমরা শোকাতুর ভক্তবন্ধুদত্ত পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে সেই মৃত মহাত্মার স্মরণার্থে উৎসর্গ করিলাম।—

সখা ওহে কে বলিল নাহি তুমি আর!  
রোগতাপজর্জরিত ফেলি দেহভার  
অজর অমর রূপে হয়ে জ্যোতির্ময়  
নবাকাশে নববেশে হয়েছ উদয়।  
সে চিত্র তুলিতে নারে চিত্রকর বটে,  
ওঠে না সে দেহছায়া ভানুচিত্রপটে,  
কিন্তু সেই সূক্ষ্মছবি চিন্ময় কায়া  
চিদাকাশে সদা ভাসে— দিব্য তার ছায়া।  
সেই তব চিরস্ফুর সুমধুর হাস  
যন্ত্রণারও মাঝে যাহা হইত বিকাশ;  
অপ্রতিম ধৈর্য তব— আত্মার সে বল—  
রোগ তাপ মাঝে যাহা থাকিত অটল;  
অনন্ত সে জ্ঞানস্পৃহা— ভেদিয়া আকাশ  
সুদূর নক্ষত্রমাঝে হত যা প্রকাশ;  
একনিষ্ঠ প্রেম সেই একপত্নীব্রত  
সখাসনে যার কথা হইত নিয়ত;  
এই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব মিলি একসাথে  
জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম তনু রচিয়া তাহাতে  
কোন্ দিব্য পথে কোন্ সমুন্নত লোকে  
গেছ চলি— এড়াইয়া রোগ-তাপ-শোকে।

সাধনা  
আষাঢ়, ১৩০২

# সাম্রাজ্যেশ্বরী

(একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবে পঠিত)

ভারতসম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়া— যিনি সুদীর্ঘকাল তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের জননীপদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, যিনি তাঁহার রাজশক্তিকে মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত করিয়া তাঁহার অগণ্য প্রজাবৃন্দের নত মস্তকের উপরে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা শান্তি এবং কল্যাণ যাঁহার অকলঙ্ক রাজদণ্ডকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, সেই ভারতেশ্বরী মহারানী যে পরম পুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রসাদে সুচিরকাল জীবিত থাকিয়া আনন্দিতা রাজশ্রীকে দেশে কালে এবং প্রকৃতিবর্গের হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অদ্য সমস্ত রাজসম্পদ পরিহারপূর্বক ললাটের মাণিক্যমণ্ডিত মুকুট অবতারণ করিয়া একাকিনী সেই রাজরাজের মহাসভায় গমন করিয়াছেন। পরমপিতা তাঁহার মঙ্গলবিধান করুন।

মৃত্যু প্রতিদিন এই সংসারে যাতায়াত করিতেছে কিন্তু আমরা তাহার গোপন পদসঞ্চার লক্ষ্য করি না। সেই মৃত্যু যখন রাজসিংহাসনের উপরেও অবহেলাভরে আপন অমোঘ কর প্রসারণ করে তখন মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর বিরাট স্বরূপ কোটি কোটি লোকের নিকট পূর্ণসূর্যগ্রহণের রাহুচ্ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্য সমস্ত পৃথিবীর উপরে এই মৃত্যুর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের কুটিরপ্রাঙ্গণে যাহার গতিবিধি লক্ষ্যপথে পড়ে না, সে আজ অভ্রভেদী রাজসিংহাসনের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছে। কিন্তু আমরা আতঙ্কে তাহার নিকট মস্তক অবনত করিব না। ত্রাসের এবং শোকের সমস্ত অন্ধকারপুঞ্জ অপসারণ করিয়া আমরা তাঁহাকেই স্মরণ করিব, যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ— যাঁহার ছায়া অমৃত যাঁহার ছায়া মৃত্যু। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব! যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করে, অদ্য পৃথিবীব্যাপী মৃত্যুশোকের মধ্যে তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করে। কত চন্দ্রসূর্য গ্রহতারকা তাঁহার জ্যোতিঃকণায় প্রজ্বলিত ও চরণচ্ছায়ায় নির্বাপিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ মৃত্যু কোন্ মহৎশোক তাঁহার মহোৎসবকে কণামাত্র আচ্ছন্ন করিতে পারে? হে শোকার্ত, হে মরণভয়াতুর, অদ্য তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করে। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— তিনি পরমানন্দ— সেই আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে সেই আনন্দের দ্বারাই জীবিত রহিতেছে এবং ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সচেতন-অচেতন যাহা-কিছু অহরহ তাঁহার প্রতি গমন করিতেছে এবং তাঁহার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে।

পৃথিবীর অতীতকালের রাজাধিরাজগণ অদ্য কোথায়! কোথায় দিগ্‌বিজয়ী রঘু, কোথায় আসমুদ্র ক্ষিতীশ ভরত— যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা! পৃথিবীর সুবৃহৎ রাজমহিমা মুহূর্তে মুহূর্তে যাঁহার জ্যোতিঃসাগরে বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইতেছে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি এই কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে; সেখানে ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ! অদ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী তাঁহার দীর্ঘজীবনের সমস্ত কৃতকর্ম যাঁহার পদতলে সমর্পণ করিয়া করজোড়ে মুকুটবিহীন মস্তক অবনত করিয়াছেন— আমরাও অদ্য সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের সম্মুখে আমাদের সমস্ত পাপ-তাপ-শোক আমাদের ভক্তি-প্রীতি-পূজা স্থাপন করিয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তিনি আমাদিগকে বিচার করুন, আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, আমাদের এই পার্থিব জীবনকে সার্থকতা দান করিয়া মৃত্যুর পরে পরিপূর্ণতর জীবনের মধ্যে তাঁহার অমৃতবক্ষে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া লউন!

ভারতী, ফাল্গুন, ১৩০৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩০৭

# আচার্য জগদীশের জয়বার্তা

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে উর্ধ্বে খাড়া করিয়া রাখে এবং কর্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলংশক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে; কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্মকর্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কোনো কারণ ঘটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্মশ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতী ধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভালো, ইহাই আমরা প্রাণপণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহংকারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভালো হইবে না। জীর্ণবস্ত্রকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ সেলাই করিতে বসিলে কাজে লাগে।

আমরা ভালো, এ কথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়ো। আচার্য জগদীশ বসুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। আজ আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিয়াছে— লজ্জিত ভারতকে যিনি সেই সুদিন দিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্যের জয়বার্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যে-সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নূতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক হইতে যে বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে; সত্যকেও সুদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হক্‌সলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোনো কোনো জীবতত্ত্ববিদ বলিয়াছিলেন, আপনি তো ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোনো লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-শরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোনো প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনীশক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কীরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ মে তারিখে আচার্য জগদীশ রয়াল ইন্‌স্টিট্যুশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল— যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া (The Response of Inorganic Matter to Mechanical and Electrical Stimulus)। এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্‌ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোনো বিদুষী ইংরাজ মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ি ও ভারতবর্ষীয় অলংকারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্ব-পশ্চাতে আচার্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড়ো বড়ো পট টাঙানো রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে; এবং তাঁহার বলিবার ধরনও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল— এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্য সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে-সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মতো ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই তো জীবিত বলে; অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধপ্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কীরূপ পুলকসঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন— কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল— এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহার ভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets

of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life-- the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things— the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it— it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

'They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.'

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই-একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ— শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল— পদার্থতত্ত্বসন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহংকার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি" এই যাহা-কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতিক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে— আমরা অদ্য যাহাকে 'হিঁদুয়ানি' বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জনামাত্র; তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্বের উদয় হয়, কর্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড়ত্ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ— তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্মে কর্মে, সেই পথ ব্যতীত 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

কিন্তু আচার্য জগদীশ যে কর্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্যের নূতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেন্ট অকর্মণ্য হইয়া যাইবে এবং একদল বণিকসম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবতত্ত্ববিদগণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, এ কথা তাঁহারা কোনোমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোনো কোনো মূঢ় লোকে

মনে করেন যে, বিজ্ঞানদ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহার পুলকিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃস্টান বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এজন্য অধ্যাপক কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারী, তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত। ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য জগদীশ বর্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অন্য কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় করি না। এখানে সর্বপ্রকার আনুকূল্যের অভাব। আচার্য জগদীশ কী করিতেছেন, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতাবশত আমরা বড়োকে বড়ো বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক্, আমাদের স্পর্ধার অন্ত নাই। ঈশ্বর যে-সকল মহাত্মাকে এ দেশে কাজ করিতে পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্মেন্টের নোয়াখালি-জেলায় কার্যভার প্রাপ্ত হয়। সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই— চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অনুকূল স্থান; এই তো স্বদেশের লোক— এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্বদা বিজ্ঞানের আলোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে সুলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার কর্ম সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন! আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অনুনয় তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি। সে অনুনয় সমস্ত ক্ষতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদদুঃখ হইতেও বড়ো। তিনি সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য-প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম। অতএব এই প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্বোচ্চ রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্মে, এই হতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন, ইহাই আমরা একান্তমনে কামনা করি।

বঙ্গদর্শন
আষাঢ়, ১৩০৮

# জগদীশচন্দ্র বসু

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোরবেলাকার মেঘের মতো; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙিন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্মপ্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙছে কোথাও গড়ছে; ধারা কোথায় গিয়ে মিশবে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়ে নি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনো অনেকটা অনির্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নূতন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্বদা

উৎসাহিত থাকত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয় নি; সেইজন্যে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্‌যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তি-সূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতোই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবি করে বসে। তখন কার কাছে কী আশা করা যেতে পারে তার মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভিড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চনা সবই জুটতে পারে; কিন্তু এখন পথযাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মতো মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্‌ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ করবার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠছে। সেই তাঁর ধর্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন যেমন করে শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা করে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ করে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব করে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তা হলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

প্রবাসী
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

# জগদীশচন্দ্র

তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেইসময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয়ে শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছু দিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনো আমার শরীর-মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমার পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না। শোক দেশের হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যা অজর যা অমর তা রইল। শারীরিক বিচ্ছেদের আঘাতে সেই সম্পদের উপলব্ধি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি সত্য সেখানে তাঁকে বেশি করে পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। বন্ধুরূপে আমার যা কাজ সে আমার যখন শক্তি ছিল তখন করতে ত্রুটি করি নি। কবিরূপে আমার যা কর্তব্য সেও আমার পূর্ণ সামর্থ্যের সময় প্রায় নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি— তাঁর স্মৃতি আমার রচনায় কীর্তিত হয়েই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেইজন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেইজন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর-একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল— কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত— 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ, প্রাণ এজতি নিঃসৃতং', 'এই যা-কিছু জগৎ, যা-কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।' সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।

তার পরে জগদীশ সরিয়ে আনলেন তাঁর পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলায় সংশয় নেই। অধ্যাপকের যন্ত্র-উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। উদ্ভিদের অন্দরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাজে সেই-সব যন্ত্র আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে তাঁর সহযোগিতারউপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক্, গম্যস্থানের উজান পথে এগিয়ে দেবার কিছু-না-কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির 'পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে

সমুদ্রপারের উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্‌বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্‌বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো ভাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার এক জন বন্ধুর স্মরণ নিতে হল। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য স্মরণীয় বলে জানি। সেইজন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ চলছিল। আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই।' আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর-এক বন্ধুর প্রসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে। এই গৌরবের পথ সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদারচেতা বন্ধুর উদ্দেশে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তার পর থেকে জগদীশচন্দ্রের যশ ও সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে দূরে প্রসারিত হতে লাগল, এ কথা সকলেরই জানা আছে। ইতিমধ্যে কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কীর্তিতে আকৃষ্ট হলেন, সহজেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁর পরীক্ষা-কাননের প্রতিষ্ঠা হল, এবং অবশেষে ঐশ্বর্যশালী বসুবিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হতে পারল। তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থসাহায্য বোধ করি ভারতবর্ষে আর কখনো পায় নি, তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষপর্যন্তই আপন লোকবিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্মীর পদ্মকে লোকে সোনার পদ্ম বলে থাকে, কিন্তু কাঠিন্য বিচার করলে তাকে লোহার পদ্ম বলাই সংগত। সেই লোহার আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্, তারই গুণে।

এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হল বিশ্বভূমিকায়। এখানকার সার্থকতার ইতিহাস আমার আয়ত্তের অতীত। এদিকে আমার পক্ষে সময় এল যখন থেকে আমার নির্মম কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সীমায় রোদে বাদলে মাটিভাঙা আলবাঁধার কাজে আমি একলা ঠেকে গেলুম। তার সাধনকৃচ্ছ্রতায় আত্মীয়বন্ধুদের থেকে আমার চেষ্টাকে ও সময়কে নিল দূরে টেনে।

প্রবাসী

পৌষ ১৩৪৪

# সতীশচন্দ্র রায়

জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারি দিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মতো সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরতালাভের পূর্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে একটি বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্প কয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসংকোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।

কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্তচিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয়মাধুর্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরই আত্ম-প্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব, কেবল আমারই স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে দুঃসহ।

সতীশ যখন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিক দিনের কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক, কলেজে পড়িতেছে— সংকোচে সম্ভ্রমে বিনম্রমুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের খাতিরে, নয়, সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিংয়ের ফ্যাশান বা ব্রাউনিংয়ের দল প্রবর্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয় তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুর স্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত 'শান্তিনিকেতন' নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্তমানপ্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরু-শিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক শুদ্ধ শুচি সংযত শ্রদ্ধাবান হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সংকল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন যাঁহারা অধ্যাপনাকার্যকে যথার্থ ধর্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায় ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম— তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল— 'আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য?'

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ হইতে কীরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সংকল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না— প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে-সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্ত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে-সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্তির সহিত কর্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে— যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে— কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহাদের বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে, নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনাসম্পদ লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়— সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না— বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজতগিরিসন্নিভ নির্মল ঈশ্বরমূর্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন— ভুজঙ্গবেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরমকাঙালের রিক্তভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরম লাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্তি দেখিতে পাইত, তাহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এত অল্পবয়সে, এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্বলতা-অপূর্ণতা, সমস্ত দীনতার মধ্যে তাহার উৎসাহ উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল— তাহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না; লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতি

প্রতিপত্তি ও আত্মনাম ঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীর সংকীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা খেয়ালের জোরে নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়— তাহা তাহার মহান আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই সতীশকে আমি নিকটে পাইয়াছিলাম, তাহার অন্তরাত্মার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় ঘটিতেছিল। এই বিদ্যালয়ের কল্পনা আমার মনের মধ্যে যে কী ভাবের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কোনো বন্ধুকে আমি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

'মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী বালক-বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার-বেষ্টন-হীন নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে— যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক, বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত; আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক, কে আমাদের স্টেট সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইসরয়, কে কোন আইন করিল এবং কে সে আইন উল্টাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা, মেঘ-রৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণগুল্মে ও ঋতুপর্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা, এখানকার নিভৃতশান্তি ও সরল সৌন্দর্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে এবং বালিকারা গো-দোহনকার্য সারিয়া কুটিরপ্রাঙ্গণে, গৃহকার্যে, শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

'জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও শয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি শয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়ামে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা, ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কী করিয়া। আমাদের মাথা তুলিবার স্থান তো নাই-ই, মাথা রাখিবারও স্থান প্রত্যহ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মতো আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই— সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।'

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, বর্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কী, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে-একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর একটিমাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না— ত্রিশ কোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্মে লিপ্ত। অথচ কয়েক জনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি দান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে— কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্বরজ্জু মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হউক, আমার সংকল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, কাজের দিক হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এরূপ মনোরম এবং সুষমাবিশিষ্ট নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল, কোথায় সার্থক ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের সৌম্যনির্মলজ্যোতিঃপ্রভা? তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম-আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখনো ইহা রূপান্তরিত বাক্যমাত্র, ইহা আহ্বান।

সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে-ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যেও সে অহংকার অনুভব করে নাই— সে প্রতিদিন নম্র মধুর প্রফুল্লভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কী করিয়াছিল তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন-আশ্রমে চারি দিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ— এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খর্বায়তন বুনো খেজুর, বুনো জাম, দুই-একটা কাঁটাগুল্ম এবং উইয়ের ঢিপিতে মিলিয়া এক-একটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছায়াময় ভুবনডাঙা-গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মতো ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন দৈত্যপুরীর স্তম্ভশ্রেণীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া নুড়িবিছানো কঙ্করস্তূপের মধ্যে বহুতর গুহা-গহ্বর ও বর্ষাস্রোতের বালুবিকীর্ণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে— সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুর শহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতাল নারীরা উলুখড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভারমন্থর গোরুর গাড়ি নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্তশব্দে ধুলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে ঋজুদীর্ঘ একসারি শালবৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশ-পথ দিয়া একটি লৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে— এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধূক ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃন্ময় কুটিরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের

শালতরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উতঙ্কের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'গুরুদক্ষিণা'-নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে— ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল— ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মতো রচনা করে নাই— এই আশ্রমের আকাশ বাতাস ছায়াও সতীশের সদ্য-উদ্‌বোধিত প্রফুল্ল নবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মতো করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা করিতে বসিয়া গ্রন্থের কথা অতি অল্পই বলিলাম, এমন অনেকে মনে করিতে পারেন। বস্তুত তাহা নহে। সতীশের জীবনের যে অংশটুকু আমি জানি সেই অংশের পরিচয় এবং গ্রন্থের আলোচনা, একই কথা। এই বুঝিয়া পাঠকগণ যখন 'গুরুদক্ষিণা' পাঠ করিবেন, তখনই তাঁহারা এই গদ্যকাব্যটির সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিবেন। গ্রন্থে যাহা আছে গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে, গ্রন্থের বাহিরে যাহা ছিল তাহাই আমি বিবৃত করিলাম।

সতীশের জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে একখানি পত্রের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্তমান জীবনের সাধনার কথা সে লিখিয়াছিল— সে-সব কথা এখন ব্যর্থ হইয়াছে— সেগুলি কেবল আমারই নিকটে সত্য— অতএব সেই কথা কয়টি কেবল আমি রাখিলাম। তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ ও তাহার কবিতাটি এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

সতীশের শেষ রচনাটি 'তাজমহল'-নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মম্‌তাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য দেখিয়াছিল। অসমাপ্তির মাঝখানে হঠাৎ সমাপ্তি— ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষ-বিহীনতা রাখিয়া যায়। পৃথিবীতে সকল সমাপনের মধ্যেই জরা ও বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়, সম্পূর্ণতা আমাদের কাছে ক্ষুদ্র সসীমতারই প্রমাণ দিয়া থাকে। অতুল সৌন্দর্যসম্পদও আমাদের কাছে মায়া বলিয়া প্রতিভাত হয়; কারণ, আমরা তাহার বিকৃতি, তাহার শেষ দেখিতে পাই।

মম্‌তাজের সৌন্দর্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে— তাজমহলের সুষমাসৌষ্ঠবের মধ্যে কবি সতীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবন ও সম্মুখবর্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নব পরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ— সে দরিদ্রের মতো রিক্তহস্তে জীর্ণ শক্তি লইয়া যায় নাই।

বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০

'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের ভূমিকা ১৩১১

# মোহিতচন্দ্র সেন

মোহিতচন্দ্র সেনের সহিত আমার পরিচয় অল্পদিনের।

বাল্যকালের বন্ধুত্বের সহিত অধিকবয়সের বন্ধুত্বের একটা প্রভেদ আছে। একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠার গতিকে কাঁচাবয়সে পরস্পরের মধ্যে সহজেই মিশ খাইয়া যায়। অল্পবয়সে মিল সহজ, কেননা, অল্পবয়সে মানুষের স্বাভাবিক প্রভেদগুলি কড়া হইয়া ওঠে না। যত বয়স হইতে থাকে, আমাদের প্রত্যেকের সীমানা ততই নির্দিষ্ট হইতে থাকে--- ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে যে একটি পার্থক্যের অধিকার দিয়াছেন, তাহা উত্তরোত্তর পাকা হইতে থাকে। ছেলেবেলায় যে-সকল প্রভেদ অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, বড়ো বয়সে তাহা পারা যায় না।

কিন্তু এই পার্থক্যজিনিসটা যে কেবল পরস্পরকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, তাহা নহে। ইহা ধাতুপাত্রের মতো--- ইহার সীমাবদ্ধতাদ্বারাই আমরা যাহা পাই, তাহাকে গ্রহণ করি--- তাহাকে আপনার করি; ইহার কাঠিন্যদ্বারা আমরা যাহা পাই, তাহাকে ধারণ করি--- তাহাকে রক্ষা করি। যখন আমারা ছোটো থাকি, তখন নিখিল আমাদিগকে ধারণ করে, এইজন্য সকলের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ। তখন আমরা কিছুই ত্যাগ করি না--- যাহাই কাছে আসে, তাহারই সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘটে।

বয়স হইলে আমার বুঝি যে, ত্যাগ করিতে না জানিলে গ্রহণ করা যায় না। যেখানে সমস্তই আমার কাছে আছে, সেখানে বস্তুত কিছুই আমার কাছে নাই। সমস্তের মধ্য হইতে আমরা যাহা বাছিয়া লই, তাহাই যথার্থ আমাদের। এই কারণে যে বয়সে আমাদের পার্থক্য দৃঢ় হয়, সেই বয়সেই আমাদের বন্ধুত্ব যথার্থ হয়। তখন অবারিত কেহ আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িতে পারে না--- আমরা যাহাকে বাছিয়া লই, আমরা যাহাকে আসিতে দিই, সে-ই আসে। ইহাতে অভ্যাসের কোনো হাত নাই, ইহা স্বয়ং আমাদের অন্তর-প্রকৃতির কর্ম।

এই অন্তরপ্রকৃতির উপরে যে আমাদের কোনো জোর খাটে, তাহাও বলিতে পারি না। সে যে কী বুঝিয়া কী নিয়মে আপনার দ্বার উদ্ঘাটন করে, তাহা সে-ই জানে। আমরা হিসাব করিয়া, সুবিধা বিচার করিয়া তাহাকে হুকুম করিলেই যে সে হুকুম মানে, তাহা নহে। সে কী বুঝিয়া আপনার নিমন্ত্রণপত্র বিলি করে, তাহা আমরা ভালো করিয়া বুঝিতেই পারি না।

এইজন্য বেশিবয়সের বন্ধুত্বের মধ্যে একটি অভাবনীয় রহস্য দেখিতে পাই। যে বয়সে আমাদের পুরাতন অনেক জিনিস ঝরিয়া যাইতে থাকে এবং নূতন কোনো জিনিসকে আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি না, সেই বয়সে কেমন করিয়া হঠাৎ একদা একরাত্রির অতিথি দেখিতে দেখিতে চিরদিনের আত্মীয় হইয়া উঠে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মনে হয়, আমাদের অন্তরলক্ষ্মী--- যিনি আমাদের জীবনযজ্ঞ নির্বাহ করিবার ভার লইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, এই যজ্ঞে কাহাকে তাঁহার কী প্রয়োজন, কে না আসিলে তাঁহার উৎসব সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি কাহার ললাটে কী লক্ষণ দেখিতে পান--- তাহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারেন, তাহার রহস্য আমাদের কাছে ভেদ করেন নাই।

যেদিন মোহিতচন্দ্র প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিলেন, সেদিন শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার আলোচনা হইয়াছিল। আমি শহর হইতে দূরে বোলপুরের নিভৃত প্রান্তরে এক বিদ্যালয়স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে আমার মনে যে একটি আদর্শ ছিল, তাহাই তাঁহার সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিলাম।

তাহার পরে তিনি অবকাশ বা উৎসব উপলক্ষে মাঝে মাঝে বোলপুরে আসিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া তাহার তীব্র-আলোক-দীপ্ত এই আকাশের নীচে দূরদিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে একাকী বসিয়া কী ধ্যান করিয়াছে, কী কথা বলিয়াছে, কী ব্যবস্থা করিয়াছে, কী

পরিণামের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে, বিধাতা তাহার সম্মুখে কী সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এই কথা লইয়া কতদিন গোধূলির ধূসর আলোকে বোলপুরের শস্যহীন জনশূন্য প্রান্তরের প্রান্তবর্তী রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ পথের উপর দিয়া আমরা দুইজনে পদচারণ করিয়াছি। আমি এই-সকল নানা কথা ভাবের দিক দিয়াই ভাবিয়াছি; আমি পণ্ডিত নহি; বিচিত্র মানবসংসারের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। কিন্তু রাজপথ যেমন সকল যাত্রীরই যাতায়াত অনায়াসে সহ্য করে, সেইরূপ মোহিতচন্দ্রের যুক্তিশাস্ত্রে সুপরিণত সর্বসহিষ্ণু পাণ্ডিত্য আমার নিঃসহায় ভাবগুলির গতিবিধিকে অকালে তর্কের দ্বারা রোধ করিত না— তাহারা কোন্ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে, তাহা অবধানপূর্বক লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিত। যুক্তি-নামক সংহত-আলোকের লণ্ঠন এবং কল্পনা-নামক জ্যোতিষ্কের ব্যাপকদীপ্তি, দু-ই তিনি ব্যবহারে লাগাইতেন; সেইজন্য অন্যে যাহা বলিত, নিজের মধ্য হইতে তাহা পূরণ করিয়া লইবার শক্তি তাঁহার ছিল; সেইজন্য পাণ্ডিত্যের কঠিন বেষ্টনে তাঁহার মন সংকীর্ণ ছিল না, কল্পনাযোগে সর্বত্র তাঁহার সহজ প্রবেশাধিকার তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

মনের আদর্শের সঙ্গে বাস্তব আয়োজনের প্রভেদ অনেক। তীক্ষ্ণদৃষ্টির সঙ্গে উদার কল্পনাশক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা প্রথম উদ্‌যোগের অনিবার্য ছোটোখাটো ত্রুটিকে সংকীর্ণ অধৈর্যদ্বারা বড়ো করিয়া তুলিয়া সমগ্রকে বিকৃত করিয়া দেখেন না। আমার নূতনস্থাপিত বিদ্যালয়ের সমস্ত দুর্বলতা-বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করিয়া মোহিতচন্দ্র ইহার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তখন আমার পক্ষে এমন সহায়তা আর কিছুই হইতে পারিত না। যাহা আমার প্রয়াসের মধ্যে আছে, তাহা আর-একজনের উপলব্ধির নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, উদ্‌যোগকর্তার পক্ষে এমন বল— এমন আনন্দ আর কিছুই হইতে পারে না। বিশেষত তখন কেবল আমার দুই-একজন-মাত্র সহায়কারী সুহৃৎ ছিলেন; তখন অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং বিঘ্নে আমার এই কর্মের ভার আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন কলিকাতা হইতে চিঠি পাইলাম, আমার কাছে তাঁহার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি বোলপুরে আসিতে চান। সন্ধ্যার গাড়িতে আসিলেন। আহারে বসিবার পূর্বে আমাকে কোণে ডাকিয়া লইয়া কাজের কথাটা শেষ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিভৃতে আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন— 'আমি মনে করিয়াছিলাম, এবারে পরীক্ষকের পারিশ্রমিক যাহা পাইব, তাহা নিজে রাখিব না। এই বিদ্যালয়ে আমি নিজে যখন খাটিবার সুযোগ পাইতেছি না, তখন আমার সাধ্যমতো কিছু দান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি।' এই বলিয়া সলজ্জভাবে আমার হাতে একখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। নোট খুলিয়া দেখিলাম, হাজার টাকা।

এই হাজার টাকার মতো দুর্লভ দুর্মূল্য হাজার টাকা ইহার পূর্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না, এই হাজার টাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিদ্যালয় একটা নূতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল। বিশ্বের মঙ্গলশক্তি যে কীরূপ অভাবনীয়রূপে কাজ করে, তাহা এমনিই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইল যে, আমাদের মাথার উপর হইতে বিঘ্নবাধার ভার লঘু হইয়া গেল। ঠিক তাহার পরেই পারিবারিক সংকটে আমাকে দীর্ঘকাল প্রবাসে যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল এবং যে আত্মীয়ের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন ছিল, সে এমনি অকারণে বিমুখ হইল যে, সেই সময়ের আঘাত আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য হইতে পারিত। এমন সময় নোটের আকারে মোহিতচন্দ্র যখন অকস্মাৎ কল্যাণবর্ষণ করিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমিই যে কেবল আমার সংকল্পটুকুকে লইয়া জাগিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে— মঙ্গল জাগিয়া আছে। আমার দুর্বলতা, আমার আশঙ্কা, সমস্ত চলিয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পরে মোহিতচন্দ্র বোলপুর-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কঠিনপীড়াগ্রস্ত হইয়া ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ইঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল।

যাহারা মানবজীবনের ভিতরের দিকে তাকায় না, যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষ্টিবিনিময় না করিয়া ব্যস্তভাবে ব্যবসায় চালাইয়া যায় বা অলসভাবে দিনক্ষয় করিতে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধসূত্র কতই ক্ষীণ। তাহারা চলিয়া গেলে কতটুকু স্থানেই বা শূন্যতা ঘটে! কিন্তু মোহিতচন্দ্র বালকের মতো নবীনদৃষ্টিতে, তাপসের মতো গভীর ধ্যানযোগে এবং কবির মতো সরস সহৃদয়তার সঙ্গে বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই আষাঢ় যখন এই নবতৃণশ্যামল মাঠের উপরে ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং মেঘমুক্ত প্রাতঃকাল যখন শালতরুশ্রেণীর ছায়াবিচিত্র বীথিকার মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন মনে বলিতে থাকে, পৃথিবী হইতে একজন গেছে, যে তোমাদের বর্ষে বর্ষে অভ্যর্থনা করিয়াছে, যে তোমাদের ভাষা জানিত, তোমাদের বার্তা বুঝিত; তোমাদের লীলাক্ষেত্রে তাহার শূন্য আসনের দিকে চাহিয়া তোমরা তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবে না— সে যে তোমাদের দিকে আজ তাহার প্রীতিকোমল ভক্তিরসার্দ্র অন্তঃকরণকে অগ্রসর করিয়া ধরে নাই, এই বিষাদ যেন সমস্ত আলোকের বিষাদ, সমস্ত আকাশের বিষাদ। সকলপ্রকার সৌন্দর্য, ঔদার্য ও মহত্ত্ব যে হৃদয়কে বারংবার স্পন্দিত-উদ্‌বোধিত করিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতা যাহাকে সংকীর্ণ করে নাই এবং সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে চিরন্তনের দিকে যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, আমাদের সকল সৎসংকল্পে, সকল মঙ্গল-উৎসবে, সকল শুভপরামর্শে আজ হইতে তাহার অভাব দৈন্যস্বরূপে আমাদিগকে আঘাত করিবে। উৎসাহের শক্তি যাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আনুকূল্য যাহাদের নিকট হইতে সহজে প্রবাহিত হয়, যাহারা উদার নিষ্ঠার দ্বারা ভূমার প্রতি আমাদের চেষ্টাকে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং সংসারপথের ক্ষুদ্রতা উত্তীর্ণ করিয়া দিবার যাহারা সহায় হইতে পারে— এমন বন্ধু কয়জনই বা আছে!

দুইবৎসর হইল, ১২ ডিসেম্বর মোহিতচন্দ্র তাঁহার জন্মদিনের পরদিনে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারই এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া লেখা সমাপ্তি করি।—

'আজকাল সকালে-সন্ধ্যায় রাস্তার উপর আর বাড়ির গায়ে যে আলো পড়ে, সেটা খুব চমৎকার দেখায়। আমি কাল আপনাদের বাড়ির পথে চলতে চলতে স্পষ্ট অনুভব করছিলাম যে, বিশ্বকে যদি জ্ঞানের সৃষ্টি বলা যায়, তবে সৌন্দর্যকে প্রেমের সৃষ্টি বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যে ভাবগুলো মনের ভিতর প্রবেশ করে, আমাদের প্রজ্ঞাজাত সংস্কারগুলি সেগুলিকে কুড়িয়ে-নিয়ে এই বিচিত্র সুসংহত বিশ্বরূপে বেঁধে দেয়। এ যদি সত্য হয় তবে যে-সৌন্দর্য আমাদের কাছে উদ্ভাসিত, সেটা কত-না ক্ষুদ্র-বৃহৎ নিঃস্বার্থ-নির্মল সুখের সমবেত সৃষ্টি! association কথাটার বাংলা মনে আসছে না, কিন্তু একমাত্র প্রেমই যে এই association-এর মূল, একমাত্র প্রেমই যে আমাদের সুখের মুহূর্তগুলোকে যথার্থভাবে বাঁধতে পারে, আর তা থেকে অমর সৌন্দর্য উৎপাদন করে, তাতে সন্দেহ হয় না। আর যদি সৌন্দর্য প্রেমেরই সৃষ্টি হল, তবে আনন্দও তাই— প্রেমিক না হলে কেই বা যথার্থ আনন্দিত হয়!

এই সৌন্দর্য যে আমারই প্রেমের সৃষ্টি, আমার শুষ্কতা যে একে নষ্ট করে— এই চিন্তার ভিতর আমার জীবনের গৌরব, আর দায়িত্বের গুরুত্ব একসঙ্গে অনুভব করি। যিনি ভালোবাসার অধিকার দিয়ে আমার কাছে বিশ্বের সৌন্দর্য, আর বন্ধুর প্রীতি এনে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিই; আর শুধু আমারই শুষ্কতা-অপরাধের দরুন আমি যে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত হই, এ কথা নতমস্তকে স্বীকার করি।'

বঙ্গদর্শন
শ্রাবণ ১৩১৩

# রমেশচন্দ্র দত্ত

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি বলিয়া তো গর্ব করিতে পারি না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং তিনি আমাকে কিছু স্নেহও করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে বরোদার সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষে তিনি আমাকে দুই-তিনখানি পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত আছে। তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কী সাহিত্যে, কী রাজকার্যে, কী দেশহিতে সর্বদাই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন— বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি— এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল— তাঁহার কর্মে এবং মানুষের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অক্ষুণ্ণ নির্মলতা আমার স্মৃতি অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ইতি ১৬ পৌষ, ১৩১৬

মানসী
আষাঢ় ১৩১৭

# সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজয়, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্‌বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

প্রবাসী
৫ ভাদ্র ১৩২১
আশ্বিন ১৩২১

## রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আমার শরীর ভালো নাই আমার অবকাশও অল্প। রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে মনের মতো করিয়া কিছু লিখিব এমন সুযোগ এখন আমার নাই। শুধু শ্রদ্ধা নহে, তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি সুগভীর ছিল, এ কথা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ কথা বলিবার লোক আরও অনেক আছে। যে কেহ তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, সকলেই তাঁহার মনীষায় বিস্মিত ও সহৃদয়তায় আকৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির, জ্ঞানের, চরিত্রের ও উদারহৃদয়তার এরূপ সমাবেশ দেখা যায় না। আমার প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার ঔদার্যের একটি অসামান্য প্রমাণ। আমার সহিত তাঁহার সামাজিক মতের ও ব্যবহারের অনৈক্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার চিত্তকে আমার প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই; এমন-কি, প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একদা আমার প্রশস্তিসভার আয়োজন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

বাংলার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না; কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা তাঁহার ছিল প্রভূত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয়বিচারে অথবা তাহার লেখন-প্রণালীতে অন্য কাহারো অনুবৃত্তি ছিল না।

দেশের প্রতি তাঁহার প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল; তাহা স্কুলপাঠ্য বিলাতী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত তৎকালীন কন্‌গ্রেস তোতাপাখি-কর্তৃক উচ্চারিত বাঁধাবুলির দ্বারা পুষ্ট ছিল না। তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সংগত হইয়াছিল।

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাঁহাকে বারংবার মর্মাহত করিয়াছে। তিনি যে-সকল ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে পালন করিতেছিলেন তাহাতেও নানাপ্রকার বাধাবিরুদ্ধতা তাঁহাকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অজস্র মাধুর্য-সম্পদের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই— রোগ তাপ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহার প্রসন্নতা অম্লান ছিল। বিরোধের আঘাত তাঁহাকে গভীর করিয়া বাজিত, অন্যায় তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিত, কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে জানিতেন। সেই মাধুর্য সেই ক্ষমাই ছিল তাঁহার শক্তির প্রকাশ।

তিনি যদি কেবলমাত্র বিদ্বান্ বা গ্রন্থরচয়িতা বা স্বদেশপ্রেমিক হইতেন, তাহা হইলেও তিনি প্রশংসালাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বভাবের যে একটি পূর্ণতা ছিল, তাহারই গুণে তিনি সকলের প্রীতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এমন পুরস্কার অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

২৮ ফাল্গুন ১৩২৪

# দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠকসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার যোগ্য। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে আমার প্রতিপক্ষশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া কলহের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি এ কলহ আমার নহে এবং আমার হইতেই পারে না। পশ্চিম দেশের আঁধি হঠাৎ একটা উড়ো হাওয়ার কাঁধে চড়িয়া শয়ন বসন আসনের উপর এক পুরু ধুলা রাখিয়া চলিয়া যায়। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে সেই ভুল-বোঝার আঁধি কোথা হইতে আসিয়া পড়ে তাহা বলিতেই পারি না। কিন্তু উপস্থিতমতো সেটা যত বড়ো উৎপাতই হোক্ সেটা নিত্য নহে এবং বাঙালি পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই ধুলা জমাইয়া রাখিবার চেষ্টা যেন না করেন, করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। কল্যাণীয় শ্রীমান দেবকুমার তাঁহার বন্ধুর জীবনীর ভূমিকায় আমাকে কয়েক ছত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি কেবলমাত্র এই কথাটি জানাইতে চাই যে, সাময়িক পত্রে যে-সকল সাময়িক আবর্জনা জমা হয় তাহা সাহিত্যের চিরসাময়িক উৎসব-সভার সামগ্রী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনো তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।— আর যাহা-কিছু অঘটন ঘটিয়াছে তাহা মায়া মাত্র, তাহার সম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি তো পারিবই না, আর কেহ পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

[ ১৩২৪ ]

# শান্তিনিকেতনের মুলু

এখানে যারা একসঙ্গে এসে মিলেছি, তাদের অনেকেই একদিন পরস্পরের পরিচিত ছিলুম না; কোন্ গৃহ থেকে কে এসেছি, তার ঠিক নেই। যে দিন কেউ এসে পৌঁছল তার আগের দিনেও তার সঙ্গে অসীম অপরিচয়। তার পরে একেবারে সেই না-জানার সমুদ্র থেকে জানা-শোনার তটে মিলন হল। তার পরে এই মিলনের সম্বন্ধ কতদিনের কত না-দেখা-শুনোর মধ্যে দিয়েও টিকে থাকবে। এই জানাটুকু কতই সংকীর্ণ, অথচ তার পূর্বদিনের না-জানা কত বৃহৎ।

মায়ের কোলে যেম্নি ছেলেটি এল, অম্নি মনে হল এদের পরিচয়ের সীমা নেই; যেন তার সঙ্গে অনাদি কালের সম্বন্ধ, অনন্তকাল যেন সেই সম্বন্ধ থাকবে। কেন এমন মনে হয়? কেননা, সত্যের তো সীমা দেখা যায় না। সমস্ত 'না' বিলুপ্ত করেই সত্য দেখা দেয়। সম্বন্ধ যেখানেই সত্য সেখানে ছোটো হয় বড়ো, মুহূর্ত হয় অনন্ত; সেখানে একটি শিশু আপন পরম মূল্যে সমস্ত সৌরজগতের সমান হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে কেবল জন্ম এবং মৃত্যুর সীমার মধ্যে তার জীবনের সীমা দেখা যায় না, মনের মধ্যে আকাশের ধ্রুবতারাটির মতো সে দেখা দেয়। যার সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর হয় নি, তাকে মৃত্যুর মধ্যে কল্পনা করতে মন বাধা পায় না, কিন্তু পিতামাতাকে, ভাইকে, বন্ধুকে যে জানি, সেই জানার মধ্যে সত্যের ধর্ম আছে— সেই সত্যের ধর্মই নিত্যতাকে দেখিয়ে দেয়। অন্ধকারে আমরা হাতের কাছের একটুখানি জিনিসকে একটুখানি জায়গার মধ্যে দেখতে পাই। একটু আলো পড়বামাত্র জানতে পারি যে, দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা-কিছু

ভয়ভাবনা, সে কেবল অন্ধকার থেকেই হয়েছে। সত্য-সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই আলো ফেলে এবং এই আলোতে আমরা নিত্যকে দেখি।

হৃদয়ের আলো হচ্ছে প্রীতির আলো, অপ্রীতি হচ্ছে অন্ধকার। অতএব এই প্রীতির আলোতে আমরা যে-সত্যকে দেখতে পাই, সেইটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে; বাহিরের অন্ধকার তাকে যতই প্রতিবাদ করুক, এই শ্রদ্ধাকে যেন বিচলিত না করে। সত্যপ্রীতির কাছে অল্প বলে কিছু নেই, সত্যপ্রীতি ভূমাকেই জানে। সংসার সেই ভূমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যু সেই ভূমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে থাকে, কিন্তু প্রেমের অন্তরতম অভিজ্ঞতা যেন আপনার সত্যে আপনি বিশ্বাস না হারায়।

আমাদের যে অতি প্রিয়, প্রিয়দর্শন ছাত্রটি এখানে এসেছিল— না-জানার অতলস্পর্শ অন্ধকার থেকে জানার জ্যোতির্ময় লোকে— এল তার জাগ্রত জীবন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ চিত্ত নিয়ে, আমাদের কাজকর্মে সুখে দুঃখে যোগ দিলে— আজ শুনছি সে নেই। কিন্তু যেই শুনলুম সে নেই, অমনি তার কত ছোটো ছোটো কথা বড়ো হয়ে উঠে আমাদের মনের সামনে দেখা দিলে। ক্লাসে যখন সে পড়ত, তখন সেই পড়ার সময়কার বিশেষ দিনের বিশেষ এক-একটি সামান্য ঘটনা, বিশেষ কথায় তার হাসি, বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে তার উৎসাহ, এ-সব কথা এতদিন বিশেষভাবে মনে ছিল না, আজ মনে পড়ে গেল। তার পরে ছেলেদের আনন্দবাজারে যে-সব কৌতুকের উপকরণ সে জড়ো করেছিল, সে সমস্ত আজ বড়ো হয়ে মনে পড়েছে।

বড়োলোকের বড়োকীর্তি আমাদের স্মরণক্ষেত্রে আপনি জেগে উঠে। সেখানে কীর্তিটাই নিজের মূল্যে নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই বালকের যে-সব কথা আমাদের মনে পড়ছে, তাদের তো নিজের কোনো নিরপেক্ষ মূল্য নেই। তারা যে বড়ো হয়ে উঠেছে সে কেবল একটি মূল সত্যের যোগে। সেই সত্যটি হচ্ছে সেই বালকটি স্বয়ং। পূর্বেই বলেছি, সত্য ভূমা। অর্থাৎ বাইরের মাপে, কোনো প্রয়োজনের পরিমাণে, তার মূল্য নয়— তার মূল্য আপনাতেই। সেই মূল্যেই তার ছোটোও ছোটো নয়, তার সামান্য চিহ্নও তুচ্ছ নয়— এই কথাটি ধরা পড়ে প্রেমের কাছে।

তোমাদের সঙ্গে সে যে হেসেছিল, খেলেছিল, একসঙ্গে পড়েছিল, এ কি কম কথা! তার সেই হাসি খেলা, তোমাদের সঙ্গে তার সেই পড়াশোনা, মানুষের চিরউৎসারিত সৌহার্দ্য-ধারারই অঙ্গ, সৃষ্টির মধ্যে যে অমৃত আছে, সেই অমৃতেরই অংশ। আমাদের এখানে তোমাদের যে প্রাণপ্রবাহ, যে আনন্দপ্রবাহ বয়ে চলেছে, তার মধ্যে সেও তার জীবনের গতি কিছু দিয়ে গেল, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সেও আপনাকে কিছু রেখে গেল। এখানে দিনের সঙ্গে দিন, কাজের সঙ্গে কাজ, ভাবের সঙ্গে ভাব, প্রতিদিন যে গাঁথা পড়ছে, নানা রঙে নানা সুতোয় মিলে এখানে একটি রচনাকার্য চলছে। সেইজন্যে এখানে আমাদের সকলেরই জীবনের ছোটো বড়ো নানা টুকরো ধরা পড়ে যাচ্ছে; সেই বালকেরও জীবনের যে অংশ এখানে পড়েছে, সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সেইটুকু রয়ে গেল, এই কথাটি আজ তার শ্রাদ্ধ-দিনে মনে করতে হবে।

তা ছাড়া তার জীবনের কীর্তিও কিছু আছে এখানে। ভুবনডাঙার গরীবদের জন্যে সে এখানে যে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে, তার কথা তোমরা সবাই জান। চাঁদা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময় মঙ্গল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো হচ্ছে নিজের সাধ্য দ্বারা, নিজের উপার্জনের অর্থ দ্বারা কাজ করা। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুলু তাই করেছে। সে পুরোনো কাগজ নিজে বোলপুরে বয়ে নিয়ে বিক্রি করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করত। সে নিজে তাদের শেখাত, তাদের আমোদ দিত। এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য সে নেয় নি। এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত, তা নয়, তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত। তার এই কাজটি, এবং তার চেয়ে বড়ো, তার এই উৎসাহটি, আশ্রমে রয়ে গেল।

পূর্বে বলেছি, অপরিসীম অজানা থেকে জানার মধ্যে মানুষ আসবামাত্রই সেই না-জানার শূন্যতা এক নিমেষে চলে যায়— সেই না-জানার মহা গহ্বর সত্যের দ্বারা নিমেষে পূর্ণ হয়ে

যায়। অন্তরের মধ্যে বুঝতে পারি, আমাদের গোচরতা এবং অগোচরতা, দুইকেই ব্যাপ্ত করে সত্যের লীলা চলছে। অগোচরতা সত্যের বিলোপ নয়। পাবার বেলায় এই যে আমাদের অনুভূতি, ছাড়বার বেলায় একে আমরা ভুলব কেন? ঢেউয়ের চূড়াটি নীচের থেকে উপরে যখন উঠে পড়ল, তখন সত্যের বার্তা পেয়েছি; ঢেউয়ের চূড়াটি যখন উপর থেকে নীচে নেমে পড়ল, তখন সত্যের সেই বার্তাটিকে কেন বিশ্বাস করব না? এক-সময়ে সত্য আমাদের গোচরে এসে 'আমি আছি' এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে লিখে দিল— তার স্বাক্ষর রইল; এখন সে যদি অগোচরে যায়, অন্তরের মধ্যে তার এই দলিল মিথ্যে হবে কেন? ঋষি বলেছেন—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যাঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, মৃত্যু সৃষ্টির বিরুদ্ধ শক্তি নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে যেগুলি চালক-শক্তি, তার মধ্যে অগ্নি হচ্ছে একটি; অণু-পরমাণুর অন্তরে অন্তরে থেকে তাপরূপে অগ্নি যোজন-বিয়োজনের কাজ করছেই। সূর্যও তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে এবং ঋতু সম্বৎসরকে চালনা করছে। জল পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান, বায়ু পৃথিবীর নিশ্বাসে নিশ্বাসে সমীরিত। সৃষ্টির এই ধাবমান শক্তির মধ্যেই মৃত্যুকেও গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই প্রাণকে অগ্রসর করে দিচ্ছে— মৃত্যু ও প্রাণ এই দুইয়ে মিলে তবে জীবন। এই মৃত্যুকে প্রাণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভক্ত করে দেখলে, মিথ্যার বিভীষিকা আমাদের ভয় দেখাতে থাকে। এই মৃত্যু আর প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিরাট ছন্দের মধ্যে আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিধৃত হয়ে লীলায়িত হচ্ছে; এই ছন্দের যতিকে ছন্দ থেকে পৃথক করে দেখলেই তাকে শূন্য করে দেখা হয়; দুইকে অভেদ করে দেখলেই তবে ছন্দকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই যতিকে ছন্দের অঙ্গ বলে দেখা সহজ হয়— কেননা, আমাদের প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে শ্রাদ্ধের দিন হচ্ছে শ্রদ্ধার দিন, এই কথা বলবার দিন যে, মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রদ্ধা করি।

আমাদের প্রেমের ধন স্নেহের ধন যারা চলে যায়, তারা সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে দিক, তারা আমাদের জীবনগৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায়, তার মধ্য দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি, অসীম পূর্ণকেই যেন দেখতে পাই। আমাদের সেই যে অসত্যদৃষ্টি, যা জীবন-মৃত্যুকে ভাগ করে ভয়কে জাগিয়ে তোলে, তার হাত থেকে সত্যস্বরূপ আমাদের রক্ষা করুন, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতে নিয়ে যান।

প্রবাসী
আশ্বিন ১৩৪২

# ছাত্র মুলু

দুর্গম স্থানে যাইবার, অজানা লক্ষ্য সন্ধান করিবার প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক উৎসাহ আছে, বিশেষত যাদের বয়স অল্প। এই যাত্রাকালে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া পদে পদে বাধা অতিক্রম করাই আমাদের প্রধান আনন্দ। কেননা, এইরকম নিজের শক্তির পরিচয়েই মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রবলতা।

এই কারণে আমার মত এই যে, শিক্ষার প্রথম ভূমিকা সমাধা হইবার পরেই ছাত্রদিগকে এমন পাঠ দিতে হইবে যাহা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। অথচ শিক্ষক এই কঠিন পাঠ তাহাদিগকে এমন কৌশলে পার করাইয়া দিবেন যে, ইহা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য না হয়। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাহাতে ছাত্রেরা পদে পদে দুরূহতা অনুভব করে, অথচ তাহা অতিক্রমও করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মনোযোগ সর্বদাই খাটিতে থাকে এবং

সিদ্ধিলাভের আনন্দে তাহা ক্লান্ত হইতে পায় না।

এখানকার বিদ্যালয়ে আমি যখন ইংরেজি শিখাইবার ভার লইলাম, তখন এই মত-অনুসারে আমি কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার দায়িত্ব আমার হাতে আসিল। তৃতীয় শ্রেণীতে আমি যে-সকল ইংরেজি রচনা পড়াইতে শুরু করিলাম, তাহা সাধারণত কলেজে পড়ানো হইয়া থাকে। অনেকেই আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, এরূপ প্রণালীতে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না।

মুলু আমার এই ক্লাসের ছাত্র ছিল। পড়াতে সে কাঁচা এবং পড়ায় তাহার মন নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল। শিশুকাল হইতেই তাহার শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া প্রণালীবদ্ধ-ভাবে পড়াশুনা করার অভ্যাস তাহার ঘটে নাই। এইজন্য নিয়মিত ক্লাসের পড়ায় মন দেওয়া তাহার পক্ষে বিতৃষ্ণাকর এবং ক্লান্তিজনক ছিল।

বাল্যকালে ক্লাসের পড়ায় আমার অরুচি নিরতিশয় প্রবল ছিল, এ কথা আমি অনেকবার কবুল করিয়াছি। এইজন্য প্রাচীন বয়সে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াও পাঠে কোনো ছাত্রের অমনোযোগ বা অরুচি লইয়া ক্রোধ বা অধৈর্য আমাকে শোভা পায় না। পাঠে যাহাতে ছেলেদের মন লাগে এ কথা আমি বিশেষভাবে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি না; অর্থাৎ পাঠে অনবধান বা শৈথিল্যের জন্য সকল দোষ ছেলেদের ঘাড়ে চাপাইয়া ভর্ৎসনা এবং শাস্তির জোরে মাস্টারির কাজ চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

সেইজন্য আমার ক্লাসের ইংরেজি পড়ায় মুলুর মন লাগে কি না তাহা আমার বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল। যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, মুলুর মন লাগিতে কিছুই বিলম্ব হইল না। কোনো কোনো ছেলে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিবার ভয়ে পিছনের আসনে বসিত। কিন্তু মুলুর আসন ছিল ঠিক আমার সম্মুখেই। সে দুরূহ পাঠ্য বিষয়কে যেন উৎসাহী সৈনিকের মতো স্পর্ধার সহিত আক্রমণ করিতে লাগিল।

আমার ক্লাসে ছেলেরা যে বাক্যগুলি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করিত, ঠিক তাহার পরের ঘণ্টাতেই অ্যান্ডরুজ সাহেবের নিকট তাহাদিগকে সেই বাক্যগুলিরই আলোচনা করিতে হইত। মুলু এই-সব বাক্য লইয়া ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করিল। সেই-সকল প্রবন্ধ সে অ্যান্ডরুজ সাহেবের কাছে উপস্থিত করিত। এমন হইল, সে দিনের মধ্যে তিনটা চারিটা প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।

এই যে তাহার উৎসাহ হঠাৎ এতদূর বাড়িয়া উঠিল তাহার কারণ আছে। প্রথমত, আমার ইংরেজি ক্লাসে আমি কখনোই ছাত্রদিগকে বাংলা প্রতিশব্দ বলিয়া দিয়া পাঠ মুখস্থ করাই না, প্রতিপদেই ছাত্রদিগকে চেষ্টা করিতে দিই। এই চেষ্টা করিবার উদ্যমে মুলুর চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তৃপ্ত হইত। আমি যতদূর বুঝিয়াছিলাম, বাহির হইতে কোনো শাসন বা তাগিদ সম্বন্ধে মুলু অসহিষ্ণু ছিল। তাহার পরে, তাহাদের পাঠ্য বিষয় বিশেষরূপ কঠিন ছিল বলিয়াই মুলু তাহাতে গৌরব বোধ করিত। এই কঠিন পাঠে তাহাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা সে অনুভব করিয়াছিল। এইজন্য ইহার যোগ্য হইবার জন্য তাহার বিশেষ জেদ ছিল। আর-একটি কথা এই যে, আমি নুম্যান, ম্যাথ্যু আর্নল্ড, স্টিফেন্সন্ প্রভৃতি লেখকের রচনা হইতে যে-সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে পড়াইতাম, তাহার মধ্যে গভীরভাবে ভাবিবার কথা যথেষ্ট ছিল। এই কথাগুলি কেবলমাত্র ইংরেজি বাক্য শিক্ষার উপযোগী ছিল, এমন নহে। ইহাদের মধ্যে প্রাণবান সত্য ছিল— সেই সত্য মুলুর মনকে যে আলোড়িত করিয়া তুলিত তাহার প্রমাণ এই যে, এইগুলি কেবলমাত্র জানিয়া ইহার অর্থ বুঝিয়াই সে স্থির থাকিতে পারিত না; ইহাতে তাহার নিজের রচনাশক্তিকে উদ্রিক্ত করিত। কাঠে অগ্নি সংস্পর্শ সার্থক হইয়াছে তখনি বুঝা যায় যখন কাঠ নিজে জ্বলিয়া উঠে। ছাত্রদের মনে শিক্ষা তখনি সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝি, যখন তাহারা কেবলমাত্র গ্রহণ করে এমন নহে, পরন্তু যখন তাহাদের সৃজনশক্তি উদ্যত হইয়া

উঠে। সে শক্তি বিশেষ কোনো ছাত্রের যথেষ্ট আছে কি নাই, সে শক্তির সফলতার পরিমাণ অল্প কি বেশি, তাহা বিচার্য নহে, কিন্তু তাহা সচেষ্ট হইয়া ওঠাই আসল কথা। মুলু যখন তাহার নবলব্ধ ভাবগুলি অবলম্বন করিয়া দিনে দুটি-তিনটি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল, তখন অ্যান্ডরুজ সাহেব তাহার মনের সেই উত্তেজনা লইয়া প্রায় আমার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন।

এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানসিক উদ্যমশীল বালক অল্প কিছুদিন আমার কাছে পড়িয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাকে কোনো একটা বাঁধা নিয়মে টানিয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন; ইহার নিজের বিচার-বুদ্ধি ও সচেষ্ট মনকে সহায় না পাইলে ইহাকে বাহিরে বা ভিতরে চালনা করা দুঃসাধ্য। সকল ছেলে সম্বন্ধেই এ কথা কিছু-না-কিছু খাটে এবং এইজন্যই প্রচলিত প্রণালীর শিক্ষাব্যাপারে সকল মানবসন্তানই ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয় এবং জবরদস্তি দ্বারা তাহার সেই স্বাভাবিক বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাকে পীড়া দেওয়াই বিদ্যালয়ের কাজ। বাহ্য শাসন সম্বন্ধে মুলুর সেই বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইত না বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং ইহাও আমার বিশ্বাস ছিল যে, অন্তত ক্লাসে ইংরেজি পড়া সম্বন্ধে আমি তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে অকৃতকার্য হইতাম না।

প্রবাসী
আশ্বিন ১৩৪২

# শিবনাথ শাস্ত্রী

শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁহাকে আমি যেটুকু চিনিতাম, সে আমার পিতার সহিত তাঁহার যোগের মধ্য দিয়া।

আমার পিতার জীবনের সঙ্গে তাঁহার সুরের মিল ছিল। মতের মিল থাকিলে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হয় ভক্তি হয়, সুরের মিল থাকিলে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ঘটে।

আমার পিতার ধর্মসাধনা তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ তাহার সাধনা খালকাটা জলের মতো ছিল না, সে ছিল নদীর স্রোতের মতো। সেই নদী আপনার ধারার পথ আপনি কাটিয়া সমুদ্রে গিয়া পৌঁছে। এই পথ হয়তো বাঁকিয়া-চুরিয়া যায়, কিন্তু ইহার গতির লক্ষ্য আপন স্বভাবের বেগেই সেই সমুদ্রের দিকে। গাছ আপন সকল পাতা মেলিয়া সূর্যালোককে সহজেই গ্রহণ করে এবং আপন জীবনের সহিত তাহাকে মিলিত করিয়া আপনার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত করিয়া তুলে। এই গাছকে বাধার মধ্যে রাখিলেও সে স্বভাবের একাগ্র প্রেরণায় যে-কোনো ছিদ্রের মধ্য দিয়া আপন আকাঙ্ক্ষাকে সূর্যালোকের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই আকাঙ্ক্ষা গাছটির সমগ্র প্রাণশক্তির আকাঙ্ক্ষা।

তেমনি বুদ্ধিবিচারের অনুসরণে নয় কিন্তু আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অনুধাবনেই পিতৃদেব সমস্ত কঠিন বাধা ভেদ করিয়া অসীমের অভিমুখে জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমগ্রজীবনের সহজ ব্যাকুলতার স্বভাবটি শিবনাথ ঠিকমতো বুঝিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার নিজের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার এই সহজ বোধটি ছিল।

তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে যে সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহার বাধা অত্যন্ত কঠিন। কেননা, সে শুধু অভ্যাসের বাধা নহে; শুধু জন্মগত বিশ্বাসের বেষ্টন নহে। মানুষের সব চেয়ে প্রবল অভিমান যে ক্ষমতাভিমান সেই অভিমান তাহার সঙ্গে জড়িত। এই অভিমান লইয়া পৃথিবীতে কত ঈর্ষা দ্বেষ, কত যুদ্ধবিগ্রহ। ব্রাহ্মণের সেই প্রভূত সামাজিক ক্ষমতা, সেই অভ্রভেদী বর্ণাভিমানের প্রাচীরে বেষ্টিত থাকিয়াও তাঁহার আত্মা আপনার স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তমসো মা জ্যোতির্গময় এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই, বুদ্ধিবিচার হইতে পান নাই, ইহা তাঁহার জীবনীশক্তিরই

কেন্দ্রনিহিত ছিল, এইজন্য তাঁহার সমস্ত জীবনের বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা।

জাগ্রত আত্মার এই স্বভাবের গতিটিই সকল ধর্ম-সমাজের প্রধান শিক্ষার বিষয়। সাধকের মধ্যে ইহারই রূপটি ইহারই বেগটি যদি দেখিতে পাই তবেই সে আমাদের পরম লাভ হয়। মতের ব্যাখ্যা এবং উপদেশকে যদি বা পথ বলা যায় কিন্তু দৃষ্টি বলা যায় না। বাঁধা পথ না থাকিলেও দৃষ্টি আপন পথ খুঁজিয়া বাহির করে। এমন-কি, পথ অত্যন্ত বেশি বাঁধা হইলেই মানুষের দৃষ্টির জড়তা ঘটে, মানুষ চোখ বুজিয়া চলিতে থাকে, অথবা চিরদিন অন্যের হাত ধরিয়া চলিতে চায়। কিন্তু প্রাণক্রিয়া প্রাণের মধ্য দিয়াই সঞ্চারিত হয়। আত্মার প্রাণশক্তি সহজ প্রাণশক্তির দ্বারাই উদ্‌বোধিত হয়। কেবল বাহিরের পথ বাঁধায় নহে, সেই অন্তরের উদ্‌বোধনে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছেন শিবনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা। মানুষের ভালোমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালোবাসিবার শক্তি খুব বড়ো শক্তি। যাঁহারা শুষ্কভাবে সংকীর্ণভাবে কর্তব্যনীতির চর্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল এইজন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হয়। তিনি ছোটো ও বড়ো, নিজের সমাজের ও অন্য সমাজের নানাবিধ মানুষের প্রতি এমন একটি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন যাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার হৃদয় প্রচুর হাসিকান্নায় সরস সমুজ্জ্বল ও সজীব ছিল, কোনো ছাঁচে ঢালাই করিয়া কঠিন আকারে গড়িয়া তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজস্র গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন— মানববাৎসল্য হইতেই এই গল্প তাঁর মনে কেবলই জমিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের সঙ্গে যেখানে তাঁর মিলন হইয়াছে সেখানে তার নানা ছোটোবড়ো কথা নানা ছোটোবড়ো ঘটনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে এবং চিরদিনের মতো তাঁর মনের মধ্যে তাহা থাকিয়া গেছে।

অথচ এই তাঁর মানববাৎসল্য প্রবল থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁহাকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে তো আঘাত করিয়াইছেন, তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহাদের চরিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে বার বার তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মানুষের প্রতি তাঁহার ভালোবাসা সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মানব-প্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীরিত।

প্রবাসী

অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

# বিদ্যাসাগর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের বেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন।— এমন দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করে নি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে তার পথে সহস্র বাঁধ বেঁধে সমাজকে নিরাপদ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। এতেই তাঁর চারিত্রের অসামান্যতা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্তু চারিত্র-বল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্র-বল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিগত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধি-গত সেই প্রবলেরা অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মানতে পারে না। মানসিক চারিত্র-বলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সব চেয়ে বড়ো হয়ে লেগেছে।

বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিস; যারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ত দেখে বলে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে সত্য সুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে ফেলেছে; তারা বলে যে তাদের ধর্ম-কর্ম বিষয়-ব্যাপারের যা-কিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, তারা প্রাণের নিয়ম অনুসারে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে নি, সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে জিনিসটাই তাদের নয়।

এইরূপে সুসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর হয়, এমন-কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে যাচাই করে নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই-সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোনো রকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এইটেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

সেইজন্যেই আশ্চর্যের কথা এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন এই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অনুভব করে ধর্মবুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে কীরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে তিনি কত বড়ো সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিন জয়ী হয়েছিলেন বলে গৌরব করতে পারি নে। কারণ সত্যের জয়ে দুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দরকার। কিন্তু ধর্মযুদ্ধে যাঁরা বাহিরে পরাভব পান তাঁরাও অন্তরে জয়ী হন, এই কথাটি জেনে আজ আমরা তাঁর জয়কীর্তন করব।

বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্‌যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু যাঁর অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড়ো রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশি বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত-বিদ্যারই চর্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চির-যৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব চেয়ে পূজনীয় কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তুত করে গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে ভাবী যুগে যাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে দেওয়া। তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে দেন। কিন্তু বাধাই যে-দেশের দেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান করতে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড়ো পরিচয় হয়ে থাকবে। এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন, তা হলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য করতে হত না। কিন্তু যাঁরা বড়ো, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি করবার জন্যে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময় স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না।

এ কথা মানতেই হবে যে বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন করেছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে যে যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পান নি। তিনি যদিও তাতে কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড়ো তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পান নি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান, তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান

গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টিকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে— অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষে আর-একজনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে— যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মানুষ নূতন নূতন দেশে নিষ্ক্রমণ করে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনই মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্র-মহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন। আমরা অনুভব করতে পারি না যে এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। যারা ছোটো, বড়োর বড়োত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড়ো অপরাধ বলে গণ্য করে। এই কারণেই ছোটোর আঘাতই বড়োর পক্ষে পূজার অর্ঘ্য।

যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্যে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনোই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকেই বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যা অজ্ঞাত যা অলব্ধ তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয় নি। যারা এমনিভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই বলে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে যে অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্যে। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনের পা-কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পা-কে পিছনে টেনে রাখত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয় যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। একদিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান হতে পারছি না,

অন্যদিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়ে থাকতেও পারছি না। তাই আমরা একদিকে মোটর-বেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য-সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলছি যে বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে না পিছে কোনো দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে রাখতে চাচ্ছি, তাই আমদের দুর্গতির অন্ত নেই।

আজ আমরা বলব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পদকে কৃপণের ধনের মতো মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন করতে উদ্যমশীল হয়েছেন তাঁরাই চিরস্মরণীয়, কারণ তাঁরাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক। তাঁদের সকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেন তা নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাঁদের কর্মক্ষেত্র অনুসারে সার্থকতার তারতম্য হয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এঁদের মতো লোকের জন্ম হয়।

আজকাল আমরা দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান করছি তা কতকটা দেশাভিমানবশত। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ করবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ করছি, কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হই নি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেন নি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে এমন একদিন আসবে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে থাকব না, যেদিন 'যুদ্ধং দেহি' বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যাঁরা প্রত্যূষেই জাগ্রত হয়েছিলেন, তাঁদের বলব, 'ধন্য তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয় নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করছিল।'

সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বলতে পারব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

প্রবাসী
ভাদ্র ১৩২৯

## · ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ওঁ

অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব যাঁর চরিত্রে দীপ্তিমান হয়ে দেশকে সমুজ্জ্বল করেছিল, যিনি বিধিদত্ত সম্মান পূর্ণভাবে নিজের অন্তরে লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তবে তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

শনিবারের চিঠি

বৈশাখ ১৩৬৮

## · ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যে সযত্ন-স্মরণীয় বার্তা সর্বজনবিদিত, তারও পুনরুচ্চারণের উপলক্ষ বারংবার উপস্থিত হয়, যে মহাত্মা বিশ্বপরিচিত, বিশেষ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাঁরও পরিচয়ের পুনরাবৃত্তির জন্যে। মানুষ আপন দুর্বল স্মৃতিকে বিশ্বাস করে না, মনোবৃত্তির তামসিকতায় স্বজাতির গৌরবের ঐশ্বর্য অনবধানে মলিন হয়ে যাবার আশঙ্কা ঘটে, ইতিহাসের এই অপচয় নিবারণের জন্যে সতর্কতা পুণ্যকর্মের অঙ্গ। কেননা কৃতজ্ঞতার দেয় ঋণ যে জাতি উপেক্ষা করে, বিধাতার বরলাভের সে অযোগ্য।

যে-সকল অপ্রত্যাশিত দান শুভ দৈবক্রমে দেশ লাভ করে, সেগুলি স্থাবর নয়; তারা প্রাণবান, তারা গতিশীল, তাদের মহার্ঘতা তাই নিয়ে। কিন্তু সেই কারণেই তারা নিরন্তর পরিণতির মুখে নিজের আদি পরিচয়কে ক্রমে অনতিগোচর করে তোলে। উন্নতির ব্যবসায়ে মূলধনের প্রথম সম্বল ক্রমশই আপনার পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্তন এমন করে ঘটাতে থাকে, যাতে করে তার প্রথম রূপটি আবৃত হয়ে যায়, নইলে সেই বন্ধ্যা টাকাকে লাভের অঙ্ক গণ্য করাই যায় না।

সেইজন্যেই ইতিহাসের প্রথম দূরবর্তী দাক্ষিণ্যকে সুপ্রত্যক্ষ করে রাখবার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা করে জানা চাই যে, নিরন্তর অভিব্যক্তির পথেই তার অমরতা, নির্বিকার জড়ত্বের বন্দিশালায় নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। তাঁর পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানাদিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর-একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টিতে; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে, তার সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।

ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষসৃষ্টি-কার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ন করেন না। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পী-জনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজে

গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারে নি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলা ভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় মর্যাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলা ভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয় নি।

শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন, তার ছাঁদটি বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গির অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এইসঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এখনো আমার সম্মাননিবেদন সম্পূর্ণ হয় নি। সব শেষের কথা উপসংহারে বলতে চাই। প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম, তবু আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার বন্ধন-বিমুক্ত মন। সেই স্বাধীনচেতা তেজস্বী ব্রাহ্মণ যে অসামান্য পৌরুষের সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধতাকে একদা তাঁর সকরুণ হৃদয়ের আঘাতে ঠেলে দিয়ে উপেক্ষা করেছিলেন, অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন শুভ সংকল্পকে, সেই তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের বহু লোক সসংকোচ নিঃশব্দে অতিক্রম করে থাকেন। এ কথা ভুলে যান যে, আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড়ো কথা নয়, কিন্তু যে দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রতপালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। তাঁর জীবনীতে দেখা গেছে, ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন, তেমনিই যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রবর্তনায় দণ্ডপাণি সমাজ-শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি, সেও কঠিন সংকটের বিপক্ষে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। দীন দুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা দয়া করেছেন, সে কথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করে; কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতা আরো অনেক বেশি, কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়, তাঁর বীরত্ব। তাই কামনা করি, আজ তাঁর যে কীর্তিকে লক্ষ্য করে এই স্মৃতিসদনের দ্বার উন্মোচন করা হল, তার মধ্যে সর্বসমক্ষে সমুজ্জ্বল হয়ে থাক্ তাঁর মহাপুরুষোচিত কারুণ্যের স্মৃতি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১ পৌষ, ১৩৪৬

# • সুকুমার রায়

## সুকুমার রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে

মানুষ যখন সাংঘাতিক রোগে পীড়িত, তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রাণশক্তির সংগ্রামটাই সকলের চেয়ে প্রাধান্যলাভ করে। মানুষের প্রাণ যখন সংকটাপন্ন তখন সে যে প্রাণী এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য জীবের মতোই আমরা যে কেবলমাত্র প্রাণী মানুষের এই পরিচয় তো সম্পূর্ণ নয়। যে প্রাণশক্তি জন্মের ঘাট থেকে মৃত্যুর ঘাটে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয় আমরা তার চেয়ে বড়ো পাথেয় নিয়ে জন্মেছি। সেই পাথেয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমাদের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দেবার জন্যে। যারা কেবল প্রাণীমাত্র মৃত্যু তাদের পক্ষে একান্ত মৃত্যু। কিন্তু মানুষের জীবনে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই কথাটি আমরা ভুলে যাই। সেইজন্যে সংসারে জীবনযাত্রার ব্যাপারে ভয়ে, লোভে, ক্ষোভে পদে পদে আমরা দীনতা প্রকাশ করে থাকি। সেই আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে আমাদের প্রাণের দাবি উগ্র হয়ে ওঠে, আত্মার প্রকাশ ম্লান হয়ে যায়। জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে যে-কোনো মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তোলেন অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা।

আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।

আমাদের প্রাণের বাহন দেহ যখন দীর্ঘকাল অপটু হয়, শরীরের ক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে যখন বিচিত্র দুঃখ দুর্বলতার সৃষ্টি করে, তখন অধিকাংশ মানুষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারে না, তার সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের সত্যকে যাঁরা জানেন তাঁরা এই কথা জানেন যে, জরামৃত্যু রোগশোক ক্ষতিঅপমান সংসারে অপরিহার্য, তবু তার উপরেও মানবাত্মা জয়লাভ করতে পারে এইটেই হল বড়ো কথা। সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মানুষ আছে; দুঃখ তাপ থেকে পালাবার জন্যে নয়। যে-শক্তির দ্বারা মানুষ ত্যাগ করে, দুঃখকে ক্ষতিকে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেই শক্তিই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে তার অস্তিত্বের সত্যটি সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ আয়ুকালের ছোটো সীমানার মধ্যে বদ্ধ নয়। মর্ত্যপ্রাণের পরিধির বাইরে মানুষ যদি শূন্যকেই দেখে তা হলে সে আপনার প্রাণটুকুকে, বর্তমানের স্বার্থ ও আরামকে, একান্ত করে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি আপনার মধ্যে অনুভব করেছে বলেই মৃত্যুর অতীত সত্যকে শ্রদ্ধা করতে পারে।

জীবনের মাঝখানে মৃত্যু যে-বিচ্ছেদ আনে তাকে ছেদরূপে দেখে না সেই মানুষ, যে মানুষ নিজের জীবনেরই মধ্যে পূর্ণতাকে উপলব্ধি করেছে। যে মানুষ রিপুর জালে বন্দীকৃত, পরকে যে আপন করে জানে নি, বৈষয়িকিতায় বৃহৎ বিশ্ব থেকে যে নির্বাসিত, মৃত্যু তার কাছে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ংকর। কেননা জগতে মৃত্যুর ক্ষতি একমাত্র আমি পদার্থের ক্ষতি। আমার সম্পত্তি, আমার উপকরণ, দিয়ে আমার সংসারকে আমি নিরেট করে তুলেছিলেম, মৃত্যু হঠাৎ এসে এই আমি-জগৎটাকে ফাঁকা করে দেয়। যে আমি নিজের আশ্রয়নির্মাণের জন্যে স্থূল বস্তু চাপা দিয়ে কেবলই ফাঁক ভরাবার চেষ্টায় দিনরাত নিযুক্ত ছিল সে এক মুহূর্তে কোথায় অন্তর্ধান করে এবং জিনিসপত্রের স্তূপ পুঞ্জীভূত নিরর্থকতা হয়ে পড়ে থাকে। সেইজন্যে যে বিষয়ী, যে আত্মম্ভরী,

মৃত্যু তার পক্ষেই অত্যন্ত ফাঁকি। আমিকে জীবনে যে অত্যন্ত বড়ো করে নি সেই তো মৃত্যুকে সার্থক করে জানে।

সাহিত্যে চিত্রকলায় ব্যঞ্জনাই রসের প্রধান আধার। এই ব্যঞ্জনার মানে, কথাকে বিরল করে ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভাবের ধারা বইয়ে দেওয়া। বাক্য ও অলংকারের বিরলতার ভিতর দিয়ে যাঁরা ইঙ্গিতেই রসকে নিবিড় করেন তাঁরাই গুণী, আর যাঁদের ভাবুক দৃষ্টিতে সেই বিরলতাই রসে পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাঁরাই রসজ্ঞ। ভাবের মহলে যারা অর্বাচীন তারা উপকরণকেই বড়ো করে দেখে সত্যকে নয়। সুতরাং উপকরণের ফাঁক তাদের কাছে সম্পূর্ণই ফাঁক। তেমনি নিজের আয়ুকালটাকে যে মানুষ 'আমি' ও 'আমি'র আয়োজন দিয়েই ঠেসে ভরিয়ে দেয়, সেই মানুষের মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা থাকে না— সেইজন্যে মৃত্যু তার পক্ষে একান্ত মৃত্যু।

দিনের বেলাটা কর্ম দিয়ে, খেলা দিয়ে ভরাট থাকে। রাত্রি যখন আসে, শিশু তখন ভয় পায়, কাঁদে। প্রত্যক্ষ তার কাছে আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে সে মনে করে সবই বুঝি গেল। কিন্তু আমরা জানি, ছেদ ঘটে না, রাত্রি ধাত্রীর মতো দিনকে অঞ্চলের আবরণের মধ্যে পালন করে। রাত্রিতে অন্ধকারের কালো ফাঁকটা যদি না থাকত তা হলে নক্ষত্রলোকের জ্যোতির্ময় ব্যঞ্জনা পেতুম কেমন করে? সেই নক্ষত্র আমাদের বলছে, 'তোমরা পৃথিবী তো এক ফোঁটা মাটি, দিনের বেলায় তাঁকেই তোমার সর্বস্ব জেনে আঁকড়ে পড়ে আছ। অন্ধকারে আমাদের দিকে চেয়ে দেখো— আমরাও তোমার। আমাদের নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে এক হয়ে আছে এই বিশ্ব, এইটেই সত্য।' অন্ধকারের মধ্যে নিখিলবিশ্বের ব্যঞ্জনা যেমন, মৃত্যুর মধ্যেও পরম প্রাণের ব্যঞ্জনা তেমনি।

আমার ফাঁক মানব না। ফাঁককে মানাই নাস্তিকতা। চোখে যেখানে ফাঁক দেখি আমাদের অন্তরাত্মা সেইখানে যেন পূর্ণকে দেখে। আমার মধ্যে এবং অন্যের মধ্যে মানুষে মানুষে তো আকাশগত ফাঁক আছে; যে লোক সেই ফাঁকটাকেই অত্যন্ত বেশি করে সত্য জানে সেই হল স্বার্থপর সেই হল অহংনিষ্ঠ। সে বলে, ও আলাদা, আমি আলাদা। মহাত্মা কাকে বলি যিনি সেই ফাঁককে আত্মীয়সম্বন্ধের দ্বারা পূর্ণ করে জানেন, জ্যোতির্বিৎ যেমন করে জানেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝখানকার শূন্য পরস্পরের আত্মীয়তার আকর্ষণসূত্র বহন করছে। এক দেশের মানুষের সঙ্গে আর-এক দেশের মানুষের ফাঁক আরো বড়ো। শুধু আকাশের ফাঁক নয়, আচারের ফাঁক, ভাষার ফাঁক, ইতিহাসের ফাঁক। এই ফাঁককে যারা পূর্ণ করে দেখতে পারলে না তারা পরস্পর লড়াই করে পরস্পরকে প্রতারণা করে মরছে। তারা প্রত্যেকেই 'আমরা বড়ো' 'আমরা স্বতন্ত্র' এই কথা গর্ব করে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে। অন্ধ যদি বুক ফুলিয়ে বলে, 'আমি ছাড়া বিশ্বে আর কিছুই নেই' সে যেমন হয় এও তেমনি। আমাদের ঋষিরা বলেছেন, পরকে যে আত্মবৎ দেখেছে সেই সত্যকে দেখেছে। কেবল কুটুম্বকে, কেবল দেশের মানুষকে আত্মবৎ দেখা নয়, মহাপুরুষেরা বলেছেন শত্রুকেও আত্মবৎ দেখতে হবে। এই সত্যকে আমি আয়ত্ত করতে পারি নি বলে একে অসত্য বলে উপহাস করতে পারব না, একে আমার সাধনার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। কেননা পূর্ণস্বরূপের বিশ্বে আমরা ফাঁক মানতে পারব না। এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমার মনে বেজে উঠেছে তার কারণ সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মতো অত বড়ো বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে পরম শত্রু বলে জানে, তাকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেয়েছেন। তাই আমাকে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন—

> আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
> তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।
> নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
> সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥

যে গানটি তিনি আমাকে দুবার অনুরোধ করে শুনলেন সেটি এই :

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো— গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্মমরণপারে—
এল পথিক সেজে॥
চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে—
আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।
এতকালের ভয়ভাবনা কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে—
কালিমা যায় মেজে।—
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো— গভীর শান্তি এ যে।

জীবনকে আমরা অত্যন্ত সত্য বলে অনুভব করি কেন? কেননা এই জীবনের আশ্রয়ে আমাদের চৈতন্য বহুবিচিত্রের সঙ্গে আপনার বহুবিধ সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধবোধ বর্জিত হয়ে থাকলে আমরা জড় পদার্থের মতো থাকতুম, সকলের সঙ্গে যোগে নিজেকে সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারতুম না। এই সুযোগটি দিয়েছে বলেই প্রাণকে এত মূল্যবান জানি। মৃত্যুর সম্মুখেও যাঁদের চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত থাকে তাঁরা মৃত্যুর মধ্যেও সেই মূল্যটি দেখতে পান। যিনি সকল সম্বন্ধের সেতু, সকল আত্মীয়তার আধার, বহুর মধ্য দিয়ে যিনি এককে বিধৃত করে রেখেছেন, তাঁরা মৃত্যুর রিক্ততার মধ্যে তাঁকেই সুস্পষ্ট করে দেখতে পান। সেইজন্যেই এই মৃত্যুপথের পথিক আমাকে গান গাইতে বলেছিলেন, পূর্ণতার গান, আনন্দের গান। তাঁকে গান শুনিয়ে ফিরে এসে সে রাত্রে আমি একলা বসে ভাবলুম, মৃত্যু তো জীবনের সব শেষের ছেদ, কিন্তু জীবনেরই মাঝে মাঝেও তো পদে পদে ছেদ আছে। জীবনের গান মরণের শমে এসে থামে বটে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার তাল তো কেবলই মাত্রায় মাত্রায় ছেদ দেখিয়ে যায়। সেই ছেদগুলি যদি বেতালা না হয়, যদি তা ভিতরে ভিতরে ছন্দোময় সংগীতের দ্বারা পূর্ণ হয় তা হলেই শমে এসে আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু ছেদগুলি যদি সংগীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে চলে, তা হলেই শম একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে। জীবনের ছেদগুলি যদি ত্যাগে, ভক্তিতে, পূর্ণস্বরূপের কাছে আত্মনিবেদনে ভরিয়ে রাখতে পারি— মৌচাকের কক্ষগুলি মৌমাছি যেমন মধুতে ভরিয়ে রাখে— তা হলে যাই ঘটুক না, কিছুতেই ক্ষতি নেই। তা হলে শূন্যই পূর্ণের ব্যঞ্জনাকে বহন করে। বিশ্বের মর্মকুহর থেকে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে ওঁ, হাঁ— আমি আছি। আমাদের অন্তর থেকে আত্মা সুখে দুঃখে উৎসবে শোকে সাড়া দিক ওঁ, হাঁ, সব পূর্ণ, পরিপূর্ণ! বলুক,

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥

শান্তিনিকেতন পত্রিকা
ভাদ্র ১৩৩০

# সুকুমার রায়

সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গ

রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীয় রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকাল-মৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।

২।৬।৪০
গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

# উইলিয়াম পিয়ার্সন

ভারতবর্ষে ফিরিবার ঠিক পূর্বে ইটালিতে ভ্রমণকালে শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পিয়ার্সন মহাশয়ের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তাঁহার নাম জনসাধারণের নিকট বিস্তৃতভাবে পরিচিত না হইতে পারে, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা শুধু তাঁহার আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের প্রতি ভালোবাসা তাঁহার কাছে যেরূপ সত্যকার সামগ্রী ছিল, সেবার আদর্শকে তিনি তাঁহার স্বভাবের সহিত যেরূপ পূর্ণভাবে মিলাইতে পারিয়াছিলেন, খুব কম লোকেরই ভিতর আমরা তাহা দেখিয়াছি। যে-সকল অজ্ঞাত অখ্যাতনামা লোকের মধ্যে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতোও কোনো বিশেষত্ব ছিল না, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাহাদের নিজের সখ্য দান করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, এবং এই দানের মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অহংকার রিপুর সৎকর্ম-সাধনজনিত আত্মতৃপ্তিগত ভাববিলাসের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোককে তিনি নিত্যনিয়ত যে-সাহায্য করিতেন তাহার জন্য তাঁহার সর্বসাধারণের প্রশংসা দ্বারা পুরস্কৃত হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহার কাছে নিজের দৈনিককৃত্যের মতোই তাহা নিতান্ত সহজ এবং প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার দেশপ্রেম ছিল সর্বমানবের দেশের প্রতি, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের লোকের উপর কিছুমাত্র অবিচার বা নিষ্ঠুর আচরণ ঘটিলে তিনি অন্তরের সহিত বেদনা অনুভব করিতেন, এবং মহৎভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তিনি নির্ভীকচিত্তে আপন দেশবাসীর নিকট শাস্তি বরণ করিয়া লইয়াছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তিনি আপন আবাসভূমি বলিয়া জানিয়াছিলেন, তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, এইখানেই তিনি তাঁহার বিশ্বমানবের প্রতি সেবার আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং যে-ভারতের কল্যাণের সহিত তাঁহার জীবনের সকল আশা জড়িত ছিল, তাহার প্রতিও নিজের সুগভীর ভালোবাসা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন।

আমি জানি এ দেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁহারা তাঁহার মহৎ নিঃস্বার্থ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেন, এবং তাঁহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁহারা তাঁহার মৃত্যুসংবাদে মর্মাহত হইয়াছেন। আমার মনে দৃঢ় ধারণা যে তাঁহার এই প্রিয় আশ্রমে তাঁহার নামে একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করিবার ইচ্ছাকে সকলেই অনুমোদন করিবেন। আমাদের আশ্রম-সংক্রান্ত হাসপাতালটি যাহাতে নূতন করিয়া তৈরি হয়, এবং যথাবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের পর উত্তমরূপে চালিত হয়, ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, এবং বরাবরই তিনি এইজন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং যথাসম্ভব অর্থদান করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আমরা যদি তাঁহার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে পারি, এবং ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রাখিয়া একটি ভালোরকম হাসপাতাল নির্মাণ করি, তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতিকে যথার্থ সম্মান করা হইবে, এবং মানবের দুঃখকষ্টে তিনি যে সমবেদনা অনুভব করিতেন তাহার আদর্শ এই হাসপাতাল আমাদের সর্বদা মনে করাইয়া দিবে। এই অভিপ্রায়ে আমরা তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং

তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন এমন সব লোকের নিকট আজ উপস্থিত হইতেছি, এবং আশা করিতেছি যে এ বিষয়ে সকলেই আমাদের মুক্তহস্তে দান করিয়া সাহায্য করিবেন।

প্রবাসী

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

# পরলোকগত পিয়র্সন

এই আশ্রমের ছাত্র অধ্যাপক বন্ধু একে একে অনেকেই এখান থেকে চলে গেছেন, আজ তাঁদের সকলকে স্মরণ করতে হবে। আজ তাঁরা অন্য প্রবেশপথ দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁরা অমৃতলোকে প্রবেশ করেছেন। আজ আমরা যেন তাঁদের মধ্যে নিত্যস্বরূপের পরিচয় পাই।

যে-সব ছাত্র এখানে থেকে কিছু নেবার জন্য এসেছিল সেই নেওয়ার আনন্দের মধ্যেই তারা একটি বড়ো জিনিস এখানে রেখে গেছে। শিশু যেমন পৃথিবীতে মাতৃস্তন্যের ভিক্ষু হয়ে আসে আর তাদের সেই ক্ষুধার আবেদনের দ্বারাই এবং মাতৃস্নেহের দানকে সহজ আনন্দে গ্রহণ করার দ্বারাই মাতার স্বরূপকে সহজ করে দেয় তেমনি যে-সব ছাত্র এখানে আশ্রম-জননীর কাছ থেকে সূর্যোদয়ের আলোক-বাণী শুনেছে, অমৃতঅন্নের দান গ্রহণ করেছে তাদের সেই দান গ্রহণের সহজ আনন্দের দ্বারাই এখানকার আশ্রমের সত্যটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শুষ্ক ভূমিতে যখন বর্ষণ হয় তখন সেই ভূমি আবার বারিধারাই ফিরিয়ে দেয় না, কিন্তু তার শ্যামল সফলতার দ্বারাই সেই দানের প্রতিদান করে— আর এই দেওয়া-নেওয়ায় আকাশ-ধরণীর মিলন সার্থক ও সুন্দর হতে থাকে। যে-সব ছাত্র এখানে এসেছিল, আর প্রাণপ্রবাহের কল্লোলে আশ্রম মুখরিত করে তুলেছিল তারা যদি জীবনযাত্রার পাথেয়স্বরূপ এখান থেকে কিছু আহরণ করে থাকে, যদি তাদের দুঃখদুর্দিনে তা শান্তিদান করে থাকে, তবে তাদের সেই চরিতার্থতা তাদের তেমন নয় যেমন এই আশ্রমের। যে-সন্তান প্রবাসে চলে গেছে, যদিচ মাতার সেবার পরে আর তার নির্ভর থাকে না তবু মাতার অন্তরের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয় না, কেননা মাতার জীবনের মধ্যে গভীরভাবে সেই সন্তানের জীবন মিলিত। তেমনি যে-সকল ছাত্র ইহলোক থেকে চলে গেছে তারাও আশ্রমের জীবনভাণ্ডারে তাদের জীবনের দান রেখে গেছে, এই আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে তারা মিলিত হয়ে গেছে, এইজন্যে তারা চলে গেলেও তাদের সঙ্গে আশ্রমের বিচ্ছেদ ঘটে না। সেই-সকল এবং পরলোকগত অধ্যাপক বন্ধুদের আজ আমরা স্মরণ করি।

কিন্তু আমাদের যে বন্ধুর আগমনের জন্যে আমরা কিছুকাল ধরে প্রতীক্ষা করছিলুম, কিন্তু যাঁর আর আসা হল না সেই অকাল-মৃত্যুগ্রস্ত আমাদের পরম সুহৃৎ পিয়র্সনের কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করার দিন। তিনি চলে যাওয়ায় ক্ষতির কথা কিছুতে আমরা সহজে ভুলতে পারি নে। কিন্তু তাঁকে কেবল এই ক্ষতির শূন্যতার মধ্যে দেখলে ছোটো করে দেখা হবে। আমাদের যে ধন বাইরের জিনিস বাইরে থেকে যাবামাত্রই তার ক্ষতি একান্ত ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যাঁর জীবন নিজের আমি-গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যিনি কেবল নিজেরই মধ্যে বেঁচে ছিলেন না মৃত্যুর দ্বারা তাঁর বিনাশ হবে কী করে?

এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইংলণ্ডে। যেদিন তাঁর বাড়িতে প্রথম যাই সেদিন গিয়ে দেখি যে দরজার কাছে সেই সৌম্যমূর্তি প্রিয়দর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে অবনত হয়ে আমার পায়ের ধুলা নিলেন। আমি এমন কখনো প্রত্যাশা করি নি, তাই চমকে গেলুম। আমি তাঁর সেই নতি-স্বীকারের যোগ্য না হতেও পারি, অর্থাৎ এর দ্বারা আমার কোনো পরিচয় আমি দাবি করি নে কিন্তু এর দ্বারা তাঁরই একটি উদার পরিচয় পাওয়া যায়— সেটি হচ্ছে এই যে, তাঁর আত্মা ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রতাপের বেড়াটুকুর মধ্যে বাঁধা ছিল না, ন্যাশানালিজমের বিরাট অহমিকায় তাঁকে পেয়ে বসে নি, নিখিলমানবের পৃথিবীতেই তাঁর স্বদেশ

ছিল। সেদিন তাঁর স্বজাতীয় অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হয়তো তাঁরা কেউ কেউ মনে করে থাকবেন এতে রাজ-সম্মানের হানি করা হল। কারণ তাঁদের প্রত্যেকেরই ললাট ইংরেজের রাজটিকা বহন করছে। বাহ্যত সেই ললাট ভারতীয়ের কাছে নত করা রাজশক্তির অসম্মান করা। কিন্তু ইংরেজের রাজশক্তিতে পিয়র্সন কোনো দিন আপন অধিকার দাবি করেন নি। এমনিভাবে আমাদের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত।

তারপর যখন তিনি প্রথমে শান্তিনিকেতনে এলেন তখন বাইরের দিক থেকে আমরা তাঁকে কীইবা দেখতে পেরেছিলুম? আমার ইস্কুল ছিল অতি সামান্য, তার এমন ধনগৌরব ছিল না যে সাধারণ লোকের প্রশংসা আদায় করতে পারি। আমার দেশের লোক আমার এই কাজকে তখন স্বীকার করে নি। বাইরের প্রাঙ্গণে তখন এর আলো জ্বলে নি। কিন্তু তিনি এর ভিতর মহলের একটি আলো দেখতে পেয়েছিলেন, তাই সেই আলোকের কাছে তাঁর জীবনের দীপকে জ্বালিয়ে উৎসর্গ করে দিতে তাঁর আনন্দ বোধ হয়েছিল। বাহিরের সমারোহের জন্যে তাঁকে এক-মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হয় নি। আমি জানি তাঁকে কলেজের প্রিন্সিপাল করবার জন্য কেহ কেহ পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু তিনি উচ্চবেতনের পদের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবন যৌবন আরাম অবকাশ সমস্তই একে নিঃশেষে দিয়েছেন। ইংরেজের প্রভুত্বমর্যাদা তাঁর ছিল— দাবি করেন নি; ভোগ করবার নবীন বয়স ছিল— ভোগ করেন নি; দেশে মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ছিল— তাদের সঙ্গ ও সেবা ছেড়ে এসেছেন; নগ্ন পদে ধুতি জামা পরে বাঙালির ছেলের মতো থেকে এই আশ্রমের সেবা করে গেছেন; মুহূর্তকালের জন্য দুঃখ পরিতাপ বোধ করেন নি। তিনি মনে করতেন যে এই পরম সুযোগ লাভ করে তিনি ধন্য হয়েছেন। এর জন্য তিনি কতখানি কৃতজ্ঞ ছিলেন তা তাঁর *Shantiniketan the Bolpur School* বইখানি পড়লেই জানা যায়। পিয়র্সন সাহেব তাঁর আপন আন্তরিক মহত্ত্বশতই সাধনার মধ্যেই মহত্ত্বের আবির্ভাবকে সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন।

আমরা যখন এত বড়ো মহৎ দান পেয়ে থাকি তখন আমাদের একটি খুব বড়ো বিপদের আশঙ্কা থাকে; সে হচ্ছে পাছে আমরা ভিক্ষুকের মতো দান গ্রহণ করি। ভিক্ষু যখন দান পায় তখন দানটাকেই সে যাচাই করে থাকে, জানতে চায় বাজারে তার মূল্য কত। দাতা তার কাছে গৌণ। দানের দ্বারা দাতা নিজের কত বড়ো পরিচয় দিলে সেটাকে সে তার ব্যবহারের পক্ষে আবশ্যক মনে করে না। এমন-কি, তার দাবির মহিমাকেই সে বড়ো করতে চায়, মনে করতে চায় দান প্রাপ্তিতে তার অধিকার আছে। এতে কেবল এই বোঝায় যে, আসল জিনিসটা নেবার শক্তি ভিক্ষুকের নেই।

তাই আমাদের পরলোকগত বন্ধু বাইরের কাজ কতটুকু দেখিয়ে গেছেন, তাতে আমাদের কী পরিমাণ লাভ হয়েছে তারই হিসাব নিকাশ করে তার বিচার করলে চলবে না। তিনি তাঁর অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়ে গেছেন এটা বড়ো কথা নয়, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মত্যাগকে দিয়ে গেছেন এইটেই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদই আমাদের চরম সার্থকতার দিকে নিয়ে যায়; আমাদের অন্তরের মধ্যে এরই অভাব সকলের চেয়ে বড়ো দারিদ্র্য। এই আত্মত্যাগ যিনি দান করেন তাঁর দানকে আমরা যদি সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি, তা হলে আমাদের আত্মা শক্তি লাভ করে। আমার 'কথা ও কাহিনী'র প্রথম কবিতায় এই কথাটাই আছে। ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষু-দূত পুরবাসীদের দ্বারে দ্বারে যখন প্রভুর নামে ভিক্ষা চেয়ে ফিরেছিলেন তখন ধনীরা তাঁর কাছে মূল্যবান দানসামগ্রী এনে দিলে, তিনি বললেন, হল না। কেননা সেই দানে ধন ছিল কিন্তু আত্মা ছিল না। দরিদ্র নারী যখন তার একমাত্র গায়ের বসন দিল তখন তিনি বললেন পেয়েছি, কেননা সেই অনাথা ধন দিতে পারে নি, কিন্তু আত্মত্যাগের দ্বারা আত্মাকে দিয়েছে। পরমভিক্ষু আমাদের কাছে সেই আত্মার অর্ঘ্য চান— যাঁরা দিতে পারেন তাঁরাই ধন্য— কারণ তাঁদের সেই নৈবেদ্য, দেবতার ভোগের সামগ্রী, সমস্ত মানুষের পক্ষে

অমৃতঅন্ন। সেই দান সেই অমৃত পিয়র্সন যদি এই আশ্রমে দিয়ে গিয়ে থাকেন তবে আমরা যেন তা সত্যভাবে গ্রহণ করবার শক্তি রাখি। তাঁর দানের থেকে আমরা তার বাহিরের মূল্যটুকু নেব না কিন্তু তার অন্তরের সত্যটুকু নিই। নইলে ভিক্ষুকতার যে ব্যর্থতা ও লজ্জা তার থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই।

সেই সত্যটি কী ভেবে দেখা যাক। পিয়র্সন ছিলেন ইংরেজ, কিন্তু ভারতবর্ষে সম্পূর্ণভাবে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। তার দুঃখে অপমানে ব্যথিত হয়ে তিনি নিজের জাতিকে নিন্দা বা আঘাত করতে লেশমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। যাকে আমরা আজকাল দেশাত্মবোধ নাম দিয়েছি সেই দেশাত্মবোধকেই তিনি সকলের চেয়ে বড়ো মর্যাদা দেন নি। এমন-কি একদা তিনি ভারতের হিত কামনায় সেই দেশাত্মবোধকে এমন আঘাত করেছিলেন যে তাঁর দেশের রাজদণ্ড তাঁকে চীন থেকে তাড়া করে নিয়ে ইংলণ্ডে নজরবন্দী করে রেখেছিল।

প্রবল দেশাত্মবোধ নিয়ে কোনো ইংরেজ কখনো আমাদের কিছু দান করেন না তা নয়, কিন্তু সে দান তাঁর উদ্‌বৃত্ত থেকে। দেশাত্মবোধের ভোজের যে পরিশিষ্ট অনায়াসে দেওয়া যায় তাই। অর্থাৎ আত্মা তিনি দেশকেই দেন, বাহিরের ঝুলিঝাড়া কিছু আমাদের দিয়ে থাকেন। পিয়র্সন তা করেন নি— তিনি তাঁর আত্মাকেই দিয়েছিলেন আমাদের, এবং সেই উপলক্ষে সমস্ত মানুষকে, সমস্ত মানুষের দেবতাকে। আমি তাঁকে দেশ-বিদেশে নানা অবস্থায় দেখেছি— চীনে হোক জাপানে হোক অন্যত্র হোক যেখানেই তিনি দুঃখ বা অপমান দেখেছেন এবং এও অনুভব করেছেন যে, সেই দুঃখ অপমানের মূলে আছে তাঁর স্বজাতি— সেখানে তিনি মুহূর্তকালের জন্য এবং লেশমাত্র পরিমাণেও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করেন নি। তিনি জানতেন যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও উন্নতি এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাণ পোষণের উপর একান্ত নির্ভর করে, তার ধনসম্পদ প্রতাপের চারণক্ষেত্র এই-সকল মহাদেশে; তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর শুভচিন্তা ও সাধু লক্ষ্য বিশুদ্ধভাবে, নিঃস্বার্থভাবে ও সম্পূর্ণভাবে সর্বমানবের অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন।

কিন্তু যখন পিয়র্সনকে আমরা ভারতবন্ধু বলে আদর করি তখন তাঁর জীবনের এই বড়ো সত্যটিকে এক রকম করে চাপা দিয়ে রাখি। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেখানে আমাদের স্বাজাত্য অভিমানকে তৃপ্ত করে সেইখানেই তাঁকে যথার্থভাবে গ্রহণ করি ক্ষণকালের জন্যে চিন্তাও করি নি যে এই স্বাজাত্য অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে তবে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন, এবং সেই মহিমাতেই তাঁর জীবন দীপ্যমান। যদি তাঁর এই সত্যকে আমরা শ্রদ্ধা না করি তবে তাঁর হাত থেকে দান গ্রহণ করবার মতো দীনতা আর কিছু হতেই পারে না। তাঁকে বহিষ্কৃত করে তাঁর দান গ্রহণ করায় তাঁর প্রতি ও নিজের প্রতি যে অশ্রদ্ধা করা হয় সেটা যেন আমরা অনুভব করতে পারি।

সেই বড়ো সত্যকে স্বীকার করবার জন্য বিশ্বভারতীর সাধনা। যাঁরা বিশ্বের জন্য তপস্যা করেছেন এখানে তাঁদের আসন পাতা হোক। আমরা 'বন্দেমাতরম' বলে জয়ধ্বনি করলে কেবল স্বদেশকে ক্ষুদ্র করা হবে, আমরা এই কার্পণ্যের দ্বারা বড়ো হতে পারব না। মানবপ্রেমের অর্ঘ্য হৃদয়ে বহন করে সমুদ্রপার থেকে যে বন্ধুরা আমাদের কাছে আসছেন তাঁদের জীবন বিশ্বভারতীর তপস্যার ভিতর দিয়ে এই কথাই ঘোষণা করছে যে, সকল মানুষের মধ্যে নিজের মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করা মানব সম্বন্ধে সত্যকে পাওয়া।

পিয়র্সন ভারতবর্ষে এসে শুধু যে এর দুঃখকষ্ট অপূর্ণতার মধ্যে একে সেবা করে গেছেন তাই নয় কিন্তু তিনি এখানকার জীবনযাত্রার প্রণালীকে স্বীকার করে নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে আনন্দে বলেছেন, আমি যা পেলুম তা খুব বড়ো জিনিস, আমি কৃতার্থ হলুম।

তা বলবার আসল কারণ এই যে তিনি আপনাকে দিতে গিয়েই বড়ো সম্পদ লাভ করেছেন। আমরা যখন কেবলমাত্র পেতে যাই তখন বড়োকে পাই নে, যখন নিতে যাই তখন ভূমাকে পাই। ভারতবর্ষের উপকার করব বলে যদি কেউ কোমর বেঁধে আসে তা হলে ভারতবর্ষকে যথার্থ

জানতেই পারবে না, উপকার করবে কী! কারণ সেই রকম উপকারের দ্বারা ফল পেতে চায়— সে ফল তাদের মনের মতো। কিন্তু যারা মানবপ্রেমের টানে ভারতের কাছে আপনাকে দিতে চায় তারা সেই দেওয়ার দ্বারাই ভারতের সত্যকে জানতে পারে। তাদের প্রেম শুধু দেয় না, পায়। না পেলে দেওয়াই যায় না।

যাঁরা জীবনের ক্ষেত্রে সেবা করতে, আপনাকে দান করতে আসেন তাঁরা আবিষ্কার করেন যে তাঁরা যা দিচ্ছেন তার চেয়ে বড়ো জিনিস তাঁরা পেয়ে যাচ্ছেন। পিয়র্সন সাহেব তাই বলতেন যে— আমি যা পেয়েছি তার জন্য বড়ো কৃতজ্ঞ হলুম।

আমরা আশ্রমবাসীরা যেন সেই বন্ধুকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারি। এখানকার ছাত্র অধ্যাপক যাঁরা তাঁর বন্ধুত্বের ও প্রেমের আস্বাদ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন যে কী পবিত্র দান তিনি চারি দিকে রেখে গেছেন। তিনি এখানকার সাঁওতালদের একমাত্র বন্ধু ছিলেন, নিজে তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের মধ্যে কাজ করেছেন। আজ সেই-সব সাঁওতালরাই জানে যে কী সম্পদ তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি এই সাঁওতালদের আর আশ্রমের শিশুদের সেবা করতে গিয়ে যে মহাসম্পদ লাভ করেছেন তা অতি মহামূল্য, তা সস্তায় পাওয়া নয়। তিনি সমস্ত দান করে তবেই সমস্ত গ্রহণ করতে পেরেছেন, জীবনের পাত্রকে পূর্ণ করে নিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর মহৎজীবনকে পরিপূর্ণ করে সেই দান গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবনের পাত্র তাতে ভরপুর হয়ে উপছে পড়েছে, তিনি তার আনন্দে অধীর হয়েছেন।

আজ আমাদের তাঁর জীবনের এই কথাই স্মরণ করতে হবে তিনি যেমন বড়ো দান রেখে যেতে পেরেছেন তেমনি বড়ো সম্পদ পেয়ে গেছেন। তাঁর জীবনের এই মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করতে পারলেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে। আশ্রমে যে সত্য কালে কালে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠেছে, পিয়র্সন সাহেব তাকে জীবনে স্বীকার করে নিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা
ফাল্গুন ১৩৩০

## মনোমোহন ঘোষ

আমি দুর্বলতা ও ক্লান্তিতে আক্রান্ত। একদিকে জরা ও অপরদিকে যৌবন-সুলভ কর্ম, এ দুইয়ে মিলে আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। এ সভার উদ্যোক্তারা যখন আমাকে সভাপতি করবার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আমি তাতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে আজ আমি এখানে এসেছি। প্রথমত, কবি মনোমোহন ঘোষের মাতামহকে আমি আমার পরম আত্মীয় বলে জানতুম। শৈশবকালে তাঁর কাছ থেকেই প্রথম আমি ইংরেজি সাহিত্যের ব্যাখ্যান শুনেছিলাম। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কে কোন্ শ্রেণীতে আসন পান, তাহা তিনিই আমাকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন। যদিও আমাদের বয়সের যথেষ্ট অনৈক্য ছিল তথাপি তার পর অনেকদিন পর্যন্ত দুজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ছিল। এক-এক সময়ে তাঁর আশ্চর্য যৌবনের তেজ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাঁদের মা যখন ইংলন্ডে পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশুবয়সেই তাঁদের আমি দেখেছি। ইংলন্ডে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বলাভ করেছেন। সে কথা আপনারা সবাই জানেন। মনোমোহন যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় পরিচয় হয়— সে পরিচয় আমার কাব্যসূত্রে। সেইদিন সেইক্ষণ আমার মনে পড়ে। জোড়াসাঁকোয় আমাদের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় 'সোনার তরী' পড়ছিলুম। মনোমোহন তখন সেই কাব্যের ছন্দ ও ভাব নিয়ে অতি সুন্দর

আলোচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও শুধু বোধশক্তি দ্বারা তিনি কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আজকে তাঁর স্মৃতিসভায় আমরা যারা সমবেত হয়েছি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর যথার্থ স্বরূপ যেখানে— তাঁর মধ্যে যা চিরকাল স্মরণযোগ্য— সে জায়গায় তাঁকে হয়তো দেখেন নি। এ সভায় তাঁর অনেক ছাত্র উপস্থিত আছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ঢাকা কলেজে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্র হিসাবে যে-কেহ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর মধ্যেই তিনি সাহিত্যের রস সঞ্চার করেছিলেন। অধ্যাপনাকে অনেকে শব্দতত্ত্বের আলোচনা বলে ভ্রম করেন— তাঁরা অধ্যাপনার প্রকৃত অধিকারী নন। মনোমোহন ঘোষ তাঁর অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে সাহিত্যের নিগূঢ় মর্ম ও রসের ভাণ্ডারে ছাত্রদের চিত্তকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। যে শিক্ষা এক চিত্ত হতে আর-এক চিত্তে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, ছাত্রদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এ ঢের বড়ো জিনিস। যে শক্তি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে শক্তি ছিল গান গা'বার জন্যে। অধ্যাপনার মধ্যে যে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে তাঁর গভীর ক্ষতি হয়েছিল। আমি যখন ঢাকায় কনফারেন্সে গিয়েছিলুম তখন তাঁর নিজের মুখে এ কথা শুনেছি। অধ্যাপনা যদি সত্য সত্যই এমন হত যে ছাত্রদের চিত্তের সঙ্গে অধ্যাপকের চিত্তের যথার্থ আনন্দ বিনিময় হতে পারে, তবে অধ্যাপনায় ক্লান্তিবোধ হত না। কিন্তু আমাদের দেশে যথার্থভাবে অধ্যাপনার সুযোগ কেউ পান না। যে অধ্যাপক সাহিত্যের যথার্থ মর্ম উদ্‌ঘাটন ও ছাত্রদের চিত্তবৃত্তির উদ্‌বোধন করতে চেষ্টা করেন, তেমন অধ্যাপক উৎসাহ পান না। ছাত্রেরাই তাঁর অধ্যাপনার প্রণালীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। তারা বলে, 'আমরা পাস করবার জন্যে এসেছি। নীল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে আমাদের এমনতর ধারা দেখিয়ে দিতে হবে যাতে আমরা পাস করবার গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারি।' এইজন্যই অধ্যাপনা করতে গিয়ে ভালো অধ্যাপকেরা ব্যথিত হন। ফলে নিষ্ঠুর শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের মন কলের মতো হয়ে যায়, তাদের রসও শুকিয়ে যায়। আমাদের দেশে পড়ানোটা বড়ো নীরস। এজন্য মনোমোহন বড়ো পীড়া অনুভব করতেন। এই অধ্যাপনার কাজে তাঁকে অত্যন্ত ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছিল।

অনেক স্থলে ত্যাগস্বীকারের একটা মহিমা আছে। বড়োর জন্য ছোটোকে ত্যাগ করা, ভাবের জন্য অর্থ ত্যাগ করা, ও আত্মার জন্য দেহকে ত্যাগ করার মধ্যে একটা গৌরব আছে। কিন্তু যেখানে যার জন্যে আমরা মূল্য দিই তার চেয়ে মূল্যটা অনেক বেশি, সেখানে ত্যাগ দুঃখময়। এই কবি— বিধাতা যাঁর হাতে বাঁশি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন— তিনি যখন অধ্যাপনার কাজে বদ্ধ হলেন তখন তা তাঁকে কোনো সাহায্য করে নি। আমি তাঁর সেই বেদনা অনুভব করেছি। আজকের দিনে তাঁর স্মৃতিসভায় আমি সেই বেদনার কথা নিয়ে এসেছি। যে পাখিকে বিধাতা বনে পাঠিয়েছিলেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁচায় বন্ধ করা হয়েছিল, বিধাতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে। আজ আমাদের সেই বেদনার অনুশোচনা করবার দিন। তাঁর কন্যা লতিকা যা বললেন সে কথা সত্য। তিনি নিভৃতে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, প্রকাশ করবার জন্যে কোনোদিন ব্যগ্রতা অনুভব করেন নি, নিজেকে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। একদিকে এটা খুব বড়ো কথা। এই যে নিজের ভিতরে নিজের সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকা, নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখা, সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ রাখা— এ খুবই বড়ো কথা। তিনি কর্মকাণ্ডের ভিতরে যোগ দেন নি। সংসারের রঙ্গভূমিতে তিনি দর্শক থাকবেন, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না এই ছিল তাঁর আদর্শ। কেননা, দূর থেকেই যথার্থ বিচার করা যায় ও ভালো করে বলা যায়। কর্মের জালে জড়িত হলে তাঁর যে কাজ— বিশ্বরঙ্গভূমির অভিনয় দেখে আনন্দের গান গেয়ে যাওয়া— তাতে ব্যাঘাত হত। যেমন কোনো পাখি নীড় ত্যাগ করে যত ঊর্ধ্বে উঠে ততই তার কণ্ঠ থেকে সুরের ধারা উৎসারিত হতে থাকে, তেমনি কবি সংসার থেকে যত ঊর্ধ্বে যান ততই বিশুদ্ধ রস ভোগ করতে পারেন ও কাব্যের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারেন। মনোমোহন ছিলেন সেই

শ্রেণীর কবি। তিনি কর্মজাল থেকে নিজেকে নির্মুক্ত রেখে আপনার অন্তরের আনন্দালোকে একলা গান করেছিলেন। কিন্তু এ কথা আমি বলব যে, যদিও সাধারণত সংসাররঙ্গভূমির সমস্ত কোলাহলে আবদ্ধ হওয়া কবির পক্ষে শ্রেয়ঃ নয়, তথাপি কাব্যের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন না হলে একটা অভাব থেকে যায়। যদিচ জনতার বাণী মহাকাল সব সময়ে সমর্থন করেন না, তা হলেও খ্যাতি-অখ্যাতির তরঙ্গদোলায় দোলায়মান জনসাধারণের চিত্তসমুদ্র যে কবির বিহারক্ষেত্র এ কথা অস্বীকার করা যায় না। একান্ত নিভৃত যে কাব্য তাতে একটা সঙ্গহীনতার বেদনা আছে। মনোমোহন যে তাঁর কাব্য প্রকাশ করতে ব্যগ্র হন নি তার কারণ এই যে, তিনি যে ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন, সেই ইংরেজি ভাষায় তাঁর এত সূক্ষ্ম অধিকার ছিল যে আমাদের দেশে আমরা, যারা ইংরেজি ঘনিষ্ঠভাবে জানি নে, ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, আমাদের পক্ষে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম উৎকর্ষ উপভোগ করা দুরূহ। তিনি জানতেন যে এ দেশে তাঁর সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে জুটতে পারে না। যে কোনো বিদেশী ভাষা খুব ভালো জানে না তার পক্ষে সেই ভাষার সাহিত্যের মধ্যে একটা অন্তরাল থেকে যায়। যেমন কঠিন জেনানা যাঁরা রক্ষা করেন তাঁদের পক্ষে অন্তঃপুরিকাদের নাড়ী দেখানো কঠিন হয়, পর্দার আড়াল থেকে একজন নাড়ী দেখে ডাক্তারকে বলে দিতে হয়, আমাদের পক্ষে ইংরেজি সাহিত্যও তাই। অন্তঃপুরবাসিনী সাহিত্যলক্ষ্মী আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দেখা দেন না, আমরা শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। মুখের ভঙ্গিমা— যাতে অর্থ সুস্পষ্ট বোঝা যায় সেগুলি আমরা দেখতে পাই না। আমি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাই নি তথাপি ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছি। আমি যখন শেলি ইত্যাদি পড়ি তখন কোনো কোনো জায়গায় রসটি ঠিক না বুঝলেও মনে করি মেনে নেওয়াই ভালো। এ ছাড়া গতি নেই, বিশেষত যখন তা না করলে পাস করা অসম্ভব। ইংরেজিতে মনোমোহন ঘোষের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি ইংলন্ডে মানুষ হয়েছিলেন ও অক্সফোর্ডের গুণীদের সংসর্গ লাভ করেছিলেন। কাজেই সে দেশের ভাষার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু যে ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন তার সম্পূর্ণ মিল এ দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব। এই বেদনা ছিল তাঁর জীবনে। তিনি কবি থেকে ইস্কুল মাস্টার হয়েছিলেন। আবার অসামান্য অধিকার নিয়ে যে ভাষায় তিনি তাঁর বাঁশি বাজিয়েছিলেন সে ভাষার দেশ এ দেশ নয়। তিনি বুঝেছিলেন কবির দিক থেকে তার ঠিক সঙ্গ আমাদের দেশে পাওয়া কঠিন। তিনি যদি চিরদিন ইংলন্ডে থাকতেন তবে যে-সব কবির সঙ্গ বাল্যে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে তিনি এত একলা হয়ে পড়তেন না। পরস্পরের সঙ্গে তাঁর রসবিনিময় হতে পারত। এই রসবিনিময়ের প্রয়োজন যে নাই, এ কথা কখনো স্বীকার করা যায় না। মানুষের সহিত মানুষের সঙ্গের ভিতর দিয়াই প্রাণশক্তির উদ্‌বোধন হয়। মানুষের চিত্ত অন্য চিত্তের অপেক্ষা রাখে। কেউ অহংকার করে বলতে পারেন না, আমি কবি হিসাবে অন্যের অপেক্ষা রাখি নে। কিন্তু এই সঙ্গ না পেয়েও মনোমোহন ঘোষ হাল ছাড়েন নি। আপনার ভিতরে সমাহিত হয়ে তিনি কাব্যের আরাধনা করে গেছেন। সে কাব্যের জয়জয়কার হউক। মানুষের সঙ্গে চিত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার মধ্যে একটা গৌরব আছে। বিশ্বজগতের মানুষের সঙ্গে, একটা সত্যকার যোগ হবে, আমাদের অন্তরের মধ্যে সে ইচ্ছা কি নেই? যখন সে সঙ্গ না পাই তখন অভিমানে বলি, কাউকে আমার চাই নে। মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপনের মানুষের সে স্বাভাবিক ইচ্ছা যখন ব্যর্থ হয় তখনই আমরা অভিমান করে বলি, আমি কারো সঙ্গ চাই নে।

কবি মনোমোহনের কাব্যের যখন প্রকাশ হবে তখন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের কাছে বাংলা দেশের আলোক কি উজ্জ্বল হবে না? তারা কি বলবে না, এদের সৃষ্টির আশ্চর্য শক্তি আছে? প্রকাশ মানেই হচ্ছে বিশ্বজগতের সর্বত্র প্রকাশ। যে জ্যোতিষ্কের আলো আছে, তার কেবল এপারে প্রকাশ, ওপারে নয়, এ তো হয় না। 'সাহিত্য' শব্দের ধাতুগত অর্থ আমি জানি নে। একবার আমি বলেছিলাম, 'সহিত' অর্থাৎ সকলের সঙ্গে যে সঙ্গলাভ। কালিদাস, বেদব্যাস

প্রভৃতি সকল মহাকবি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে ভারতের চিত্তজ্যোতিষ্ককে প্রকাশ করেছেন। সকলেই বলেছেন, এ কবি আমাদেরও কবি। যে-সমস্ত ঐশ্বর্য দ্বারা বিশ্ব ধনী হয়, সে সমস্ত ঐশ্বর্যদ্বারাই সমকক্ষতার যোগ স্থাপিত হয়। সাহিত্য মানে সমকক্ষতার যোগ। এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেতন থেকে যা বের করেছেন তা আজও ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলা দেশের একটি মহিমা সর্বত্র প্রকাশিত হবে। আমরা যদিও একটু বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর দোষ নেই। আর কবি তো কেবল ইংরেজও নয়, কেবল বাঙালিও নয়— কবি সকল দেশেরই কবি। এই কবির কাব্য প্রকাশ হলে পর সকলেই আনন্দের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করবে। আজ তাঁর স্মৃতিতে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল; তিনি প্রায়ই তাঁর কাব্য আমাকে শুনাতেন। আমি শুনে মুগ্ধ হতেম। তাঁর প্রত্যেক শব্দচয়নের মধ্যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য ছিল— আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাঁর কাব্যের রূপ দিয়েছিলেন। আমার আশা আছে এ-সকল কাব্য হতে সকল দেশের লোক আনন্দ পাবে— কেবল 'গৌড়জন' নহে— সমস্ত বিশ্বজন 'তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন
মার্চ ১৯২৪

## সরোজনলিনী দত্ত

অর্থভাণ্ডারে মূল্যবান সামগ্রী লইয়া মানুষ গর্ব করে। কিন্তু তাহার চেয়ে বড়ো কথা স্মৃতিভাণ্ডারের সম্পদ। সেই মানুষই একান্ত দরিদ্র যাহার স্মৃতিসঞ্চয়ের মধ্যে অক্ষয় গৌরবের ধন বেশি কিছু নাই।

তাই সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া বুঝিলাম জীবনীলেখক তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত যথার্থই ভাগ্যবান। কারণ এরূপ স্ত্রীকে মৃত্যুর মধ্যে হারাইয়াও হারানো সম্ভব নহে; শুভাদৃষ্টক্রমে যিনি তাঁহাকে নিকটে পাইয়াছেন তাঁহার জীবনের মধ্যেই তিনি চিরদিন জীবিত থাকিবেন। বইখানি পড়িয়া আমার মনে এই খেদ হইল যে, তাঁহার সঙ্গে একবার ক্ষণকালের জন্য আমার দেখা হইয়াছিল, তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটে নাই।

সাধারণত আমরা যখন খাঁটি বাঙালির মেয়ের আদর্শ খুঁজি তখন গৃহকোণচারিণীর 'পরেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। গৃহসীমানার মধ্যে আবদ্ধ যে সংকুচিত জীবন তাহারই সংকীর্ণ আদর্শের বহুবেষ্টনরক্ষিত উৎকর্ষ দুর্লভ পদার্থ নহে। তাহার উপাদান অথবা, তাহার ক্ষেত্র অপ্রশস্ত, তাহার পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অকঠোর।

সরোজনলিনী বাহির সংসারের ভিড়ের মধ্যেই অধিকাংশ জীবন কাটাইয়াছেন, অনেক সময় বিদেশী সমাজের অতিথি বন্ধুদের লইয়া তাঁহাকে সামাজিকতা করিতে হইয়াছে, তাঁহার কর্মজীবনের পরিধি আত্মীয়স্বজন বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল না; তাঁহার সংসার আত্মীয় অনাত্মীয়, স্বদেশী বিদেশী, পরিচিত অপরিচিত অনেক লোককে লইয়া। এই তাঁর বড়ো সংসারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধকে তিনি মাধুর্যের দ্বারা শোভন ও ত্যাগের দ্বারা কল্যাণময় করিয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রেই নারী জীবনের যথার্থ পরিচয় ও পরীক্ষা। তাঁহার কাছে বাহিরের দ্বারা ঘর ও ঘরের দ্বারা বাহির পরাহত হয় নাই। এই উভয়ের সুন্দর সমন্বয়েই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। আজকালকার দিনে নারী একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, ঘরে বাহিরে সর্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ, যাঁহার জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা তিনি আদর্শ নহেন কিন্তু যাঁহার মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধারা গভীর ও সুন্দরভাবে সংগতি লাভ করিতে বাধা না পায় তিনিই আদর্শ।

সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া আমরা এই আদর্শের পরিচয় পাইলাম।

২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

# জগদিন্দ্র-বিয়োগে

সংসারে পরিচয় হয় অনেকেরই সঙ্গে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই পরিচয়ের কোঠা পার হইয়া ভিতরের মহলে প্রবেশ করা ঘটিয়া উঠে না। সহজে আত্মীয়তা করিবার শক্তি দুর্লভ শক্তি, জগদিন্দ্রনাথের সেই শক্তি ছিল। শ্রদ্ধা অনেক লোককে করা যায়, অসামান্য গুণের জন্য অনেককে প্রশংসাও করিয়া থাকি কিন্তু তবু আপন বলিয়া মানিতে পারি না। মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতে যে বন্ধুকে আজ হারাইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটাই মনে সবচেয়ে বড়ো করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে যে, প্রথম পরিচয় হইতেই আত্মীয় হইয়া উঠিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই, এবং সম্পূর্ণই সে তাঁহার নিজগুণে।

তখন লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন রাজসাহির ম্যাজিস্ট্রেট, আমি তাঁহার অতিথি। তখন সাধনা পত্রিকার ঝুলি প্রতিমাসেই আমাকে নানাবিধ রচনা দিয়া ভরিয়া দিতে হইত। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্জন বাংলায় আমার সমস্ত দিন সেই কাজেই পূর্ণ ছিল। লোকেন কাছারি হইতে ফিরিলে পর সন্ধ্যার সময় বৈঠক বসিত। সেই বৈঠকে আভিজাত্যের লাবণ্যে উদ্ভাসিতমূর্তি যুবক জগদিন্দ্রনাথ প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে প্রধান যে বলিলাম সেটা নিজের প্রতি কপট বিনয় করিয়া নহে। নিকুঞ্জে বসন্ত উৎসবের যে আসর বসে, সে আসরের প্রধান নায়ক পুষ্পিত শাখা নহে, দক্ষিণ সমীরণ। জগদিন্দ্রনাথের চিত্তের মধ্যে চিরপ্রবাহিত যে দাক্ষিণ্য ছিল তাহারই স্পর্শে আমাদের মন ভরিয়া উঠিত। সে বৈঠকে আমরা দিতাম উপকরণ তিনি দিতেন নিজেকে। তিনিই সভা জমাইতেন। মনে পড়ে, কবিতা পড়িয়া, গান গাহিয়া, গল্প শুনাইয়া রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেছে। এই অক্লান্ত মজলিশের উৎসাহ তিনিই জোগাইয়াছেন। তাঁহার রসবোধের প্রচুর আনন্দই রসের ধারাকে আকর্ষণ করিয়া আনিত। আমি তখন যৌবনের সীমা পার হই নাই, রচনার ঔৎসুক্যে আমরা মন তখন পুলকিত, সেই সময়ে এই রসরাগরঞ্জিত যুবকের সহিত আমার প্রথম পরিচয়।

তার পর নাটোর হইতে যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসিলেন, তখন তাঁহারই অনুপ্রাণনায় কলিকাতায় আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে সপ্তাহে এক সান্ধ্য বৈঠক জমিয়া উঠিল, তাহার নাম ছিল "খাম খেয়ালি"। তখন আমি আপন খেয়ালমতো সুরে লয়ে গান রচিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের দেশে যাহাকে ক্লাসিকাল সংগীত বলা যাইতে পারে, সেই হিন্দুস্থানী সুরে তালে জগদিন্দ্রনাথ পারদর্শী ছিলেন। আমি ছিলাম স্বভাবতই বড়ো বেশি আধুনিক, বিদ্রোহী বলিলেই হয়। গানের নামে আমি রাগ-রাগিণী ও বাঁধা তালের ছাঁচে ঢালা নমুনা দেখাইবার দিকে মন দিই নাই— এমন অবস্থাতেও জগদিন্দ্রনাথ গান সম্বন্ধে আমাকে একঘরে করিলেন না। আমার গান তাঁহার শিক্ষা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ হয় নাই। তিনি অকৃত্রিম আনন্দের সহিত তাহার রস উপভোগ করিতেন। কি সাহিত্যে কি সংগীতে তাঁহার মনের মধ্যে ভারি একটি দরদ ছিল— বাঁধা দস্তুরের শিক্ষা কস্‌রতে তাহার কোনো অংশে একটুও কড়া পড়িয়া যায় নাই। তাই খাম-খেয়ালির আসরে তিনি আপন আসনটি এমন পূরাপূরি দখল করিতে পারিয়াছিলেন।

সে সময়ে আমার নিজের নির্জন আসন ছিল পদ্মাতীরে বালুতটে। সেখানেও কিছুদিন তাঁহাকে অতিথি পাইয়াছিলাম। যাহারা সভাচর জাতীয় সামাজিক, তাহাদের পক্ষে পদ্মাতীরের সঙ্গ-বিরলতা অত্যন্ত শূন্য ঠেকিবার কথা; কিন্তু জগদিন্দ্র সেখানকার নিভৃত প্রকৃতির আমন্ত্রণ হইতে বঞ্চিত হন নাই; সেখানকার জল স্থল আকাশের সুরের সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে সঙ্গৎ জমিয়াছিল, তাল কাটে নাই।

জগদিন্দ্রনাথ আমার এই নির্জন আতিথ্যের জবাব দিয়াছিলেন বিশাল জনসংঘের মধ্যে। যে বৎসর নাটোরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভা বসিল, সেবার তাঁহার আহ্বানে খামখেয়ালির প্রায় সকলেই তাঁহার ঘরে গিয়া জড়ো হইল। স্বভাবদোষে সেখানেও বিদ্রোহের হাওয়া তুলিয়াছিলাম, জগদিন্দ্র হইয়াছিলেন তাহার সহায়। তখন প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বক্তৃতাদি হইত

ইংরেজি ভাষায়— অনেকদিন হইতে আমার কাছে তাহা একই কালে হাস্যকর ও দুঃখকর ঠেকিত। এবার নিরন্তর উৎপাত করিয়া আমরা এই অদ্ভুত কদাচার ভাঙিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে প্রবীণ দেশহিতৈষীর দল আমার উপর বিষম বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই রুদ্রতায় যে কৌতুক ফেনিল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে জগদিন্দ্রনাথের হাস্য প্রচুর পরিমাণে ছিল।

সেবারে সব চেয়ে যাহা আমরা উপভোগ করিয়াছিলাম, সে তাঁহার আতিথ্যের আয়োজন নহে, আতিথ্যের রস। সেই বিরাট যজ্ঞে উপকরণের বাহুল্যই হইয়াছিল, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নহে। এত বৃহৎ জনতার মধ্যে তাঁহার সঙ্গ তাঁহার সৌজন্য যে কেমন করিয়া সর্বব্যাপী হইয়া বিরাজ করিত, তাহাই আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয়। আমাদের দেশে যজ্ঞকর্তার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা বাঙালি বরযাত্রীদের মেজাজ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। সময় অসময় সম্ভব অসম্ভবের বিচার নাই, সমস্ত ক্ষণ আবদার অভিযোগ অভিমানের তুফান তুলিবার চেষ্টা। সর্বজনীন কর্মানুষ্ঠানে সকল দলেরই যে সম্মিলিত দায়িত্ব সে কথা মনে থাকে না; নিমন্ত্রিতেরা যেন নিমন্ত্রণ কর্তার প্রতিপক্ষ, তাহাকে হয়রান করিয়া তুলিতে যেন বাহাদুরী আছে, লজ্জা মাত্র নাই। সেবারেও সেইরূপ বরযাত্র মেজাজের লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ দিনে রাতে অনুনয় বিনয়ে সেই-সকল উত্তেজিত অতিথি-অভ্যাগতের অহৈতুক প্রকোপ প্রশমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অযোগ্য ব্যক্তিদের কর্তৃক অন্যায় রূপে লাঞ্ছিত হইয়াও মুহূর্তকালের জন্য তাঁহার প্রসন্নতা দূর হয় নাই। সভাধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আর-এক অত্যাচারকারী অনাহূত অতিথির অকস্মাৎ আবির্ভাবে সকলের চমক লাগিল, সে আর কেহ নহে সেই বছরের ভূমিকম্প। সভা ভাঙিয়া গেল, পৃথিবীর শ্যামল গাত্রাবরণখানাকে কোন্ দৈত্যে নখ দিয়া ছিঁড়িতে লাগিল, দালান ফাটিল— চারি দিকেই বিভীষিকা। বিঘ্ন বিপদ যাহা ঘটিবার তাহা তো ঘটিল, তাহার চেয়েও প্রবলতর পীড়া বাধাইল অনিশ্চিতের আশঙ্কা। রেলপথ বন্ধ, তারে খবর চলে না, অতিথিগণ সকলেই ঘরের খবরের জন্য উদ্‌বিগ্ন। দুর্দৈবের বড়ো ধাক্কাটা যখন থামিয়াছে তখনো ক্ষণে ক্ষণে ধরণীর হৃৎকম্প থামে না। পাকা কোঠায় থাকিতে কাহারো সাহস হয় না, চালা ঘরে কোনো প্রকারে সকলের গোঁজামিলন। যিনি গৃহস্বামী এই দুর্বিপাকে নিঃসন্দেহই নিজের সংসারের জন্য তাঁহার উদ্‌বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু নিজের ক্ষতি ও বিপত্তির চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে যে আলোড়িত হইতেছিল বাহির হইতে তাহা কে বুঝিবে? বিধাতা তাঁহার আতিথেয়তার যে কী কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি, আর সেই পরীক্ষায় তিনি যে কিরূপ সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও আমাদের মনে পড়ে।

যে সৌজন্য, যে বৈদগ্ধ্য, যে আত্মমর্যাদাবোধ, যে সামাজিক আত্মোৎসর্গ আমাদের দেশের প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের উপযুক্ত, জগদিন্দ্রনাথের তাহা অজস্র ছিল, তাহার সঙ্গে ছিল আধুনিক যুগের শিক্ষা। জগদিন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশে দুইটি বিদ্যার ধারার সমান মিলন দেখিয়াছি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁহার যেমন অগভীর আনন্দ ছিল, ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁহার তেমনি ছিল অধিকার। এই অধিকার বাহিরের শিক্ষায় নহে অন্তরের ধারণাশক্তিতে। তাঁহার চিত্তরাজ্যে যাহা আমাদের মনকে সব চেয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা পাণ্ডিত্যের উপাদান নহে, তাহা সহজ সহৃদয়তায় প্রদীপ্ত রুচির আলোক।

সংসারে সাধারণ আদর্শমতো ভালো লোক অনেকে আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে পারি না। তাঁহারা যেন গুণের তালিকা মাত্র। যে অলক্ষ্য সূত্রে সেই গুণগুলিকে এক করিয়া মানুষের ব্যক্তিস্বরূপটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে, জগদিন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাই ছিল। এইজন্য যখন তিনি ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, বন্ধুদের স্মৃতিলোকে তাঁহার মূর্তি অম্লান ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিল।

মানসী ও মর্ম্মবাণী
মাঘ ১৩৩২

# লর্ড সিংহ

অন্তরের দিক থেকে সব মানুষকে দেখবার সুযোগ ঘটে ওঠে না। সে-অবস্থায় মানুষটি বড়ো কি ছোটো তার বিচার করি মতের মিলের মাপকাঠি দিয়ে। যার সঙ্গে আমাদের মতের অনৈক্য তার সম্বন্ধে আমাদের মন কৃপণ। দলের লোককে পুরস্কার দেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, কেননা সে পুরস্কারের অনেকখানি নিজের উপর এসে পৌঁছয়।

অন্তরের দিক থেকে সব মানুষকে যে আমরা দেখতে পাই নে তার প্রধান কারণ এ নয় যে, কাউকে কাছে থেকে দেখবার অবকাশ সাধারণত ঘটে না। অনেক ক্ষেত্রেই অন্তরের মানুষটি দেখবার মতো মানুষ নয়। দলের মধ্যে যে মানুষ কোনো প্রধান স্থান পেয়েছে সমস্ত দলের কাঁধের উপর চড়ে সে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্তরের মানুষ একা, যদি সে আপন মহিমাতেই দেখা দিল তবেই তাকে দেখা যায়। সেই পরিচয়ে কেবলমাত্র দলের লোকের চেয়েও তাকে অনেক বেশি সত্য বলে জানি, আত্মীয় বলে জানি।

লর্ড সিংহকে দৈবক্রমে কিছুদিন নিয়ত কাছে দেখতে পেয়েছি। গতবারে য়ুরোপ মহাদেশ ভ্রমণ করবার সময় তাঁর সঙ্গলাভ করবার সুযোগ ঘটেছিল। ইংলন্ড থেকে আমরা একত্র যাত্রা করেছি নরোয়েতে। তিন দিন লেগেছিল পাড়ি দিতে— এই তিন দিন ধরে উত্তর সমুদ্র ঝড়ে তোলপাড়। ছোটো জাহাজের ঝাঁকানি একেবারে অসহ্য, শোওয়া বসা দাঁড়ানো সমস্তই দুঃসাধ্য। ক্যাবিন থেকে এক মুহূর্ত বাইরে বেরোতে আমার সাহস হয় নি। সেই সময়ে প্রতিদিন প্রসন্নমুখে তিনি আমার খবর নিয়েছেন। কাজটা একটুমাত্র সহজ ছিল না— চলতে গিয়ে তিনি সিঁড়ির উপর আছাড় খেয়েছেন, তবু এই কঠিন দুর্যোগে বিশেষ কষ্ট করে তিনি যে দেখা দিয়ে যেতেন সে তাঁর অকৃত্রিম সহৃদয়তার গুণে। সকল অবস্তাতেই তাঁর মধ্যে যে সৌজন্য দেখেছি সে আচারগত নয়, সে হৃদয়গত। এই কারণে এই সৌজন্য তাঁর একটি শক্তির অঙ্গ ছিল। এই শক্তিতে তিনি সহজে সর্বত্র প্রবেশাধিকার পেতেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে পেলেম নরোয়েতে যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল সে পরিচয়ে অনায়াসে তিনি তাঁদের হৃদ্যতা লাভ করলেন— এই জিনিসটি সম্মানলাভের চেয়েও দুর্লভ। তিনি যে পদবী পেয়েছিলেন য়ুরোপীয় সমাজে সে পদবীর মূল্য যথেষ্ট বেশি। কিন্তু ওই পদবীর আড়ম্বর করতে তাঁকে একদিনও দেখি নি। আমরা একত্রে সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এই পদবী-গৌরবের লেশমাত্র চাঞ্চল্য, এই পদবীটাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে সকলের অগ্রসর হয়ে চলবার চেষ্টা আমি কোথাও তাঁর মধ্যে একদিনের জন্যও অনুভব করি নি। যে আভিজাত্যের অভাবনীয় অধিকার তিনি পেয়েছিলেন সেই অধিকার যেন তাঁর নূতন পাওয়া সামগ্রী নয়, সে যেন তাঁর সহজাত। তাতে করে তাঁর স্বাভাবিক নম্রতাকে একটুমাত্র আবৃত করে নি। এর থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, লর্ড সিংহ আপন স্বভাবে অত্যন্ত সত্য ছিলেন। বাইরের কিছুতেই এর থেকে তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। দশের অনুবৃত্তি করা, ভিড়ের ঠেলায় চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই কারণেই তাঁর মধ্যে সম্মানের চাঞ্চল্য দেখি নি, এই কারণেই লোকমুখের বাহবাতেও তিনি অলুব্ধ ছিলেন।

স্বভাবে তাঁর এই যে প্রতিষ্ঠা এর মধ্যে অন্ধ জেদের রূপ ছিল না, তার কারণ তাঁর বুদ্ধির অসামান্য স্বচ্ছতা। বরাবর নিজের পথ তিনি বিচার করেই স্থির করেছিলেন, ঝোঁকের মাথায় করেন নি। যে কয়দিন একত্রে ছিলাম, তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করবার অবকাশ ঘটেছিল। এইসব আলোচনায় যেটা আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি সে হচ্ছে তাঁর চিত্তের শান্ত ভাব। তিনি যা বুঝতেন বুদ্ধির আলোকে সে তিনি স্পষ্ট করে বুঝতেন, এইজন্যে তার মধ্যে তাঁর এমন শান্তি ছিল। গোঁড়ামির মধ্যে এ শান্তি থাকে না। তাঁর চিন্তার মধ্যে এই অনুদ্ধত শান্তি থাকাতেই আলোচনাকালে তাঁর মতকে স্বীকার করে নেওয়া সহজ ছিল। জেদ ও গোঁড়ামির বন্ধুরতা যেখানে নেই, সেখানে এক মনের সঙ্গে আর-এক মনের চিন্তা চলাচলের পথ সুগম হয়

মতের অমিল থাকলেও।

তাঁর সঙ্গে ভ্রমণকালে বার বার আমার এই কথাটি মনে হয়েছে, যে, তিনি তাঁর নাম সার্থক করেছেন, সত্য এবং প্রসন্নতা এই দুইই তাঁর ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর বুদ্ধির 'পরে, তাঁর সত্যের 'পরে এবং তাঁর সৌহার্দ্যের 'পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেত; এই গুণেই সংসারে তিনি বড়ো হতে পেরেছেন, বড়ো হবার জন্যে তাঁকে কোনো কৌশল করতে হয় নি।

লর্ড সিংহের মৃত্যুতে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যে বেদনা লেগেছে তার একটা কারণ এই যে, কিছুদিনের নিয়ত সঙ্গলাভের মধ্য দিয়ে আমি তাঁর আত্মীয়তা পেয়েছি। আরো একটি কারণ আছে।

আমাদের গ্রামগুলির জীর্ণতা সংস্কার করে তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারলে তবে আমাদের দেশকে বাঁচাতে পারা যাবে, এই কথাটি মনে রেখে দীর্ঘকাল থেকে আমার সাধ্যানুসারে কিছু কিছু কাজ করবার চেষ্টা করেছি। এই কাজে আমার স্বদেশের লোকের মধ্যে যে দুই-এক জনের সহায়তা পেয়েছি তার মধ্যে লর্ড সিংহ ছিলেন সর্বপ্রধান। তাঁর এই সহায়তা ছিল অপ্রগল্‌ভ, কিন্তু সকল প্রকারেই খুব খাঁটি। এই কাজ সম্বন্ধে যথার্থ তাঁর আস্থা ছিল— সে কেবল দেশের প্রতি তাঁর প্রেমবশত, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই সূত্র অকস্মাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। ভাগ্যের কার্পণ্যফলে দৈবাৎ আমরা অতি অল্পই পেয়ে থাকি; এইজন্যে যে বন্ধুকে হারাই তাঁর ক্ষতিপূরণের ভরসা মনে থাকে না। সেই দুঃখের মধ্যে আজ কেবল তাঁর সঙ্গে আমার সৌহৃদ্যের সম্বন্ধ ও আমার সংকল্পে তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার গৌরব স্বীকার করে এই কয়েকটি ছত্র তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলাম। ৭ই চৈত্র, ১৩৩৪

প্রবাসী
বৈশাখ ১৩৩৫

## উমা দেবী

বীণার তার হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে গান যদি অকালে স্তব্ধ হয়ে যায় তবে তার অন্তঃপ্রবাহ শ্রোতার মনে নীরবে সমাপ্তির মুখে চলতে থাকে; উমার অসম্পূর্ণ জীবন তেমনি করে অকালমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার প্রিয়জনদের মনের মধ্যে একটি অন্তরতর গতি লাভ করেছে। সংসারে স্নেহ দেবার এবং স্নেহ পাবার ইচ্ছা তার জীবনে সব চেয়ে একান্ত ছিল। ফুল যেমন আলো চায় এবং গন্ধ দেয়, সে তার অল্পায়ু জীবলীলায় তেম্‌নি করেই প্রীতি দিয়েছে এবং নিয়েছে। সেই দেওয়া নেওয়ার অবসান হল এমন কথা মনে করে যেন বিলাপ না করি। জীবিতকালেই সে অনুভব করেছিল যে, তার স্পর্শশক্তি মৃত্যুর অন্তরাল অতিক্রম করেছে; আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন মনে করি যে তার আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা করে আছে এবং আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শোকস্মৃতির অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে এই মুহূর্তেই তার হৃদয় স্নিগ্ধ হল। তার আত্মা শান্তিলাভ করুক, তৃপ্তিলাভ করুক, মর্ত্য জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করুক, এই কামনা করি। [২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১]

## অরবিন্দ ঘোষ

অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁকে দেখে যা আমার মনে জেগেছে সেই কথা লিখতে ইচ্ছা করি।

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে বাণীই আদ্যা শক্তি। সেই শক্তিই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। নব যুগ নব সৃষ্টি,

সে কখনো পঞ্জিকার তারিখের ফর্দ থেকে নেমে আসে না। যে-যুগের বাণী চিন্তায় কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নব যুগ।

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ওঁ, অন্তেও ওঁ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো— কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিশ্বাস।

ফরাসি রাষ্ট্র-বিপ্লবের বান ডেকে যে-যুগ অতল ভাবসমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এল তাকে বলি য়ুরোপের এক নব যুগ। তার কারণ এ নয়, সে দিন ফ্রান্সে যারা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে তার কারণ সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। সে-বাণী কেবলমাত্র ফ্রান্সের আশু রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের খাঁচায় বাঁধা খবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা ইস্কুল-বইয়ের বুলি আওড়ানো টিয়ে পাখি নয়। সে ছিল মুক্তপক্ষ আকাশবিহারী বাণী; সকল মানুষকেই পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে সে পথ নির্দেশ করে দিয়েছিল।

একদা ইটালির উদ্‌বোধনের দূত ছিলেন মাটসিনি, গারিবাল্‌ডি। তাঁরা যে-মন্ত্রে ইটালিকে উদ্ধার করলেন সে ইটালির তৎকালীন শত্রু বিনাশের দ্রুত ফলদায়ক মারণ উচাটন পিশাচ মন্ত্র নয়, সমস্ত মানুষের নাগপাশ মোচনের সে গরুড় মন্ত্র, নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে মর্ত্যে অবতীর্ণ। এইজন্যে তাকেই বলি বাণী। আঙুলের আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা অন্ধকারে মানুষ ঘরের প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারে। সেই স্পর্শবোধ তারই নিজের। কিন্তু সূর্যের আলোতে নিখিলের যে স্পর্শবোধ আকাশে আকাশে বিস্তৃত, তা প্রত্যেক প্রয়োজনের উপযোগী অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনের অতীত। সেই আলোককেই বলি বাণীর রূপক।

সায়াল্স এক দিন য়ুরোপে যুগান্তর এনেছিল। কেন? বস্তুজগতে শক্তির সন্ধান জানিয়েছিল বলে না। জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্ধতা ঘুচিয়েছিল বলে। বস্তুসত্যের বিশ্বরূপ স্বীকার করতে সেদিন মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আজ সায়াল্স সেই যুগ পার করে দিয়ে আর-এক নবতর যুগের সম্মুখে মানুষকে দাঁড় করালে। বস্তুরাজ্যের চরম সীমানায় মূল তত্ত্বের দ্বারে তার রথ এল। সেখানে সৃষ্টির আদি বাণী। প্রাচীন ভারতে মানুষের মন কর্মকাণ্ড থেকে যেই এল জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এল সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন করে আত্মাকে ডাক পড়ল। সেই আত্মা যন্ত্রচালিত কর্মের বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে মানুষের জাগ্রত চিত্ত বলে উঠেছিল, চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে যাওয়া; তার উলটাই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিল, "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

আর-এক দিন ভারতে উদ্‌বোধনের বাণী এল। সমস্ত মানুষকে ডাক পড়ল— বিশেষ সংকীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারই বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার সমগ্র উদ্‌বোধিত শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করলে।

বাণী তাকেই বলি যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান করে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য বলে সপ্রমাণ করে। প্রকৃতি পশুকে নিছক দিনমজুরি করতেই প্রত্যহ নিযুক্ত করে রেখেছে। সৃষ্টির বাণী সেই সংকীর্ণ জীবিকার জগৎ থেকে মানুষকে এমন জীবনযাত্রায় উদ্ধার করে দিলে যার লক্ষ্য উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের কানে এল— টিকে থাকতে হবে, এ কথা তোমার নয়; তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, সেজন্যে মরতে যদি হয় সেও ভালো। প্রাণ যাপনের বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে যে-আলো জ্বলে সে রাত্রির আলো, পশুদের তাতে কাজ চলে। কিন্তু মানুষ নিশাচর জীব নয়।

সমুদ্রমন্থনের দুঃসাধ্য কাজে বাণী মানুষকে ডাক দেয় তলার রত্নকে তীরে আনার কাজে। এতে করে বাইরে সে যে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি তার অন্তরে। এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা। এতেই আপন প্রচ্ছন্ন দৈব শক্তির 'পরে মানুষের শ্রদ্ধা ঘটে। এই শ্রদ্ধাই নূতন যুগকে মর্ত্য সীমা থেকে অমর্ত্যের দিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই শ্রদ্ধাকে নিঃসংশয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাঁর মধ্যে, যাঁর আত্মা স্বচ্ছ জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমায় প্রকাশিত।

কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি নয়, উদ্যম নয়, যাঁকে দেখলে বোঝা যায় বাণী তাঁর মধ্যে মূর্তিমতী।

আজ এইরূপ মানুষকে যে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চার দিকেই আজ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মঘাত। তাই রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধিই আজ আর সকল সাধনাকেই পিছনে ঠেলে ফেলেছে। মানুষ বস্তুর মূল্যে সত্যকে বিচার করছে। এমনি করে সত্য যখন হয় উপলক্ষ, লক্ষ্য হয় আর কিছু, তখন বিষয়ের লোভ উগ্র হয়ে ওঠে, সে লোভের আর তর সয় না। বিষয়সিদ্ধির অধ্যবসায়ে বিষয়বুদ্ধি আপন সাধনার পথকে যতই সংক্ষিপ্ত করতে পারে ততই তার জিৎ। কারণ, তার পাওয়াটা হল সাধনাপথের শেষ প্রান্তে। সত্যের সাধনায় সর্বক্ষণেই পাওয়া। সে যেন গানের মতো, গাওয়ার অন্তে সে গান নয়, গাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই। সে যেন ফলের সৌন্দর্য, গোড়া থেকেই ফুলের সৌন্দর্যে যার ভূমিকা। কিন্তু লোভের প্রবলতায় সত্য যখন বিষয়ের বাহন হয়ে উঠল, মহেন্দ্রকে তখন উচ্চৈঃশ্রবার সহিসগিরিতে ভর্তি করা হল, তখন সাধনাটাকে ফাঁকি দিয়ে, সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাতে সত্য বিমুখ হয়, সিদ্ধি হয় বিকৃত।

সুদীর্ঘ নির্বাসন ব্যাপ্ত করে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঢ়তর করে উপলব্ধি করেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলেন।

কিন্তু রাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতির আশু প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলেন— তাঁকে বললেন, সর্বজন-সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় অনতিকালেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু এক মুহূর্তে জাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। দশজন সত্যকে যদি না স্বীকার করে, তবে সেটা দশজনেরই দুর্ভাগ্য, সত্যকে যে সেই দশজনের ক্ষুদ্র মনের বিকৃতি অনুসারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বললেন, আমি মুহূর্তকালের দাবি মেটাবার অসম্মান মানব না, চিরকালের মতো বিদায় নেব। রামচন্দ্র এক নিমিষে সিদ্ধি চেয়েছেন, একমুহূর্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের মন-ভোলানো সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ করেছি।

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ বাক্যরত্নের ঝুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। তার প্রথম পদটি মনে পড়ে :

'নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে?'

যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনাসাপেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সত্যকে আশুকালের গরজে সপ্রমাণ করতে চাইলে আয়োজনের ধুমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্ধান করে।

এই লোভের চাঞ্চল্যে সর্বত্রই যখন সত্যের পীড়ন চলেছে তখন এর বিরুদ্ধে তর্ক-যুক্তিকে খাড়া করে ফল নেই; মানুষকে চাই; যে-মানুষ বাণীর দূত, সত্য সাধনায় সুদীর্ঘ কালেও যাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় যাঁকে আনন্দিত রাখে। আমরা এমন মানুষকে চাই যিনি সর্বাঙ্গীণ মানুষের সমগ্রতাকে শ্রদ্ধা করেন। এ কথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে, যে, বিধাতার কৃপাবশতই সর্বাঙ্গীণ মানুষটি সহজ নয়, মানুষ জটিল। তার ব্যক্তিরূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহু বিচিত্র। কোনো বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একঝোঁকা ভাবে তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তোলা চলে। মানুষের মনটাকে যদি চাপা দিই তবে চোখ বুজে গুরুবাক্য মেনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হতে পারে। বুঝিয়ে বলার পরিশ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো করে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোঝা বাড়ানো, বিদ্যালাভের পরিবর্তে ডিগ্রিলাভ সহজ হয়। জীবনযাত্রাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার বহনভার কমে আসে।

তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেয়ে বড়ো কথাটা ভুললে চলবে না যে আমরা মানুষ, আমরা সহজ নই।

তিব্বতে মন্ত্রজপের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বলেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সত্যকার মন্ত্রজপ একটুও সহজ নয়। সেটা শুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা। হিতৈষী এসে বললেন, সাধারণ মানুষের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, অতএব মন্ত্রজপকে সহজ করবার খাতিরে ওই শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক— কিছু না ভেবে না বুঝে শব্দ আওড়ে গেলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট। সজীব ছাপাখানার মতো প্রত্যহ কাগজে হাজারবার নাম লিখলেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ করবার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরো সহজইবা না করব কেন? চিত্তের চেয়ে মুখ চলে বেগে, মুখের চেয়ে চাকা, অতএব চলুক চাকা, মরুক চিত্ত।

কিন্তু মানুষের পন্থা সম্বন্ধে যে-গুরু বলেন, 'দুর্গং-পথস্তৎ,' তাঁকে নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা দাবি করব। বহুলতা পদার্থটিই মন্দ, এই মতের খাতিরে বলা চলে যে, ভেলা জিনিসটাই ভালো, নৌকাটা বর্জনীয়। এক সময়ে অত্যন্ত সাদাসিধে ভেলায় অত্যন্ত সাদাসিধে কাজ চলত। কিন্তু মানুষ পারলে না থাকতে, কেননা সে সাদাসিধে নয়। কোনোমতে স্রোতের উপর বরাত দিয়ে নিজের কাজ সংক্ষেপ করতে তার লজ্জা। বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে উঠল, নৌকোয় হাল লাগালো, দাঁড় বানালে, পাল দিলে তুলে, বাঁশের লগি আনলে বেছে, গুণ টানবার উপায় করলে, নৌকোর উপর তার কর্তৃত্ব নানাগুণে নানাদিকে বেড়ে গেল, নৌকোর কাজও পূর্বের চেয়ে হল অনেক বেশি ও অনেক বিচিত্র। অর্থাৎ মানুষের তৈরি নৌকো মানব-প্রকৃতির জটিলতার পরিচয়ে কেবলই এগিয়ে চলল। আজ যদি বলি নৌকো ফেলে দিয়ে ভেলায় ফিরে গেলে অনেক দায় বাঁচে, তবে তার উত্তরে বলতে হবে মনুষ্যত্বের দায় মানুষকে বহন করাই চাই। মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে— মানুষ কোথাও থামতে পাবে না। মানুষের পক্ষে 'নাল্পেসুখমস্তি'। অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার। কলকারখানার যুগে ব্যাবসা থেকে সৌন্দর্যবোধকে বাদ দিয়ে জিনিসটাকে সেই পরিমাণে সহজ করেছে, তাতেই মুনফার বুভুক্ষা কুশ্রীতায় দানবীয় হয়ে উঠল। এদিকে মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল ঘানি ঢেঁকি থেকে বিজ্ঞানকে চেঁচে মুছে ফেলায় ওগুলো সহজ হয়েছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত জীবিকা অপটুতায় স্থাবর হয়ে রইল, বাড়েও না এগিয়ে চলেও না, নড়বড় করতে করতে কোনো মতে টিঁকে থাকে। তার পরে মার খেয়ে মরে শক্ত হাতের থেকে। প্রকৃতি পশুকেই সহজ করেছে, তারই জন্য স্বল্পতা: মানুষকে করেছে জটিল, তার জন্যে পূর্ণতা। সাঁতারকে সহজ করতে হয় বিচিত্র হাত-পা-নাড়ার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে; হাঁটুজলে কাদা আঁকড়ে অল্প পরিমাণে হাত-পা ছুঁড়ে নয়। ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরব বোধকে জাগ্রত ক'রে।

এই সমস্ত কথা ভাবছি এমন সময় আমাদের ফরাসি জাহাজ এল পণ্ডিচেরী বন্দরে। ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নামতে হল— তা হোক, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম— ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণা-শক্তি পুঞ্জিত। কোনো খরদস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্য যুগের খৃস্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের

এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম— আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্‌বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়— আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

শান্তিলি জাহাজ
২৯ মে ১৯২৮

প্রবাসী
শ্রাবণ ১৩৩৫

# শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
## সংবর্ধনা উপলক্ষে

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা সভায় বাংলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে সে কথা স্মরণ করাবার নানা উপলক্ষ সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না এও তারই মধ্যে একটা। বস্তুত আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ— এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বাংলা সাহিত্যের উদয়শিখরে আপন প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করবেন। ইতি ২৯ ভাদ্র ১৩৩৫

কল্লোল
আশ্বিন ১৩৩৫

# শরৎচন্দ্র

নর্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হল। সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণের যোগে তার পরীক্ষাও দিয়েছি। পাস করে থাকব কিন্তু পারিতোষিক পাই নি। যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা সওদাগরি আপিস পার হয়ে আজ পেনসন ভোগ করছেন।

এমন সময় বঙ্গদর্শন বাহির হল। তাতে নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল— তখনকার মননশীল পাঠকেরা আশা করি তার মর্যাদা বুঝেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এখনকার চেয়ে তখন যে বেশি ছিল তা নয়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, তখনকার পাঠকেরা এখনকার মতো এত বেশি প্রশ্রয় পান নি। মাসিক পত্রিকা, বলতে গেলে, ওই একখানিই ছিল। কাজেই সাধারণ পাঠকের মুখরোচক সামগ্রীর বরাদ্দ অপরিমিত ছিল না। তাই পড়বার মনটা অতিমাত্র বিলাসী হয়ে যায় নি। সামনে পাত সাজিয়ে যা-কিছু দেওয়া যেত তার কিছুই প্রায় ফেলা যেত না। পাঠকদের

আপন ফরমাসের জোর তখন ছিল না বললেই হয়।

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতাবশতই এটা বেশি বলা হল। বঙ্গদর্শনের প্রাঙ্গণে পাঠকেরা যে এই বেশি ভিড় করে এল, তার প্রধান কারণ, ওর ভাষাতে তাদের ডাক দিয়েছিল। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব ওই পত্রিকায়। এর পূর্বে বাঙালির আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নি। অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে দেখলে তখন সাহিত্য ছিল ভাসুরের বৈঠক, ভাদ্রবৌ ঘোমটা টেনে তাকে দূরে বাঁচিয়ে চলত, তার জায়গা ছিল অন্দর মহলে। বাংলা দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা যেমন ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কি থেকে অল্পে অল্পে বেরিয়ে আসছে ভাষার স্বাধীনতাও তেমনি। বঙ্গদর্শনে সব-প্রথম ঘেরাটোপ তোলা হয়েছিল। তখনকার সাহিত্যিক স্মার্ত পণ্ডিতেরা সেই দুঃসাহসকে গঞ্জনা দিয়ে তাকে গুরুচণ্ডালি ব'লে জাতে ঠেলবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু পাল্কির দরজার ফাঁক দিয়ে সেই যে বাংলা ভাষার সহাস্য মুখ প্রথম একটুখানি দেখা গেল, তাতে ধিক্কার যতই উঠুক এক মুহূর্তেই বাঙালি পাঠকের মন ভুলেছিল। তার পর থেকে দরজা ফাঁক হয়েই চলেছে।

প্রবন্ধের কথা থাক্। বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন, দূরদিগন্তের নীলিমায় অরণ্য-পর্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দেয় এও তেমনি। সেই দৃশ্যছবির প্রধান গুণ হচ্ছে তার রেখার সুষমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তার সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা। দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনীতে সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রঙিন কুহেলিকায় রচিত হয় তবুও তার রস আছে।

কিন্তু নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি আর সূর্যাস্তকালের রঙিন মেঘের ছবি এক দামের জিনিস নয়। সৌন্দর্যলোক থেকে এদের কাউকেই বর্জন করা চলে না, তবু বলতে হবে ওই জনপদের চেহারায় আমাদের তৃপ্তির পূর্ণতা বেশি। উপন্যাসে কাহিনী ও কথা উভয়ের সামঞ্জস্য থাকলে ভালো— নাও যদি থাকে তবে বস্তুপদার্থটার অভাব ঘটলে দুধ খেতে গিয়ে শুধু ফেনাটাই মুখে ঠেকে, তার উচ্ছ্বাসটা চোখে দেখতে মানায়, কিন্তু সেটা ভোগে লাগে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায় নি— তাদের সাজসজ্জা আছে, কিন্তু পরিচয়পত্র নেই। তারা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেছে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা, তারা বর্তমানের সামগ্রী নয়, তারা যে-অতীতে বিরাজ করে, সে-অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল-জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েষা জগৎসিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রভৃতিরা যা-খুশি তাই করতে পারে কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চলতে হয় যে, পাঠকদের মনোরঞ্জনে ত্রুটি না ঘটে।

আরব্য উপন্যাসও কাহিনী, কিন্তু সে হল বিশুদ্ধ কাহিনী। সম্ভবপরতার জবাবদিহি তার একেবারেই নেই। জাদুকর গোড়া থেকে স্পষ্ট করেই বলেছে, এ আমার অসম্ভবের ইন্দ্রজাল, সত্য মিথ্যা যাচাই করার দায় সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের খুশি করব— যেখানে সবই ঘটতে পারে সেখানে এমন কিছু ঘটাব, যাতে তোমরা শাহারজাদীকে বলবে, থেমো না, রাত্রের পর রাত্রি যাবে কেটে। কিন্তু যে-সব কাহিনীর কথা পূর্বে বলেছি সেগুলি দো-আঁস্‌লা, তারা খুশি করতে চায়, সেইসঙ্গে খানিকটা বিশ্বাস করাতেও চায়। বিশ্বাস করতে পারলে মন যে নির্ভর পায় তার একটি গভীর আরাম আছে। কিন্তু যে-গল্পগুলি বিশুদ্ধ কাহিনী নয় কাহিনীপ্রায়, তাদের মধ্যে মনটা ডুব-জলে সঞ্চরণ করে, তলায় কোথাও মাটি আছে কি নেই সে কথাটা স্পষ্ট হয় না, ধরে নিই যে মাটি আছে বৈকি।

বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দা উঠে গেল— ক্লাসিকাল অস্পষ্টতা বা রোম্যান্টিক অস্পষ্টতা অর্থাৎ ধ্রুপদী বা খেয়ালি দূরত্ব, সীতার বনবাসের ছাঁদ বা রাজপুতকাহিনীর ছাঁদ। মনে পড়ে আমার অল্প বয়সের কথা। তখন চোখে কম দেখতুম অথচ জানতুম না যে কম দেখি। ওই কম দেখাটাকেই স্বাভাবিক বলে জানতুম, কোনো নালিশ ছিল না। এমন সময় হঠাৎ চশমা পরে জগৎটা যখন স্পষ্টতর হল তখন ভারি আনন্দ পেলুম। বিজয়বসন্তেও একদিন বাঙালি পাঠক সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জানত না গল্পে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তার পরে দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল, এটা তার কাছে অভূতপূর্ব দান। কিন্তু তখনো ঠিক চশমাটি সে পায় নি, তবু দুঃখ ছিল না, কেননা, জানত না যে সে পায় নি। এমন সময়েই বিষবৃক্ষ দেখা দিল। কৃষ্ণকান্তের উইল সেই জাতেরই, সে যেন আরো স্পষ্ট।

তার পরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্যে নয়, উপদেশ দেবার জন্যে। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরবগর্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার করে বসল।

আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যরসের আদর সে নয়, দেশাভিমানের। এক-এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধর্মসাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে থাকে সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে। শুঁটকি মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয় তা হলে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। ওই জিনিসটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক সমস্যা এবং চল্‌তি সেন্টিমেন্ট, সাহিত্যের পক্ষে কচুরিপানার মতোই, তাদের জন্যে আবাদের প্রয়োজন হয় না, রসের স্রোতকে আপন জোরেই আচ্ছন্ন করে দেয়।

আধুনিক য়ুরোপে এই দশা ঘটেছে— সেখানে আর্থিক সমস্যা, স্ত্রী-পুরুষের সমস্যা, বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব-সমস্যায় সমাজে একটা বিপর্যয় কাণ্ড চলছে। লোকের মন তাতে এত বেশি প্রবলভাবে ব্যাপৃত যে, সাহিত্যে তাদের অনধিকারপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা দায়, নভেলগুলি গল্পের মালমসলামাখা প্রবন্ধ হয়ে উঠল। এতে করে সাহিত্যে যে স্তূপাকার আবর্জনা জমে উঠেছে সেটা আজকের পাঠকদের উপলব্ধিতে পৌঁচচ্ছে না, কেননা, আজ সাহিত্যের বাহিরের মাল নিয়ে তাদের মন ষোলো-আনা ভর্তি হয়ে রয়েছে। আর-এক যুগে এই-সব আবর্জনা বিদায় করবার জন্যে গাড়িতে যমের বাহন মহিষ অনেকগুলো জুৎতে হবে।

আমার বক্তব্য এই যে আর্টিস্টের, সাহিত্যিকের প্রধান কাজ হচ্ছে দেখানো, বিশ্বরসের পরিচয়ে আবরণ যত কিছু আছে তাকে অপসারণ করা। রসের জগৎকে স্পষ্ট করে মানুষের কাছে এনে দেওয়া, মানুষের একান্ত আপন করে তোলা। সীতার বনবাস ইস্কুলে পড়েছিলেম। সেটা ইস্কুলের সামগ্রী। বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম ঘরে, সেটা ঘরেরই জিনিস। সাহিত্যটা ইস্কুলের নয়— ওটা ঘরের। বিশ্বে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যেই সাহিত্য।

বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলের পর অনেক দিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প-সাহিত্যে আর-একটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ আরো একটা পর্দা উঠল। সেদিন যেমন ভিড় করে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণকর্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় করে জুগিয়েছেন সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্বের চেয়ে পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, স্পষ্ট করে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালি সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হল। তাদের আনাগোনাও চলছে। একদিন তারা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা

ভুলবে না। যদি ভোলে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। তাও যদি হয় তাতে দুঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে সেই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতাটা উপরি-পাওনা মাত্র; না জুটলেও নালিশ না করাই ভালো। নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ সব শেষে যাঁর পালা তিনি যদি-বা দলিলগুলোকে রক্ষা করেন স্বত্বাধিকারীকে পার ক'রে দেন বৈতরণীর ওপারে।

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৮

প্রবাসী
আশ্বিন ১৩৩৮

# শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## সংবর্ধনা উপলক্ষে পত্র : ৩

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র

তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণসভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম। তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দাম কেটে নেয় আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসেব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ ভরাপেট দিয়ে নয় আনন্দিত রসনা দিয়ে, নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সুখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে; তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশি, এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা, যে, পাঠকদের চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে জানান্ না দিলে পুরোনো ফোটোগ্রাফের মতো জানার রেখা হল্‌দে হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায় নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল তার পরে তেল ফুরিয়েছে অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। কেননা আলো জ্বলাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝ বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তিস্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেইসঙ্গে হেমন্তের আমনধানের পরেও আগাম দাবি রাখে। খুশি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফস্‌লা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে— তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব

তার প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ-মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীতপন্থার ভক্ত। রামের ভয়ংকর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানাতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারই আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয় কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন— তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়— চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

২৫ আশ্বিন ১৩৪৩

আনন্দবাজার পত্রিকা,
২৭ আশ্বিন ১৩৪৩
অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, 'বিচিত্রা'

# মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

পরলোকগত উদারচরিত্র মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে নি। লোকহিতকর ব্যাপারে তাঁর অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্যের সংবাদ সকলেই জানে, আমিও জানি। প্রত্যক্ষভাবে আমি তার একটি পরিচয়ও পেয়েছি। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন দীর্ঘকাল একান্ত অধ্যবসায়ে বাংলা অভিধান সংকলনে প্রবৃত্ত। এই কার্যে যাতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে যথোচিত সময় দিতে পারেন সেই উদ্দেশে মহারাজ তাঁকে বহু বৎসর যাবৎ মাসিক অর্থসাহায্য করে এসেছেন। এই কার্যের মূল্য তিনি বুঝেছিলেন এবং এর মূল্য দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন। সেই প্রসাদ অজস্র বিতরণ করবার দুর্লভ শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর সেই ভোগাসক্তিবিমুখ ভগবৎপরায়ণ নিরভিমান মহদাশয়তা বাঙালির গৌরবের কারণ রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

উপাসনা
অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

# হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

## ১

বালককালে আমার সাহস যে কত ছিল তার দুটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মানিকতলায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘরে আমার যাওয়া-আসা ছিল, আর তার চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ করেছি পটলডাঙায় বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে যখন-তখন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে।

একটা কথা মনে রাখা চাই তখন যাঁরা নামজাদা ছিলেন তাঁদের কাজের জায়গা বা আরামের ঘর এখনকার মতো সকলের পক্ষেই এত সুগম ছিল না। তখন সাহিত্যে যাঁদের প্রভাব ছিল বেশি তাঁদের সংখ্যা ছিল কম, তাঁদের আমরা সমীহ ক'রে চলতুম। তখনকার গণ্য লোকেরা সকলেই রাশভারি ছিলেন ব'লে আমার মনে পড়ে। সেকালে সমাজে একটা ব্যবহারবিধি ছিল, তাই পরস্পরের মর্যাদা লঙ্ঘন সহজ ছিল না।

রাজেন্দ্রলালের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, গাম্ভীর্য ও বিনয়ে মিশ্রিত তাঁর সহজ আভিজাত্যে আমি মুগ্ধ ছিলুম। তাঁর কাছে নিজের জোরে আমি প্রশ্রয় দাবি করি নি তিনি স্নেহ করে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমশায়ের কথা সব প্রথমে আমি তাঁরই কাছে শুনেছিলাম। অনুভব করেছিলেম শাস্ত্রীমশায়ের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সে সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে তাঁর সঙ্গে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়কে তিনি যে বিশেষভাবে আদর করেছিলেন পরেও তার প্রমাণ দেখেছি। নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him by cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task: and he did his work to my full satisfaction."

এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলালের কথা আমাকে বলতে হল তার কারণ এই যে শাস্ত্রীমশায় দীর্ঘকাল যে রাস্তা ধরে কাজ করেছেন সে রাস্তা আমার পক্ষে দুর্গম। সেইজন্যে তাঁকে প্রথম চিনেছি রাজেন্দ্রলালের প্রশংসাবাক্য থেকে আমার পক্ষে সেই যথেষ্ট।

তার পরে তাঁর সঙ্গে আমার যে পরিচয় সে বাংলা ভাষার আসরে। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার মতো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাক্ তবু বাংলার স্বাতন্ত্র্য যে সংস্কৃত ব্যাকরণের তলায় চাপা পড়বার নয়, আমি জানি এ মতটি শাস্ত্রীমহাশয়ের। এ কথা শুনতে যত সহজে আসলে তা নয়। ভাষায় বাইরের দিক থেকে চোখে পড়ে শব্দের উপাদান। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষার বেশিরভাগ শব্দই সংস্কৃত থেকে পাওয়া। এই শব্দের কোনোটাকে বলি তৎসম, কোনোটাকে তদ্ভব।

ছাপার অক্ষরে বাংলা পড়ে পড়ে একটা কথা ভুলেছি যে, সংস্কৃতের তৎসম শব্দ বাংলায় প্রায় নেই বললেই হয়। 'অক্ষর' শব্দটাকে তৎসম বলে গণ্য করি ছাপার বইয়ে; অন্য ব্যবহারে নয়। রোমান অক্ষরে 'অক্ষর' শব্দের সংস্কৃত চেহারা akshara বাংলায় okkhar। মরাঠি সংস্কৃত শব্দ প্রায় সংস্কৃতেরই মতো, বাংলায় তা নয়। বাংলার নিজের উচ্চারণের ছাঁদ আছে, তার সমস্ত আমদানি শব্দ সেই ছাঁদে সে আপন করে নিয়েছে।

তেমনি তার কাঠামোটাও তার নিজের। এই কাঠামোতেই ভাষার জাত চেনা যায়। এমন উর্দু আছে যার মুখোশটা পারসিক কিন্তু ওর কাঠামোটা বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় উর্দু ভারতীয় ভাষা। তেমনি বাংলার স্বকীয় কাঠামোটাকে কী বলব? তাকে গৌড়ীয় বলা যাক।

কিন্তু ভাষার বিচারের মধ্যে এসে পড়ে আভিজাত্যের অভিমান, সেটা স্বাজাত্যের দরদকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। অব্রাহ্মণ যদি পৈতে নেবার দিকে অত্যন্ত জেদ করতে থাকে তবে বোঝা

যায় যে, নিজের জাতের 'পরে তার নিজের মনেই সম্মানের অভাব আছে। বাংলা ভাষাকে প্রায় সংস্কৃত ব'লে চালালে তার গলায় পৈতে চড়ানো হয়। দেশজ বলে কারো কারো মনে বাংলার 'পরে যে অবমাননা আছে সেটাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নামাবলী দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা অনেকদিন আমাদের মনে আছে। বালক বয়সে যে ব্যাকরণ পড়েছিলুম তাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা দিয়ে বাংলা ভাষাকে শোধন করবার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেছে; অর্থাৎ এই কথা রটিয়ে দেবার চেষ্টা, যে, ভাষাটা পতিত যদি বা হয় তবু পতিত ব্রাহ্মণ, অতএব পতিতের লক্ষণগুলো যতটা পারা যায়, চোখের আড়ালে রাখা কর্তব্য। অন্তত পুঁথিপত্রের চালচলনে বাংলা দেশে 'মস্ত ভিড়'কে কোথাও যেন কবুল করা না হয় স্বাগত বলে যেন এগিয়ে নিয়ে আসা হয় 'মহতী জনতা'কে।

এমনি করে সংস্কৃতভাষা অনেককাল ধরে অপ্রতিহত প্রভাবে বাংলা ভাষাকে অপত্য নির্বিশেষে শাসন করবার কাজে লেগেছিলেন। সেই যুগে নর্মাল স্কুলে কোনোমতে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্যন্ত আমার উন্নতি হয়েছিল। বংশে ধনমর্যাদা না থাকলে তাও বোধহয় ঘটত না। তখন যে ভাষাকে সাধুভাষা বলা হত অর্থাৎ যে ভাষা ভুল করে আমাদের মাতৃভাষার পাড়ায় পা দিলে গঙ্গাস্নান না করে ঘরে ঢুকতেন না তাঁর সাধনার জন্যে লোহারাম শিরোরত্নের ব্যাকরণ এবং আদ্যানাথ পণ্ডিতমশায়ের 'সমাসদর্পণ' আমাদের অবলম্বন ছিল। আজকের দিনে শুনে সকলের আশ্চর্য লাগবে যে, দ্বিগু সমাস কাকে বলে সুকুমারমতি বালকের তাও জানা ছিল। তখনকার কালের পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা দেখলেই জানা যাবে সেকালে বালকমাত্রই সুকুমারমতি ছিল।

ভাষা সম্বন্ধে আর্যপদবীর প্রতি লুব্ধ মানুষ আজও অনেকে আছেন, শুদ্ধির দিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি— তাই কান সোনা পান চুনের উপরে তাঁরা বহু যত্নে মূর্ধন্য ণ-য়ের ছিটে দিচ্ছেন তার অপভ্রংশতার পাপ যথাসাধ্য পালন করবার জন্যে। এমন-কি, ফার্সি 'দরুন' শব্দের প্রতিও পতিতপাবনের করুণা দেখি। গবর্নমেন্টে-র উপর ণত্ব বিধানের জোরে তাঁরা ভগবান পাণিনির আশীর্বাদ টেনে এনেছেন। এঁদের 'পরনে' 'নরুণ-পেড়ে' ধুতি। ভাইপো 'হরেনে'র নামটাকে কোন্ ন-এর উপর শূলে চড়াবেন তা নিয়ে দো-মনা আছেন। কানে কুণ্ডলের সোনার বেলায় তাঁরা আর্য কিন্তু কানে মন্ত্র শোনার সময় তাঁরা অন্যমনস্ক। কানপুরে মূর্ধন্য ণ চড়েছে তাও চোখে পড়ল— অথচ কানাই পাহারা এড়িয়ে গেছে। মহামারী যেমন অনেকগুলোকে মারে অথচ তারই মধ্যে দুটো-একটা রক্ষা পায়, তেমনি হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যে বাংলায় মূর্ধন্য ণ অনেকখানি সংক্রামক হয়ে উঠেছে। যাঁরা সংস্কৃতভাষায় নতুন গ্র্যাজুয়েট এটার উদ্ভব তাঁদেরই থেকে, কিন্তু এর ছোঁয়াচ লাগল ছাপাখানার কম্পোজিটরকেও। দেশে শিশুদের 'পরে দয়া নেই তাই বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে চলেছে অথচ তাতে সংস্কৃতভাষার নিয়মও পীড়িত বাংলার তো কথাই নেই।

প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা আমাদের চেয়ে সংস্কৃত ভাষা কম জানতেন না। তবু তাঁরা প্রাকৃতকে নিঃসংকোচে প্রাকৃত বলেই মেনে নিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে থেকে থেকে তার উপরে সংস্কৃত ভাষার পলস্তারা লাগান নি। যে দেশ পাণিনির সেই দেশেই তাঁদের জন্য, ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের মোহমুক্ত স্পষ্টদৃষ্টি ছিল। তাঁরা প্রমাণ করতে চান নি যে ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সমস্তই হিমালয়ের মাথার উপরে জমাট-করা বিশুদ্ধ বরফেরই পিণ্ড। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত তাঁরা অনেক সংবাদ রাখেন বলেই যে মান পাবার যোগ্য তা নয় তাঁদের স্পষ্ট দৃষ্টি।

যে-কোনো বিষয় শাস্ত্রীমশায় হাতে নিয়েছেন তাকে সুস্পষ্ট করে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয় কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ করে তোলা ধীশক্তির কাজ। এই জিনিসটি অত্যন্ত বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত

পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পাণ্ডিত্য তার জন্যেও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন; আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে তার চর্চাও প্রায় দেখি নে। ধ্বনি প্রবল করবার একরকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে তাতে স্বাভাবিক গলার জোর না থাকলেও আওয়াজে সভা ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই রকম উপায়েই অল্প জানাকে তুমুল করে ঘোষণা করা এখন সহজ হয়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্কা হয়ে উঠল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল সেইটের অভাব ঘটেছে।

তাই আজ এই দৈন্যের দিনে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমশায় যে সঙ্গিবিরল সার্থকতার শিখরে আজও বিরাজ করছেন তারই অভিমুখে সসম্মানে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

[১৩৩৮]

# হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

## ২

আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের প্রথম অবতারণ দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল। তারপরে তার পরিণতি দেখেছি রাজেন্দ্রলাল মিত্রে। সেদিন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রযত্নে প্রাচীন কাল থেকে আহরিত সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের উপকরণ অনেক জমে উঠেছিল। সেই-সকল অসংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সত্যকে উদ্ধার করবার কাজে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রধানত ইংরেজি ভাষায় ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাঁর মন মানুষ হয়েছিল; পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর রচনা ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশ হত। কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্যাধারার জন্যে বাংলা ভাষার মধ্যে খাত খনন করার কাজে তিনি প্রধান অগ্রণী ছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত বিবিধার্থ সংগ্রহ তার প্রমাণ। তাঁর লিখিত বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল নিরলংকার।

সে অনেক দিনের কথা, সেদিন একদা পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মানিকতলার বাড়িতে কী উপলক্ষে গিয়েছিলুম সেটা উল্লেখযোগ্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বেঁধে দেবার উদ্দেশ্যে তখনকার দিনের প্রধান লেখকদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপনের সংকল্প মনে ছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকেও টেনেছিলুম। বিদ্যাসাগরের কাছেও সাহস করে যাওয়া গেল। তিনি বললেন, তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি সাধন করতে চাও তা হলে আমাদের মতো হোমরাচোমরাদের কখনোই নিয়ো না, আমরা কিছুতে মিলতে পারি নে। তাঁর কথা কতক অংশে খাটল, হোমরাচোমরার দল কেউ কিছুই করেন নি। যত্নের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন একমাত্র রাজেন্দ্রলাল। সমিতির সভ্যদের প্রত্যেকের কাছে ফেরি করিয়ে নেবার জন্যে তিনি ভৌগোলিক পরিভাষার একটি খসড়া লিখে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলুম সকলকে জোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে, তখনকার দিনের লেখকদের নিয়ে সাহিত্যপরিষদ খাড়া করে তুলতে পারি নি, হয়তো নিজেরই অক্ষমতাবশত। তখন বয়স এত অল্প ছিল যে অনেক চেষ্টায় যাঁদের টেনেও ছিলুম তাঁদের কাজে লাগাতে পারলুম না।

আজ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষে শোকসভায় রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুজনের চরিতচিত্র মিলিত হয়ে আছে। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন। আমি তাঁদের উভয়ের মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা— যে-কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন

করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনপ্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেন নি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারি করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং সেইসঙ্গে স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশের শক্তি আজও আমাদের দেশে বিরল। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই এইটেই আমাদের দেশে সাধারণত দেখতে পাই, অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশি মার্কা পাওয়ার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্যপরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্যপরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। এমন সর্বাঙ্গীণ সুযোগ পরিষদ আর কি কখনো পাবে? যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়েই থাকি কোনোমতে মনে করতে পারি নে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেইজন্যে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক, দেশ অকালমৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক নির্বাণের মুহূর্তে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য একদা যে-আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে তিনি শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীতকালকে যিনি ধন্য করেছেন, ভাবীকালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন।

১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

## প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই। যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করেছেন— কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীর প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ

দান না করলে এ কখনো সম্ভব হত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি ও দৈবীশক্তি। আচার্যর এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্যের নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়— প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

প্রথম বয়সে তাঁর প্রতিভা বিদ্যাবিতানে মুকুলিত হয়েছিল; আজ তাঁর সেই প্রতিভার প্রফুল্লতা নানা দলবিকাশ করে দেশের হৃদয়ের মধ্যে উদ্‌বারিত হল। সেই লোককান্ত প্রতিভা আজ অর্ঘ্যরূপে ভারতের বেদীমূলে নিবেদিত। ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেছেন, সে তাঁর কণ্ঠমালায় ভূষণরূপে নিত্য হয়ে রইল। ভারতের আশীর্বাদের সঙ্গে আজ আমাদের সাধুবাদ মিলিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ করুক।

বিচিত্রা
পৌষ ১৩৩৯

## আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেছি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দূরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অনুভব করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞানসম্পদের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিদ্যানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিল। এই প্রবন্ধে সেই তাঁর মহতী ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটি দেখে সেই পরলোকগত মনস্বী পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

## শ্যামকান্ত সর্দেশাই

শ্যামকান্ত সর্দেশাই একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোনো ছাত্র আমরা দেখি নি। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুলর্ভ নয়— কিন্তু বোধশক্তিবান যে-চিত্তবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারি দিকের পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জসীভূত ক'রে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে তা অল্পই দেখা যায়। সেই শক্তি ছিল শ্যামকান্তের, তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল— কিছুই তার কাছে বিদেশি ছিল না। সে আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। আমরা তাকে সকলেই ভালোবেসেছিলুম।

তার সময়কার এমন কোনো ছাত্র আমাদের ওখানে ছিল না, বাংলা ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল। তা ছাড়া আমাদের সংগীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল স্বাভাবিক। এই দুই পথ দিয়েই তার মন আমাদের আশ্রমে আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই বিস্তারিত করতে পেরেছিল। দূর গৃহ থেকে এসেছিল শ্যামকান্ত, কিন্তু আপন হৃদয়মনের শক্তিতে সে আমাদের একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল, এবং এখনো নিকটেই আছে। ইতি ১১ জুন ১৯৩৩

[১৩৪০]

# প্রিয়নাথ সেন

প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর যে-সব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে। আমি জানি তার কারণটি কত স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। তার পর অনেকদিন গেল কেটে, বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটল— পাঠকদের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোর-বয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্তী সামনের জিনিস পিছিয়ে পড়ছে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহুকালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তবু তিনি যে-কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।

শান্তিনিকেতন
২৯ আষাঢ়, ১৩৪০

# জগদানন্দ রায়

আমরা প্রত্যেকেই একটি ছোটো ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নিজের বিশেষ পরিচয় দিয়ে থাকি। জীবনযাত্রার বিশেষ প্রয়োজন এবং অভ্যাস অনুসারে যাদের সঙ্গে আমাদের দৈনিক ব্যবহার তাদেরই পরিবেষ্টনের মধ্যে আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানে সে প্রকাশের মধ্যে নিত্যতা নেই। এই রকমের ছোটো ছোটো সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই যদি আমাদের একমাত্র পরিচয় হয় তা হলে মৃত্যুর মতো শূন্যতা আর কী হতে পারে। প্রাণপণ চেষ্টায় প্রাণ-ধারণের দুঃখ স্বীকার কীজন্যে যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সত্তার সমগ্র পরিচয় নিঃশেষিত হয়ে যায়। মানুষের মন থেকে এ সংস্কার কিছুতেই ঘোচে না যে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা, অথচ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, একদিন তাকে মরতেই হয়। মানুষ তবে কার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে? জীব-প্রকৃতির। সে উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, জীবপ্রবাহ রক্ষা করা চলা।

মরতে মরতেও আমরা নানা রকম তাগিদে তার সেই উদ্দেশ্য সাধন করি। প্রলোভনে, শাসনে ও মোহে প্রকৃতি ফাঁকি দিয়ে আপন কাজ করিয়ে নেয়। প্রতিদিন নগদ পাওনা দিয়ে

খাটিয়ে নিয়ে কাজ শেষ হলেই এক নিমেষেই বিদায় দেয় শূন্যহাতে। বাইরে থেকে দেখলে ব্যক্তিগত জীবনের এই আরম্ভ এই শেষ। প্রকৃতির হাতে এই তার অবমাননা। কিন্তু তাই যদি একান্ত সত্য হয়, তা হলে প্রকৃতির প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই শ্রেয় বলতুম। কিন্তু মন তো তাতে সায় দেয় না।

আছি এই উপলব্ধিটাও আমার কাছে অন্তরতম। এইজন্য নিরতিশয় নাস্তিত্বের কোনো লক্ষণকে চোখে দেখলেও মনে তাকে মানতে এত বেশি বাধে। মৃত্যুকে আমরা বাইরে দেখি অথচ নিজের অন্তরে তার সম্পূর্ণ ধারণা কিছুতেই হয় না। তার প্রধান কারণ নিজেকে দেখি সকলের সঙ্গে জড়িয়ে— আমার অস্তিত্ব সকলের অস্তিত্বের যোগে। উপনিষদ বলেছেন, নিজেকে যে অন্যের মধ্যে জানে সে-ই সত্যকে জানে। তার মৃত্যু নেই, মৃত্যু আছে স্বতন্ত্র আমির। অহমিকায় নিজেকে নিজের মধ্যেই রুদ্ধ করি, নিজেকে অন্যের মধ্যে বিস্তার করি প্রেমে। অহমিকায় নিজেকে আঁকড়ে থাকতে চাই, প্রেমে প্রাণকেও তুচ্ছ করতে পারি— কেননা, প্রেমে অমৃত।

মানুষ সাধনা করে ভূমার, বৃহতের। সে বলেছে যা বড়ো তাতেই সুখ, দুঃখ ছোটোকে নিয়ে। যা ছোটো তা সমগ্রের থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন বলেই অসত্য। তাই ছোটোখাটোর সঙ্গে জড়িত আমাদের যত দুঃখ। আমার ধন, আমার জন, আমার খ্যাতি, আমি-গণ্ডি দিয়ে স্বতন্ত্র-করা যা-কিছু, তাই মৃত্যুর অধিকারে; তাকে নিয়েই যত বিরোধ, যত উদ্‌বেগ, যত কান্না। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তার অমর সম্পদ-সাধনার ইতিহাস। মানুষ মৃত্যুকে স্বীকার করে এই ইতিহাসকে রচনা করছে, সকল দিক থেকে সে আপন উপলব্ধির সীমাকে যুগে যুগে বিস্তার করে চলেছে বৃহতের মধ্যে। যা-কিছুতে সে চিরন্তনের স্বাদ পায় তাকে সেই পরিমাণেই সে বলে শ্রেষ্ঠ।

দুই শ্রেণীর বৃহৎ আছে। যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে, আর যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি। এক হচ্ছে আকাশে ব্যাপ্ত বস্তুর বৃহত্ত্ব, আর হচ্ছে আত্মায় আত্মায় যুক্ত আত্মার মহত্ত্ব। বিষয়-রাজ্যে মানুষ স্বাধীনতা পায় জলে স্থলে আকাশে— যাকে সে বলে প্রগতি। এই বস্তুজ্ঞানের সীমাকে সে অগ্রসর করতে করতে চলে। এই চলায় সে কর্তৃত্ব লাভ করে, সিদ্ধি লাভ করে। মুক্তিলাভ করে আত্মার ভূমায়, সেইখানে তার অমরতা। বস্তুকে তার বৃহৎস্বরূপে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা ঐশ্বর্য পাই, আত্মাকে তার বৃহৎ ঔদার্যে দান করার দ্বারাই আমরা সত্যকে লাভ করি।

বৌদ্ধধর্মে দেখি বলা হয়েছে, মুক্তির একটা প্রধান সোপান মৈত্রী। কর্তব্যের পথে আমরা আপনাকে দিতে পারি পরের জন্যে। সেটা নিছক দেওয়া, তার মধ্যে নিজের মধ্যে পরকে ও পরের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি নেই। মৈত্রীর পথে যে দেওয়া তা নিছক কর্তব্যের দান নয়; তার মধ্যে আছে সত্য উপলব্ধি।

সংসারে সকলের বড়ে সাধনা অন্যের জন্য আপনাকে দান করা, কর্তব্যবুদ্ধিতে নয়— মৈত্রীর আনন্দে অর্থাৎ ভালোবেসে। মৈত্রীতেই অহংকার যথার্থ লুপ্ত হয়, নিজেকে ভুলতে পারি। যে পরিমাণে সেই ভুলি সেই পরিমাণেই বেঁচে থেকে আমরা অমৃতের অধিকারী হই। আমাদের সেই আমি যায় মৃত্যুতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যা অহমিকা দ্বারা খণ্ডিত।

আজকে যা বলতে এসেছি এই তার ভূমিকা।

আজ আশ্রমের পরম সুহৃদ জগদানন্দ রায়ের শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করবার দিন। শ্রাদ্ধের দিনে মানুষের সেই প্রকাশকে উপলব্ধি করতে হবে যা তার মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করে। জগদানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় হয়তো সকলে জানেন না। আমি ছিলেন তখন 'সাধনা'র লেখক এবং পরে তার সম্পাদক। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। 'সাধনা'য় পাঠকদের তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন থাকত। মাঝে মাঝে আমার কাছে তার এমন উত্তর এসেছে যার ভাষা স্বচ্ছ সরল— বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে এমন প্রাঞ্জল বিবৃতি সর্বদা

# প্রিয়নাথ সেন

প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর যে-সব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে। আমি জানি তার কারণটি কত স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। তার পর অনেকদিন গেল কেটে, বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটল— পাঠকদের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোর-বয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্তী সামনের জিনিস পিছিয়ে পড়ছে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহুকালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তবু তিনি যে-কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।

শান্তিনিকেতন
২৯ আষাঢ়, ১৩৪০

# জগদানন্দ রায়

আমরা প্রত্যেকেই একটি ছোটো ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নিজের বিশেষ পরিচয় দিয়ে থাকি। জীবনযাত্রার বিশেষ প্রয়োজন এবং অভ্যাস অনুসারে যাদের সঙ্গে আমাদের দৈনিক ব্যবহার তাদেরই পরিবেষ্টনের মধ্যে আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানে সে প্রকাশের মধ্যে নিত্যতা নেই। এই রকমের ছোটো ছোটো সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই যদি আমাদের একমাত্র পরিচয় হয় তা হলে মৃত্যুর মতো শূন্যতা আর কী হতে পারে। প্রাণপণ চেষ্টায় প্রাণ-ধারণের দুঃখ স্বীকার কীজন্যে যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সত্তার সমগ্র পরিচয় নিঃশেষিত হয়ে যায়। মানুষের মন থেকে এ সংস্কার কিছুতেই ঘোচে না যে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা, অথচ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, একদিন তাকে মরতেই হয়। মানুষ তবে কার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে? জীব-প্রকৃতির। সে উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, জীবপ্রবাহ রক্ষা করা চলা।

মরতে মরতেও আমরা নানা রকম তাগিদে তার সেই উদ্দেশ্য সাধন করি। প্রলোভনে, শাসনে ও মোহে প্রকৃতি ফাঁকি দিয়ে আপন কাজ করিয়ে নেয়। প্রতিদিন নগদ পাওনা দিয়ে

জুড়ে এই প্রেম নিয়তই সৃষ্টির কাজ করে চলেছে। কেবল শক্তি দান করে সৃষ্টি হয় না, আত্মা আপনাকে দান করার দ্বারাই সৃষ্টিকে চালনা করে। বেদে তাই ঈশ্বরকে বলেছেন, 'আত্মদা বলদা' যেখানে আত্মা নেই শুধু বল সেখানে প্রলয়।

আমি এই জানি আমাদের আশ্রমের কাজ পুনরাবৃত্তির কাজ নয়, নিরন্তর সৃষ্টির কাজ। এখানে তাই আত্মদানের দাবি রাখি। এই দানে সীমা নেই। এ দশটা-চারটের মধ্যে ঘের-দেওয়া কাজ নয়। এ যন্ত্রচালনা নয়, এ অনুপ্রাণন।

আজ শ্রাদ্ধের দিনে জগদানন্দের সেই আত্মদানের গৌরবকে স্বীকার করছি। এখানে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে কেবল সিদ্ধি লাভ করেন নি অমৃত লাভ করেছেন। কেননা তিনি ভালোবেসেছেন আনন্দ পেয়েছেন। আপনার দানের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন আপনাকে। তাই আজ শ্রাদ্ধবাসরে যে পারলৌকিক কর্ম এটা তাঁর পারিবারিক কাজ নয় সমস্ত আশ্রমের কাজ। বেঁচে থেকে তিনি যে প্রীতি আকর্ষণ করছিলেন তাঁকে স্মরণ ক'রে তাঁর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে সেই প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি। আশ্রমে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

প্রবাসী
ভাদ্র ১৩৪০

## উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্কর,
তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী করে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা করে রেখেছে— জয়মাল্য নয়— আশীর্বাদপূত বরণমাল্য। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো।

আশ্রম থেকে তোমাকে বিদায় দেবার পূর্বে একটা কথা জানিয়ে রাখি। যে-কোনো বিদ্যা প্রাণলোকের সৃষ্টি— যেমন নৃত্যবিদ্যা— তার সমৃদ্ধি এবং সংবৃদ্ধির সীমা নাই। আদর্শের কোনো একটি প্রান্তে থেমে তাকে ভারতীয় বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নামের দ্বারা চরম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা বিহিত নয়, কারণ সেই অন্তিমতায় মৃত্যু প্রমাণ করে। তুমি দেশবিদেশের নৃত্যরসিকদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পেয়েছ, কিন্তু আমি জানি তুমি মনে মনে অনুভব করেছ যে, তোমার সামনে সাধনার পথ এখনো দূরে প্রসারিত, এখনো তোমাকে নূতন প্রেরণা পেতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে নব নব কল্পমূর্তি। আমাদের দেশে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'কেই প্রতিভা বলে। তোমার প্রতিভা আছে, সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে, তোমার সৃষ্টি কোনো অতীত যুগের অনুবৃত্তিতে বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারে জড়িত হয়ে থাকবে না। প্রতিভা কোনো সীমাবদ্ধ সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকে না, অসন্তোষই তার জয়যাত্রাপথের সারথি। সেই পথে যে-সব তোরণ আছে তা থামবার জন্যে নয়, পেরিয়ে যাবার জন্যে।

একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উদ্‌বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্‌বাহিত করে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ।

নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণমাত্র নয়। মানবসমাজে নৃত্য সেইখানেই বেগবান, গতিশীল, সেইখানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য আছে। যে দেশে প্রাণের ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত, নৃত্যে সেখানে শৌর্যের বাণী পাওয়া যায়। শ্রাবণমেঘে নৃত্যের রূপ তড়িৎ-লতায়, তার নিত্যসহচর বজ্রাগ্নি। পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে, সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাস-ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য

দেখতে পাওয়া যায় না। পরে জানতে পেরেছি এগুলি জগদানন্দের লেখা, তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম দিয়ে পাঠাতেন। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক সমস্যার এরূপ সুন্দর উত্তর কোনো স্ত্রীলোক এমন সহজ করে লিখতে পারেন ভেবে বিস্ময় বোধ করেছি। একদিন যখন জগদানন্দের সঙ্গে পরিচয় হল তখন তাঁর দুঃস্থ অবস্থা এবং শরীর রুগ্ণ। আমি তখন শিলাইদহে বিষয়কর্মে রত। সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে তাঁকে জমিদারি কর্মে আহ্বান করলেম। সেদিকেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্ব ছিল। মনে আক্ষেপ হল— জমিদারি সেরেস্তা তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়, যদিও সেখানেও বড়ো কাজ করা যায় উদার হৃদয় নিয়ে। জগদানন্দ তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে তিনি বারংবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হল তাঁকে বাঁচানো শক্ত হবে। তখন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে আহ্বান করে নিলুম শান্তিনিকেতনের কাজে। আমার প্রয়োজন ছিল এমন সব লোক, যাঁর সেবাধর্ম গ্রহণ করে এই কাজে নামতে পারবেন, ছাত্রদেরকে আত্মীয়জ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠ দান দিতে পারবেন। বলা বাহুল্য, এরকম মানুষ সহজে মেলে না। জগদানন্দ ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক। স্বল্পায়ু কবি সতীশ রায় তখন বালক, বয়স উনিশের বেশি নয়। সেও এসে এই আশ্রমগঠনের কাজে উৎসর্গ করলে আপনাকে। এঁর সহযোগী ছিলেন মনোরঞ্জন বাঁড়ুজ্যে, এখন ইনি সম্বলপুরের উকিল, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, পরে ইনি জয়পর স্টেটে কর্মগ্রহণ ক'রে মারা গিয়েছেন।

বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল অনেকেরই থাকে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে কীর্তিলাভ করতেও পারেন অনেকে, কিন্তু জগদানন্দের সেই দুর্লভ গুণ ছিল যাঁর প্রেরণায় কাজের মধ্যে তিনি হৃদয় দিয়েছেন। তাঁর কাজ আনন্দের কাজ ছিল, শুধু কেবল কর্তব্যের নয়। তার প্রধান কারণ, তাঁর হৃদয় ছিল সরস, তিনি ভালোবাসতে পারতেন। আশ্রমের বালকদের প্রতি তাঁর শাসন ছিল বাহ্যিক, স্নেহ ছিল আন্তরিক। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা দূরত্ব রক্ষা করে ছেলেদের কাছে মান বাঁচিয়ে চলতে চান— নিকট পরিচয়ে ছেলেদের কাছে তাঁদের মান বজায় থাকবে না এই আশঙ্কা তাঁদের ছাড়তে চায় না। জগদানন্দ একই কালে ছেলেদের সুহৃদও ছিলেন সঙ্গী ছিলেন অথচ শিক্ষক ছিলেন অধিনায়ক ছিলেন— ছেলেরা আপনারাই তাঁর সম্মান রেখে চলত— নিয়মের অনুবর্তী হয়ে নয়, অন্তরের শ্রদ্ধা থেকে। সন্ধ্যার সময় ছাত্রদের নিয়ে তিনি গল্প বলতেন। মনোজ্ঞ করে গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক, হাসতে জানতেন। তাঁর তর্জনের মধ্যেও লুকোনো থাকত হাসি। সমস্ত দিন কর্মের পর ছেলেদের ভার গ্রহণ করা সহজ নয়। কিন্তু তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্যের সীমানা অতিক্রম করে স্বেচ্ছায় স্নেহে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করতেন।

অনেকেই জানেন ক্লাসের বাইরেও ছেলেদের ডেকে ডেকে তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে কখনোই তিনি আলস্য করতেন না। নিজের অবকাশ নষ্ট করে অকাতরে সময় দিতেন তাদের জন্যে।

কর্তব্যসাধনের দ্বারা দাবি চুকিয়ে দিয়ে প্রশংসা লাভ চলে। কর্তব্যনিষ্ঠতাকে মূল্যবান বলেই লোকে জানে। দাবির বেশি যে দান সেটা কর্তব্যের উপরে, সে ভালোবাসার দান। সে অমূল্য, মানুষের চরিত্রে যেখানে অকৃত্রিম ভালোবাসা সেইখানেই তার অমৃত। জগদানন্দের স্বভাবে দেখেছি সেই ভালোবাসার প্রকাশ, যা সংসারের সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে তাকে চিরন্তনের সঙ্গে যোগযুক্ত করেছে। আশ্রমে এই ভালোবাসা-সাধনার আহ্বান আছে। নির্দিষ্ট কর্মসাধন করে তার পর ছুটি নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে চান যাঁরা, সেরকম শিক্ষকের সত্তা এখানে ক্ষীণ অস্পষ্ট। এমন লোক এখানে অনেক এসেছেন গেছেন পথের পথিকের মতো। তাঁরা যখন থাকেন তখনো তাঁরা অপ্রকাশিত থাকেন, যখন যান তখনো কোনো চিহ্নই রেখে যান না।

এই যে আপনার প্রকাশ, এ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন— এ প্রকাশ ভালোবাসায়, কেননা, ভালোবাসাতেই আত্মার পরিচয়। জগদানন্দের যে দান যে প্রাণবান, সে শুধু স্মৃতিপটে চিহ্ন রাখে না, তা একটি সক্রিয় শক্তি বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যায়। আমরা জানি বা না-জানি বিশ্ব

জুড়ে এই প্রেম নিয়তই সৃষ্টির কাজ করে চলেছে। কেবল শক্তি দান করে সৃষ্টি হয় না, আত্মা আপনাকে দান করার দ্বারাই সৃষ্টিকে চালনা করে। বেদে তাই ঈশ্বরকে বলেছেন, 'আত্মদা বলদা' যেখানে আত্মা নেই শুধু বল সেখানে প্রলয়।

আমি এই জানি আমাদের আশ্রমের কাজ পুনরাবৃত্তির কাজ নয়, নিরন্তর সৃষ্টির কাজ। এখানে তাই আত্মদানের দাবি রাখি। এই দানে সীমা নেই। এ দশটা-চারটের মধ্যে ঘের-দেওয়া কাজ নয়। এ যন্ত্রচালনা নয়, এ অনুপ্রাণন।

আজ শ্রাদ্ধের দিনে জগদানন্দের সেই আত্মদানের গৌরবকে স্বীকার করছি। এখানে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে কেবল সিদ্ধি লাভ করেন নি অমৃত লাভ করেছেন। কেননা তিনি ভালোবেসেছেন আনন্দ পেয়েছেন। আপনার দানের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন আপনাকে। তাই আজ শ্রাদ্ধবাসরে যে পারলৌকিক কর্ম এটা তাঁর পারিবারিক কাজ নয় সমস্ত আশ্রমের কাজ। বেঁচে থেকে তিনি যে প্রীতি আকর্ষণ করছিলেন তাঁকে স্মরণ ক'রে তাঁর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে সেই প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি। আশ্রমে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

প্রবাসী
ভাদ্র ১৩৪০

## উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্কর,
তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী করে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা করে রেখেছে— জয়মাল্য নয়— আশীর্বাদপূত বরণমাল্য। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো।

আশ্রম থেকে তোমাকে বিদায় দেবার পূর্বে একটা কথা জানিয়ে রাখি। যে-কোনো বিদ্যা প্রাণলোকের সৃষ্টি— যেমন নৃত্যবিদ্যা— তার সমৃদ্ধি এবং সংবৃদ্ধির সীমা নাই। আদর্শের কোনো একটি প্রান্তে থেমে তাকে ভারতীয় বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নামের দ্বারা চরম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা বিহিত নয়, কারণ সেই অন্তিমতায় মৃত্যু প্রমাণ করে। তুমি দেশবিদেশের নৃত্যরসিকদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পেয়েছ, কিন্তু আমি জানি তুমি মনে মনে অনুভব করেছ যে, তোমার সামনে সাধনার পথ এখনো দূরে প্রসারিত, এখনো তোমাকে নুতন প্রেরণা পেতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে নব নব কল্পমূর্তি। আমাদের দেশে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'কেই প্রতিভা বলে। তোমার প্রতিভা আছে, সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে, তোমার সৃষ্টি কোনো অতীত যুগের অনুবৃত্তিতে বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারে জড়িত হয়ে থাকবে না। প্রতিভা কোনো সীমাবদ্ধ সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকে না, অসন্তোষই তার জয়যাত্রাপথের সারথি। সেই পথে যে-সব তোরণ আছে তা থামবার জন্যে নয়, পেরিয়ে যাবার জন্যে।

একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উদ্‌বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্‌বাহিত করে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ।

নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণমাত্র নয়। মানবসমাজে নৃত্য সেইখানেই বেগবান, গতিশীল, সেইখানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য আছে। যে দেশে প্রাণের ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত, নৃত্যে সেখানে শৌর্যের বাণী পাওয়া যায়। শ্রাবণমেঘে নৃত্যের রূপ তড়িৎ-লতায়, তার নিত্যসহচর বজ্রাগ্নি। পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে, সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাস-ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য

হারায়, যেমন বাইজির নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে তার সমলতা থেকে উদ্ধার করো। সে মন ভোলাবার জন্যে নয়, মন জাগাবার জন্যে। বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে ও সফলতায় সমুৎসুক করে তোলে। তোমার নৃত্যে ম্লানপ্রাণ দেশে সেই আনন্দের বাতাস জাগুক, তার সুপ্ত শক্তি উৎসাহের উদ্দাম ভাষায় সতেজে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক, এই আমি কামনা করি। ইতি

প্রবাসী
ভাদ্র ১৩৪০

# স্বামী শিবানন্দ

দেশে যে-সকল মহৎ প্রতিষ্ঠানে মানুষই মুখ্য, কর্মব্যবস্থা গৌণ, মানুষের অভাব ঘটিলে তাহাদের প্রাণশক্তিতে আঘাত লাগে। শিবানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রমে সেই দুর্যোগ ঘটিল। এখন যাঁরা বর্তমান আছেন, প্রাণ দিয়া মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব তাঁহাদেরই। অহমিকাবর্জিত পরস্পর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন এখন আরও বাড়িয়া উঠিল। নহিলে শূন্য পূর্ণ হইবে না এবং সেই ছিদ্রপথে বিশ্লিষ্টতার আক্রমণ আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে, সেই আশঙ্কা অনুভব করিতেছি। মহাপুরুষের কীর্তি ও স্মৃতি রক্ষার মহৎভাব যাঁহাদের উপরে তাঁহারা নিজেদের ভুলিয়া সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার এক লক্ষ্যে সকলে সম্মিলিত হইবেন— শিবানন্দ স্বামী তাঁহার মৃত্যুর মধ্যে এই বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। দোল পূর্ণিমা ১৩৪০

আনন্দবাজার পত্রিকা
২২ ফাল্গুন ১৩৪০
প্রবর্তক ১৩৪০

# নন্দলাল বসু

স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম বয়সেই সমাজ তাঁকে নির্মমভাবে ত্যাগ করছে কিন্তু কঠিন দুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ করেন নি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চলত; ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেনসন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, শর্ত ছিল এই যে তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা রাজি হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন, সে সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক কোঠায় মিলেয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবলমাত্র তার্কিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলব্ধি ও প্রকাশ।

শিল্পকলায় রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ করি আরো ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাই নে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্মের অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। স্বভাবকবিকে স্বভাবশিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি তাদের লেখায়, তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের ব্যবহারে, তাদের দিনযাত্রায়, তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভঙ্গিতে।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম

করে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হতে পারে না, বস্তুত প্রতিকূলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নিকট থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে-দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এল্‌ম্‌হর্স্ট। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এড়ুকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচার-শক্তি অন্তর্দর্শী একদল লোক আছে আর্টকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এইরকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার করা। এইরকমের যাচাই-প্রণালী ম্যুজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিস মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলেছে, সে এগোচ্ছে, তার সম্ভূতির শেষ হয় নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়ে নি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেইজন্যই তাঁর সঙ্গ এড়ুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি— তার এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে তাঁর নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হল, বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ আর্টস আছে, এবং এ কথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে, সেই স্কুলের অনুবর্তীরা আমাদের এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে লেখালেখি করে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল সস্তায় চোখ ভোলাবার ফন্দি, বাস্তব সংসারের প্রাণবৈচিত্র্য তার মধ্যে নেই। আমরা কাগজেপত্রে কোনো প্রতিবাদ করি নি— ছবিগুলি দেখানো হল। এতদিন যা বলে তাঁরা বিদ্রূপ করে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ, বিচিত্র হাতের ছাঁদে, তাতে না আছে সাবেক কালের নকল না আছে আধুনিকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চল্‌তি বাজারদরের প্রতি লক্ষ্যমাত্র নেই।

যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গির দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা করে তোলে। তাদের কর্মে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয়শক্তি কেবলই

তার পথ তৈরি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না। যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হত তা হলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা খরিদ্দার তাদের বিচারবুদ্ধি অচল শক্তিতে খুঁটিতে বাঁধা। তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যস্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভালো লাগার পরিমাণ জনশ্রুতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিস্টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্তন করলে আর্টিস্টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণেঅ ভাঙতে থাকে, আর যাই হোক, হাটে-বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক, বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি, নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করে, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তো হোক। অমুক বই বা অমুক ছবি পর্যন্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকর্ষের সীমা— বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, লোকের অভ্যস্ত বরাদ্দ বিঘ্ন ঘটেছে। সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক সেই পাপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অতীত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অন্তহীনের আহ্বানে।

আর্টিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তাঁর জীবনে। আমরা বারংবার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির দিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষার দৌড় থাকত, তা হলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চাদাম-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্প-সাধকদের তপস্যার সম্মুখে রজত নূপুরনিক্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তিবর দেন। সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর-একটি লক্ষণ দেখা যায়, সে তাঁর অবিচলিত ধৈর্য। বন্ধুর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় নি তার দৃষ্টান্ত দেখেছি। যারা তাঁকে জানে এমনতরো ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তিনি অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করে। তাঁর মন গরীব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ীর কারো প্রতি ঈর্ষার আভাসমাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি। যাকে যার দেয় সেটি চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের যশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনোদিন তাঁকে ছোটো হতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য; নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি নিজের রচনায় যেমন, নিজের স্বভাবেও তিনি তেমনি শিল্পী, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না।

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা এ কথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর ঔদার্যে ও চিত্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এরকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি।

বিচিত্রা

চৈত্র ১৩৪০

# খান আবদুল গফ্‌ফর খান

অল্পক্ষণের জন্যে আপনি আমাদের মধ্যে এসেছেন কিন্তু সেই সৌভাগ্যকে আমি অল্প বলে মনে করি নে। আমার নিবেদন এই যে আমার এ কথাকে আপনি অত্যুক্তি ব'লে মনে করবেন না যে আপনার দর্শন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করেছে। প্রেমের উপদেশ মুখে ব'লে ফল হয় না, যাঁরা প্রেমিক তাঁদের সঙ্গই প্রেমের স্পর্শমণি, তার স্পর্শে, আমাদের অন্তরে যেটুকু ভালোবাসা আছে তার মূল্য বেড়ে যায়।

অল্পক্ষণের জন্য আপনাকে আমরা পেয়েছি কিন্তু এই ঘটনাকে ক্ষণের মাপ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। যে মহাপুরুষদের হৃদয় সকল মানুষের জন্য, সকল দেশই যাঁদের দেশ, তাঁরা যে-কালকে উপস্থিতমতো অধিকার করেন তাকে অতিক্রম করেন, তাঁরা সকল কালের। এখানে আপনার ক্ষণিক উপস্থিতি আশ্রমের হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে রইল।

আপনার জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যের প্রভাব আপনি চারি দিকে কী রকম বিকীর্ণ করেন এই অল্প সময়ের মধ্যে তা আমরা অনুভব করেছি। জেনেছি আমাদের সকল কর্ম এই সত্যবোধের অভাবে প্রতিদিন ব্যর্থ হচ্ছে। অপরাজেয় সত্যের জোরেই প্রেমের মন্ত্রে এই শতধাবিদীর্ণ দুর্ভাগ্য দেশের আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষ অপনয়ন করবেন, বিধাতার এই সংকল্পেই আপনার আবির্ভাব। আপনার সেই চরিত্রশক্তির কিছু উদ্যম আমাদের আশ্রমবাসীর মনে আপনি সঞ্চার করে গেছেন তাতে আমার সংশয় নেই। আপনি আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তের অভিবাদন গ্রহণ করুন। একান্তমনে এই কামনা করি ভগবানের প্রসাদে দীর্ঘজীবী হয়ে আমাদের পীড়িত দেশকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যান।

[১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪]

# দিনেন্দ্রনাথ

অকস্মাৎ কাল দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ আশ্রমে এসে পৌঁছল। শোকের ঘটনা উপলক্ষ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যে শোকপ্রকাশ করা হয় তার প্রথাগত অঙ্গ যেন একে না মনে করি। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা সকলে দিনেন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানত না— কর্মের যোগে সম্বন্ধও তাঁর সঙ্গে ইদানীং এখনকার অল্প লোকের সঙ্গেই ছিল। অধ্যাপকেরা সকলেই এক সময়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ তাঁদের ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল।

যে শোকের কোনো প্রতিকার নেই তাকে নিয়ে সকলে মিলে আন্দোলন করে কোনো লাভ নেই এবং আত্মীয়বন্ধুদের যে-শোক, অন্য সকলের মনে তার সত্যতাও প্রবল নয়। এই মৃত্যুকে উপলক্ষ ক'রে মৃত্যুর স্বরূপকে চিন্তা করবার কথা মনে রক্ষা করা চাই। সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করে এমন কোনো কোণ নেই যেখানে প্রাণের সঙ্গে মৃত্যুর সম্বন্ধ লীলায়িত হচ্ছে না; এই যে অনিবার্য সঙ্গ, এ যে শুধু অনিবার্য তা নয়, এ না হলে মঙ্গল হত না— দুঃখকে মানতেই হবে, শোক-দুঃখ মিলন-বিচ্ছেদ উন্মীলন-নিমীলনেই সমাজ গ্রথিত— এই আঘাত-অভিঘাতের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যে কঠোরতা আছে সেইটি না থাকলেই যথার্থ দুঃখের দিকটাই দেখব, তার মধ্যে যে অপরাজিত সত্য সে তো অবসন্ন হয় না— অথচ মানুষের দুঃখের কি অন্ত আছে? মৃত্যুকে যদি বিচ্ছিন্ন করে দেখি তা হলেই আমরা অসহিষ্ণু হয়ে নালিশ করি এর মধ্যে মঙ্গল কোথায়? এই দুঃখের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে, নইলে দুর্বলতায় সৃষ্টি অভিভূত হত— দুঃখ আছে বলেই মনুষ্যত্বের সম্মান। দুঃখের আঘাত, বেদনা মানুষের জীবনে নানান কান্নায় প্রকাশ; ইতিহাসের মধ্যে যদি দেখি তা হলে দেখব অপরিসীম দুঃখকে আত্মসাৎ করে মানুষ আপন সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে-সব এখন কাহিনীতে পরিণত। ইতিহাসে

কত দুঃখ প্লাবন ঘটেছে, কত হত্যাব্যাপার কত নিষ্ঠুরতা— সে-সব বিলুপ্ত হয়েছে, রেখে গেছে দুঃখবিজয়ী মহিমা, মৃত্যুবিজয়ী প্রাণ— মৃত্যুর সম্মুখ দিয়ে প্রাণের ধারা চলেছে— এ না হলে মানুষের অপমান হত। মৃত্যুর স্বরূপ আমরা জানি নে বলে কল্পনায় নানা বিভীষিকার সৃষ্টি করি। প্রাণলোককে মৃত্যু আঘাত করেছে কিন্তু বিধ্বস্ত করতে পারি নি— প্রাণের প্রকাশে অন্তরালে মৃত্যুর ক্রিয়া, প্রাণকে সে-ই প্রকাশিত করে। সম্মুখে প্রাণের লীলা, মৃত্যু আছে নেপথ্যে।

অনেকে ভয় দেখায় মৃত্যু আছে, তাই প্রাণ মায়া। আমরা বলি, প্রাণই সত্য, মৃত্যুই মায়া, মৃত্যু আছে তৎসত্ত্বেও তো যুগে যুগে কোটি কোটি বর্ষ ধরে প্রাণ আপনাকে প্রকাশিত করে আসছে। মৃত্যুই মায়া। এই কথা মনে করে দুঃখকে যেন সহজে গ্রহণ করি; দুঃখ আছে, বিচ্ছেদ ঘটল, কিন্তু এর গভীরে সত্য আছে এ কথা যেন স্বীকার করে নিতে পারি।

আশ্রমের তরফ থেকে দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যা বলবার আছে তাই বলি। নিজের ব্যক্তিগত আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা আপনার অন্তরে থাক্— সকলে মিলে তা আলোচনা করার মধ্যে অবাস্তবতা আছে, তাতে সংকোচ বোধ করি। আমাদের আশ্রমের যে একটি গভীর ভিত্তি আছে, তা সকলে দেখতে পান না। এখানে যদি কেবল পড়াশুনোর ব্যাপার হত তা হলে সংক্ষেপ হত, তা হলে এর মধ্যে কোনো গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পেত না। এটা যে আশ্রম, এটা যে সৃষ্টি, খাঁচা নয়, ক্ষণিক প্রয়োজন উত্তীর্ণ হলেই এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হবে না সেই চেষ্টাই করেছি। এখানকার কর্মের মধ্যে যে-একটি আনন্দের ভিত্তি আছে, ঋতু-পর্যায়ের নানা বর্ণ গন্ধ গীতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টায় আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র আমার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন চারি দিকে ছিল নীরস মরুভূমি— আমার পিতৃদেব কিছু শালগাছ রোপণ করেছিলেন, এ ছাড়া তখন চারি দিকে এমন শ্যাম শোভার বিকাশ ছিল না। এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতার শ্যাম শোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সংগীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভাব যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীবভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র— আমি যে সময়ে এখানে এসেছিলাম তখন আমি ছিলাম ক্লান্ত, আমার বয়স তখন অধিক হয়েছে— প্রথমে যা পেরেছি শেষে তা-ও পারি নি। আমার কবিপ্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন সেবাও করেছেন কিন্তু তার রূপ নেই বলে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ এ তো যাবার নয়— যত দিন ছাত্রদের সংগীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন চলবে, তত দিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, তত দিন তিনি আশ্রমকে অধিগত করে থাকবেন— আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়। এখানকার সমস্ত উৎসবের ভার দিনেন্দ্র নিয়েছিলেন, অক্লান্ত ছিল তাঁর উৎসাহ। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয় নি— গান শিখতে অক্ষম হলেও তিনি ঔদার্য দেখিয়েছেন— এই ঔদার্য না থাকলে এখানকার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হত না। সেই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন বৈতালিকে যে রসমাধুর্য আশ্রমবাসীর চিত্তকে পুণ্য ধারায় অভিষিক্ত করে সেই উৎসকে উৎসারিত করতে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। এই কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে সেই অর্ঘ দান করি যে-অর্ঘ্য তাঁর প্রাপ্য।

প্রবাসী

ভাদ্র ১৩৪২

## দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন তার নিজের গান শুনি নি। কখনো কখনো কোনো কবিতায় তাকে সুর বসাতে অনুরোধ করেছি, কথাটাকে একেবারেই অসাধ্য ব'লে সে উড়িয়ে দিয়েছে। গান নিয়ে যারা তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, তারা জানে সুরের জ্ঞান তার ছিল অসামান্য। আমার বিশ্বাস গান সৃষ্টি করা এবং সেটা প্রচার করার সম্বন্ধে তার কুণ্ঠার কারণই ছিল তাই। পাছে তার যোগ্যতা তার আদর্শ পর্যন্ত না পৌঁছয়, বোধ করি এই ছিল তার আশঙ্কা। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা; কাব্যরসে তার মতো দরদী অল্পই দেখা গেছে। তা ছাড়া কবিতা আবৃত্তি করবার নৈপুণ্যও ছিল তার স্বাভাবিক। বিশেষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরকে আবৃত্তি শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তাকেই অনুরোধ করতে হয়েছে। অথচ কবিতা সে যে নিজে লেখে, এ কথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়। অনেকদিন পূর্বে কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা সে বই আকারে ছাপিয়েছিল। ছাপা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পাঠকসমাজে সেটা প্রচার করবার জন্যে সে লেশমাত্র উদ্যোগ করে নি। আমার মনে হয় কোনো একজনের উদ্দেশে তার রচনা নিবেদন করাতেই পেয়েছে সে তৃপ্তি, পাঠকসাধারণের স্বীকৃতির দিকে সে লক্ষ্যই করে নি। চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করে নি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন-কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখি নি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনাচর্চার বাধাই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয় নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়। আজ এতেই আমি সুখ বোধ করি যে, তার জীবনের একটি প্রধান পরিতুষ্টির উপকরণ আমিই তাকে জোগাতে পেরেছিলুম।

দিনেন্দ্রের যে পরিচয় আচ্ছন্ন ছিল, যে পরিচয় শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকাশ পাবার অবসর পায় নি, আমাদের কাছে সেইটিরই প্রতিষ্ঠা হল তার এই স্বল্পসঞ্চিত গানে ও কবিতায়। রচনা নিয়ে খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা তার কিছুমাত্র ছিল না, তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তার নিজের ইচ্ছায় এতকাল এর অধিকাংশই সে প্রকাশ করে নি এবং বেঁচে থাকলে আজও করত না। সেইজন্যে এই বইটি সম্বন্ধে মনে কোনো সংকোচ নেই যে, তা বলতে পারি নে। কিন্তু তার বন্ধু ছিল অনেক, তার ছাত্রেরও অভাব ছিল না, এদের সম্মুখে এবং আমাদের মতো স্নিগ্ধজনের কাছে এই লেখাগুলি নিয়ে তার একটি মানসমূর্তির আবরণ উদ্ঘাটিত হল— এই আমাদের লাভ।

১ ভাদ্র, ১৩৪৩

## কমলা নেহরু

আজ কমলা নেহরুর মৃত্যুদিনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করবার জন্য আমরা আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত। একদিন তাঁর স্বামী যখন কারাগারে, যখন তাঁর দেহের উপরে মরণান্তিক রোগের ছায়া ঘনায়িত, সেই সময় তিনি তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, সেই দুঃসময়ে তাঁর কন্যাকে আশ্রমে গ্রহণ ক'রে কিছুদিনের জন্যে তাঁদের নিরুদ্বিগ্ন করতে পেরেছিলেম। সেই দিনের কথা আজ মনে পড়ছে— সেই তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর অবিচলিত ধৈর্যের মূর্তি ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

সাধারণত শোক প্রকাশের জন্য যে-সব সভা আহূত হয়ে থাকে, সেখানে অধিকাংশ সময় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই অত্যুক্তি দ্বারা বাক্যকে অলংকৃত করতে হয়। আজ যাঁর কথা স্মরণ করার

জন্যে আমরা সবাই মিলেছি, তাঁকে শোকের মায়া বা মৃত্যুর ছায়া দিয়ে গড়ে তোলবার দরকার নেই। তাঁর চরিত্রের দীপ্তি সহজেই আত্মপ্রকাশ করেছে, কারো কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নি। বস্তুত এ যে নারী, যিনি চিরজীবন আপন স্তব্ধতার মধ্যে সমাহিত থেকে পরম দুঃখ নীরবে বহন করেছেন, তাঁর পরিচয়ের দীপ্তি কেমন করে যে আজ স্বতঃই সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হল সে কথা চিন্তা করে মন বিস্মিত হয়। আধুনিককালে কোনো রমণীকে জানি নে, যিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে অনতিকালের মধ্যে সমস্ত দেশের সম্মুখে এমন অমৃত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে পেরেছেন।

কমলা নেহরু যাঁর সহধর্মিণী, সেই জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী। অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট— কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্সের সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে তিনি নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপদজনক, সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেন নি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায় করেন নি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে অর্ঘ্যে অসংকোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তি সাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড়ো দান।

কমলা ছিলেন জওহরলালের প্রকৃত সহধর্মিণী। তাঁর মধ্যে ছিল, সেই অপ্রমত্ত শান্তি, সেই অবিচলিত স্থৈর্য, যা বীর্যের সর্বোত্তম লক্ষণ। তাঁদের দুজনের কারো মধ্যে দেখি নি অতি ভাবালুতার চঞ্চল উত্তেজনা। তাঁদের এমন পরিপূর্ণ মিলনে কী জীবনে কী মৃত্যুতে বিচ্ছেদের স্থান নেই। নিশ্চয়ই আজ তাঁর স্বামী মরণের মধ্যে দিয়ে কমলাকে দ্বিগুণ করে লাভ করেছেন। যিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, আজও তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী রইলেন।

দূর অতীতের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষণিকায় আমরা পুরাণ-বিখ্যাত সাধ্বী ও বীরাঙ্গনাদেরকে তাঁদের বিরাট স্বরূপে দেখতে পাই। কমলা নেহরু আজও কালের সেই পরিপ্রেক্ষণিকায় উত্তীর্ণ হন নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিকটবর্তী বর্তমানের প্রত্যক্ষগোচর; এখানে বড়োর সঙ্গে ছোটো, মূল্যবানের সঙ্গে অকিঞ্চিৎকর জড়িত হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁর মধ্যে দেখছি যেন একটি পৌরাণিক মহিমা; তিনি তাঁর আপন মহত্ত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় নিত্যরূপে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান।

আজ হোলির দিন আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারি দিকে শুষ্কপত্র ঝ'রে পড়ছে, তার মধ্যে নবকিশলয়ের অভিনন্দন। আজ জরা-বিজয়ী নূতন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নব-জীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের সর্বব্যাপী আশ্বাস। আজ এই নবযুগের ঋতুরাজ জওহরলাল। আর আছেন বসন্তলক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্যসত্তায় সম্মিলিত। তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসন্ত সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সে তো অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেন নি। সাংঘাতিক বিরুদ্ধতার প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তাঁরা দেশের শুভ-সূচনা করেছেন। এইজন্যে আমাদের আশ্রমে এই বসন্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিনরূপে গ্রহণ করেছি। তাঁরা আপন নির্ভীক বীর্যের দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক।

এই নারীর জীবনে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে প্রতিদিন যে দুঃসহ সংগ্রাম চলেছিল, যে-সংগ্রামে তিনি কোনোদিন পরাভব স্বীকার করেন নি, সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কঠিন বিচ্ছেদ তিনি অচঞ্চলচিত্তে বহন করেছেন স্বামীর মহৎ ব্রতের প্রতি লক্ষ্য করে। দুর্বিষহ দুঃখের দিনেও স্বামীকে তিনি পিছনের দিকে ডাকেন নি, নিজের কথা ভুলে সংকটের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁকে বেদনা জানান নি। স্বামীর ব্রতরক্ষা তিনি আপন প্রাণরক্ষার চেয়ে বড়ো করে জেনেছিলেন। এই দুষ্কর সাধনার জোরে তিনি আজও, মৃত্যুর পরেও

দুর্গম পথে স্বামীর নিত্যসঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

আজ এই আমাদের বলবার কথা যে, আমরা লাভ করলুম এই বীরাঙ্গনাকে আমাদের ইতিহাসের বেদিতে। আধুনিক কালের চলমান পটের উপর তিনি নিত্যকালের চিত্র রেখে গেলেন। তাঁকে হারিয়েছি এমন অশুভ কথা আজ কোনোমতেই সত্য হতে পারে না।

আনন্দবাজার শান্তিনিকেতন

২৬ ফাল্গুন ১৩৪২ ৮ মার্চ ১৯৩৬

# বীরেশ্বর

সেদিন আমাদের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের দিন ছিল। আমরা তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। মৃত্যু যে গোপনে উৎসবের আলিঙ্গন থেকে উৎসবের কোলের একটি ছেলেকে কেড়ে নিতে এসেছিল সে সংবাদ আমার জানা ছিল না। আমাদের আশ্রম তারই অনুসরণে পাঠিয়ে দিলে আপদ অনারব্ধ উৎসবকে তার জীবনান্তের শেষ ছায়ার মতো। সেদিন আমাদের বর্ষপঞ্জীর উৎসব-গণনায় একটি শূন্য চিহ্ন রয়ে গেল যেখানে ছিল বীরেশ্বরের আবাল্যকালের আসন। শ্রীনিকেতনের হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার মুখে কে একজন বললে গোঁসাইজির ঘরে দুশ্চিন্তাজনক রোগ দেখা দিয়েছে, ব্যস্ততার মুখে কথাটা ভালো করে আমার কানে পৌঁছয় নি। আমি মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারি নি যে বীরেশ্বরই তার লক্ষ্য।

সে ছিল মূর্তিমান প্রাণের প্রতীক, যৌবনের তেজে দীপ্ত। তাকে ভালোবেসেছে আশ্রমের সকলেই, সে ভালোবেসেছে আশ্রমকে। তার সত্তার মধ্যে এমন একটি উদামের পূর্ণতা ছিল যে তাকে হারাবার কথা কল্পনাও করতে পারি নি।

অবশেষে দারুণ সংবাদ নিশ্চিত হয়ে কানে পৌঁছল— তার পর থেকে কত অর্ধরাত্রে ঘুমের ফাঁকে কত ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, কতবার দিনের বেলায় কাজের মাঝে মাঝে তার ছবি মনে অকস্মাৎ ছায়া ফেলে গেল।

সংসারে যাওয়া-আসার পথে, আলো-আঁধারের পর্যাবর্তনে ভিড়ের সঙ্গে মিলে যখন মৃত্যু দেখা দেয় তখন তাকে অসংগত বলে মনে হয় না। বনে অজস্র ফুল ফোটে আর ঝরে, সেই ফোটা-ঝরার ছন্দ একসঙ্গে মেলানো। তেমনি বিরাট সংসারের মাঝখানে জীবনে মৃত্যুতে চিরদিন ধরেই তাল মিলিয়ে চলে। মৃত্যু সেখানে জীবনের ছবিতে দুঃখের দাগ কাটে, চিত্রপটকে ছিন্ন করে না। কিন্তু আশ্রমের মধ্যে সেই মৃত্যুকে আমরা তো অত সহজে মেনে নিতে পারি নে। যারা এখানে মিলেছে তারা মিলেছে পান্থশালায়, সামনে তাদের এগোবার পথ, সেই পথের পাথেয় সংগ্রহ করছে, এখানে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব নেই। এখানকার আশাপ্রত্যাশা প্রভাত-সূর্যের আলোকে দূরপ্রসারিত ভবিষ্যতের দিকে। এর মধ্যে মৃত্যু যখন আসে তখন অভাবনীয় একটা নিষ্ঠুর প্রতিবাদ নিয়ে আসে। অতি তীব্র বেদনায় অনুভব করি এখানে তার অনধিকার।

বীরেশ্বর আমাদের মধ্যে এসেছিল শিশু অবস্থায়। সমস্ত আশ্রমের সঙ্গে সে অখণ্ড হয়ে মিলেছিল, চলছিল এখানকার তরুলতা পশুপাখির অবারিত প্রাণযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বিকাশের অভিমুখে; এখানকার বিচিত্র ঋতুপর্যায়ের রসধারায় তার অভিষেক হয়েছিল। কোনো দিকে সে দুর্বল ছিল না; না শরীরের দিকে, না মনের দিকে, না শ্রেয়োবুদ্ধির দিকে। নবোদিত অরুণরশ্মির মতো তার মধ্যে পুণ্যজ্যোতির আভাস দেখা দিয়েছিল, সে ছিল অকলঙ্ক।

যদি কেউ ত্যাগ বা সেবার দ্বারা জীবনের সত্য রূপ প্রকাশ করতে পারে, তবে তা আমাদের কেবল যে আনন্দ দেয় এমন নয় শক্তিও দেয়। স্বল্পকালীন জীবনমৃত্যুর পাত্রটিকে সে আপন সত্য দ্বারা পূর্ণ করে গেছে। এই সত্যের সম্বন্ধের অবসান নেই। সত্য ভাবে যার কাছে সে আপনাকে নিবেদন করেছিল, বেঁচে থাকলে সেই আশ্রমের কাছে সে ফিরে আসতই।

এখানে অনেক ছাত্রছাত্রী আসেন, যা লাভ করবার হয়তো তা সম্পূর্ণই লাভ করেন, এখানকার আনন্দ-উৎসবে আনন্দিত হন, কিন্তু এখানে তাঁদের আশ্রমবাস অবশেষে একদিন সমাপ্ত হয়। কিন্তু আমি অনুভব করেছি, বীরেশ্বর কেবল এখানকার দান গ্রহণ করতে আসে নি, তার মনের মধ্যে অর্ঘ্য সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, তার জীবনের নৈবেদ্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এইখানকার বেদিমূলেই সমর্পিত হত। মৃত্যুর থালায় সেই নৈবেদ্যই কি এখানে সে চিরদিনের মতো রেখে গেল।

অল্প কিছু দিনের জন্যে সংসারে আমরা আসি আর চলে যাই। বিশ্বব্যাপী মানবপ্রাণের যে জাল বোনা নিত্যই চলেছে তার মধ্যে ছোটোবড়ো একটি করে সূত্র আমরা জুড়ে দিই। তার মধ্যে অনেক আছে বর্ণ যার ম্লান, শক্তি যার দৃঢ় নয়। কিন্তু যে ভালো, যে ভালোবেসেছে, মানুষের ইতিহাসসৃষ্টির মধ্যে সে অলক্ষ্যেও সার্থক হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এমন অনেকে আছে এবং গেছে যাদের নাম জানি নে, মহাশিল্পীর শিল্পে চিরকালের জন্যে তারা কিছু রঙ লাগিয়ে গেছে। বীরেশ্বর তার সরলতা, তার নির্মলতা, তার সহৃদয়তায় আমাদের মনে যে প্রীতির উদ্রেক করে গেছে তারই দ্বারা তার জীবনের শাশ্বতমূল্য আমরা মৃত্যু অতিক্রম করেও অনুভব করি।

জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে বিদ্রূপ করতে এসেছে মৃত্যু, এ কথা মনে নেয় না। বিশ্বের মধ্যে এত বড়ো নিরর্থকতার ব্যঙ্গ তো দেখতে পাই নে। জগৎকে তো দেখতে পাচ্ছি সে মহৎ সে সুন্দর। তার সেই মহত্ত্ব মৃত্যুকে পদে পদে মিথ্যা করে দিয়ে, অমঙ্গলকে মুহূর্তে মুহূর্তে বিলীন করে দিয়ে বিরাজ করে, নইলে সে যে থাকতেই পারত না। এই জগৎ নিত্যই চলছে, কিন্তু আপনাকে তো হারাচ্ছে না। জগতের সেই স্থায়ী সত্যের দিকেই সে রয়ে গেছে, মহাকালের যাত্রাপথে ক্ষণকালের অতিথিরূপে এসে যে আমাদের স্নেহ আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে গেছে। তাকে আমরা হারাই নি, তোমরা তার প্রিয়জন, আমরা তার গুরুজন— এই কথাই আজ অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করি।

প্রবাসী
কার্তিক ১৩৪৪

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র কালের হাত থেকে আজ শতবার্ষিকের অভিবাদন গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ কীর্তিমানের খ্যাতি যে সংকীর্ণ ইতিহাসের প্রাঙ্গণ সীমার বাইরে স্থান পায় না। তিনি তার প্রাচীর অতিক্রম করে এসেছেন মহাকালের উদার অভ্যর্থনায় যেখানে মাটির প্রদীপের নয় আকাশের। প্রায়েই দেখা যায় আধুনিক যুগ অকৃতজ্ঞ; পুরাতনের দানের মূল্য লাঘব করে সম্মানের দায়িত্ব থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়— আশা করি সেই ক্ষণকালের স্পর্ধিত অশ্রদ্ধা পরাভূত করে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে তাঁর চিরকালের অসংশয় অধিকারে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ৩ আষাঢ় ১৩৪৫।

যুগান্তর
১৩৪৫

# মৌলানা জিয়াউদ্দিন

আজকের দিনে একটা কোনো অনুষ্ঠানের সাহায্যে জিয়াউদ্দিনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসীদের কাছে বেদনা প্রকাশ করব, এ কথা ভাবতেও আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। যে অনুভূতি নিয়ে আমরা একত্র হয়েছি তার মূলকথা কেবল কর্তব্যপালন নয়, এ অনুভূতি আরো অনেক গভীর।

জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হল তা পূরণ করা সহজ হবে না, কারণ তিনি সত্য ছিলেন। অনেকেই তো সংসারের পথে যাত্রা করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে চিহ্ন রেখে যায় এমন লোক খুব কমই মেলে। অধিকাংশ লোক লঘুভাবে ভেসে যায় হাল্কা মেঘের মতো। জিয়াউদ্দিন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে স্থান পেয়েছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে একদিন একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এ কথা ভাবতে পারি নে। কারণ তাঁর সত্তা ছিল সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম থেকে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি ছুটিতে, তাঁর এই ছুটিই যে শেষ ছুটি হবে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর লীলা মন মেনে নিতে চায় না। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সত্তা ওতপ্রোতভাবে আশ্রমের সব-কিছুর সঙ্গে মিশে রইল।

তিনি প্রথম আশ্রমে এসেছিলেন বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে, তখন হয়তো তিনি ঠিক তেমন করে মিশতে পারেন নি এই আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে, যেমন পরিপূর্ণ ভাবে মিশেছিলেন পরবর্তী কালে। কেবল যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও কর্মপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ যোগ হয়েছিল তা নয়, তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের তা হয় না। যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্কতা আহরণ করতে পারেন। এই আশ্রমের যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দিন এমনি করেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হল মানবিকতার, আর এই সত্য হল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দেবার শক্তি। ধর্মের দিক থেকে এবং কর্মের দিকে অনেকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর মূলগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ের বিচ্ছেদ ছিল না। তাঁর চলে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা পূরণ করা যাবে না। আশ্রমের মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় একটা শূন্যতা চিরকালের জন্যে রয়ে গেল। তাঁর অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা, তাঁর মতো তেমনি করে কাছে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সংকোচ এসে পরিপূর্ণ সংযোগকে বাধা দেয়। কর্মের ক্ষেত্রে যিনি কর্মী, হৃদয়ের দিক থেকে যিনি ছিলেন বন্ধু, আজ তাঁরই অভাবে আশ্রমের দিক থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে আমরা এক জন পরম সুহৃদকে হারালাম।

প্রথম বয়সে তাঁর মন বুদ্ধি ও সাধনা যখন অপরিণত ছিল, তখন ধীরে ধীরে ক্রমপদক্ষেপে তিনি আশ্রমের জীবনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর সংযোগের পরিণতি মধ্যাহ্নসূর্যের মতো দীপ্যমান হয়েছিল, আমরা তাঁর পূর্ণ বিকাশকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আশা ছিল আরো অনেক কিছু তিনি দিয়ে যাবেন। তিনি যে বিদ্যার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান তেমন করে আর কে নেবে; আশ্রমের সকলের হৃদয়ে তিনি যে সৌহার্দের আসন পেয়েছেন সে আসন আর কী করে পূর্ণ হবে?

আজকের দিনে আমরা কেবল বৃথা শোক করতে পারি। আমাদের আদর্শকে যিনি রূপ দান করেছিলেন তাঁকে অকালে নিষ্ঠুরভাবে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়ায় মনে একটা অক্ষম বিদ্রোহের ভাব আসতে পারে। কিন্তু আজ মনকে শান্ত করতে হবে এই ভেবে যে তিনি যে অকৃত্রিম মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন সেটা বিশ্বভারতীতে তাঁর শাশ্বত দান হয়ে রইল। তাঁর সুস্থ চরিত্রের সৌন্দর্য, সৌহার্দের মাধুর্য ও হৃদয়ের গভীরতা তিনি আশ্রমকে দান করে গেছেন, এটুকু আমাদের পরম সৌভাগ্য। সকলকে তো আমরা আকর্ষণ করতে পারি না। জিয়াউদ্দিনকে কেবল যে আশ্রম আকর্ষণ করেছিল তা নয়, এখানে তিনি তৈরি হয়েছিলেন, এখানকার হাওয়া ও মাটির রসসম্পদে, এখানকার সৌহার্দে তাঁর হৃদয়মন পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেলেন তা আমাদের মনে গাঁথা হয়ে রইবে, তাঁর দৃষ্টান্ত আমরা ভুলব না।

আমার নিজের দিক থেকে কেবল এই কথাই বলতে পারি যে এরকম বন্ধু দুর্লভ। এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর এক দিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আমায় শান্তি দিয়েছে— এ

আমার জীবনে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল। অন্তরে তাঁর সন্নিধির উপলব্ধি থাকবে, বাইরের কথায় সে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না।

শান্তিনিকেতন ৮।৭।৩৮
প্রবাসী
শ্রাবণ ১৩৪৫

## লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে তাহার আপন ভাষার পূর্ণ ঐশ্বর্য উদ্ভাবিত হইলে তবেই পরস্পরের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের দান-প্রতিদান সার্থক হইতে পারিবে এবং সেই উপলক্ষেই শ্রদ্ধা-সমন্বিত ঐক্যের সেতু প্রতিষ্ঠিত হইবে। জীবনে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার এই সাধনা অতন্দ্রিত ছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাঁহার এই প্রভাব বল লাভ করুক এই কামনা করি। ইতি

৩০। ৮। ৩৮

## কামাল আতাতুর্ক

এশিয়াতে একসময় এক যুগ এসেছিল, যাকে সত্যযুগ বলা যেতে পারে, তখন এখান থেকে সভ্যতার মূল উৎসগুলি উৎসারিত হয়েছিল, নানাদিকে নানাদেশে। প্রাচীন এশিয়ার যে আলোকের উৎস যে সভ্যতার দীপালী অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার নানা আলোক জ্বালিয়েছিল চীন, ভারত, আরব, পারস্য, তাদের ধর্মে, কর্মে আচরণে ও জ্ঞানে। সেই আলোক থেকে শিখা গ্রহণ করে সভ্যতার প্রকাশ হয় পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে। একসময়ে এশিয়াতে যে-শিখা প্রজ্বলিত ছিল, তার নির্বাপণের দিন এল, ক্রমে ঘনীভূত হয়ে এল প্রদোষের অন্ধকার। তখন ভিতরের লজ্জা গোপন আর অন্তরের গৌরব রক্ষার জন্য আমরা বার বার নাম জপ করছিলুম ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জুনের, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম, বীর হামির, রানা প্রতাপ, এমন-কি বাংলা দেশের প্রতাপাদিত্য পর্যন্ত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বুঝতে পারি যে, অতীতের গৌরব ও বর্তমানের তুচ্ছতা নিয়ে আমাদের মনের ভিতর প্রবল বেদনা নিহিত ছিল। এই অতীতের দোহাই দেওয়া নিষ্ফলতা আঁকড়ে থাকতে গিয়ে আমরা পদে পদে অপমানিত হয়েছি। এই সভ্যতার মূলে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং যে সংস্কৃতি গ্রামে গ্রামে প্রচারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সে সমস্তকে পশ্চিমের বন্যা এসে ডুবিয়ে একাকার করে দিয়েছে।

ক্রমে বিদেশী ইস্কুলমাস্টারের হাতে আমাদের শিক্ষা যতই পাকা হয়েছে ততই ধারণা হতে লাগল যে, অক্ষমতা আমাদের মজ্জাগত, অজ্ঞতা অন্তর্নিহিত, অন্ধসংস্কার ও মূঢ়তার বোঝা বয়ে পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে থাকবে চিরদিন। তখন আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিলাম যে, বিদেশী শাসনকর্তাদের দ্বারা চালিত হওয়ার বাইরে আমাদের চলৎশক্তি নেই। এদের অনুগ্রহ গণ্ডূষের জন্যে যুগান্তকাল পর্যন্ত অঞ্জলি পেতে থাকাই আমাদের ভাগ্যে নির্দিষ্ট। আপন অধিকারে আপন শক্তিতে জিতে নিতে হবে এমন দুঃসাহসকে তখনকার কংগ্রেসী বীরেরাও মনে স্থান দেন নি। তাঁরা আবেদনের ঝুলি নিয়ে রাজকর্মচারীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন; মুষ্টিভিক্ষার সকরুণ আবদার নিয়ে বার বার দ্বাররক্ষীদের হাতে তাঁদের লাঞ্ছনাও ঘটল। তখন আমরা ভেবেছিলুম যে, স্বল্পতমে সন্তুষ্ট থাকাটাই যেন আমাদের সুদীর্ঘতমকালের একমাত্র গতি। ওরা কেড়ে নেবে আর আমরা বিনা নালিশেই দেব, আর সেই দানেরই সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট থেকে পেট ভরাবার প্রত্যাশার চেয়ে উপরে উঠতে মন সে দিন সাহস পায় নি। নতমস্তকে মেনে নিয়েছি, পাশ্চাত্য চড়ে আছে দুর্গম উচ্চে আর প্রাচ্য গড়াচ্ছে সর্বজনের পদদলিত ধূলিশয্যায়।

থেকে থেকে শঙ্খ ঘণ্টা বাড়িয়ে শিবনেত্র হয়ে বলেছি আমরা আধ্যাত্মিক, আর যারা আমাদের কান মলে তারা বস্তুতান্ত্রিক। হই-না-কেন রোগে জীর্ণ, উপবাসে ক্ষীণ, অশিক্ষায় নিমগ্ন, ছোটো বড়ো সকল প্রকার দুর্গ্রহের কাছে নিঃসহায়, তবু ওদের মতো ম্লেচ্ছ নই। আমরা ফোঁটা কাটি, মালা জপি, স্নানের যোগ এলে চারদিক থেকে হাজার হাজার লোকের আঁধি লেগে যায় স্বর্গলাভের লোভে, আর ওদের যত লোভ আর যত লাভ সবই এই মর্ত্যলোকের সীমানায়— ধিক্। পিঠে মার এসে পড়ে বাস্তবের দেশে আর চুন হলুদ লাগাতে যাই অবাস্তব লোকে।

এমন সময় একটা যুগান্ত দেখা দিল বিনা ভূমিকায়। এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে মধ্য প্রভাতের অভ্যুদয় হল। অনেকদিন অন্ধকারে থেকে আমরা কখনো ভাবতেই পারি নি যে, দিনরথের আবর্তন কোনোদিন আবার প্রাচ্যদিগন্তে পৌঁছতে পারে। আমরা একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম যে, দূরতম প্রাচ্যে ক্ষুদ্রতম জাপান তার প্রবল প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাস্ত করে সভ্য সমাজের উচ্চ আসনে চড়ে বসল; প্রচণ্ড পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাণ্ডারে যে শক্তি ও যে বিদ্যা পুঞ্জিত ছিল জাপান তা অধিকার করল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। দীর্ঘ ইতিহাসের বন্ধুর পন্থায় ক্রমশ পুষ্ট, ক্রমশ ব্যাপ্ত, বহু চেষ্টায় নানা সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমের অমোঘ বিজয় বীর্যকে আপন স্বাধীনতার সিংহদ্বার দিয়ে অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আবাহন করে আনলে। এ যে এত সহজে লভ্য এ কথা আমরা ভাবতে পারি নি। সবিস্ময়ে আশ্বস্ত হয়ে বুঝতে পারলেম, ব্যাপারটা দুরূহ নয়। যে যন্ত্রবিদ্যার জোরে মানুষ আত্মপোষণ ও আত্মরক্ষা করতে পারে সম্পূর্ণভাবে, সেটা আয়ত্ত করতে দীর্ঘকালের তপস্যা লাগে না। এমন-কি Conscription-এর সাহায্যে কুচকাওয়াজ করিয়ে বছর কয়েকের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণকে সৈনিক ব্যবসায়ে অভ্যস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে শ্রেয়, তার পথ অন্তরের পথ, সেটা সহজ নয়। তার জন্যে প্রস্তুত হতে সময় লাগে, লড়াই করতে হয় নিজেরই সঙ্গে। মহাত্মাজির নির্দেশ হল শ্রেয়োনীতির জোরেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, বাহুবলের জোরে নয়। তাঁর কথা যারা মেনে নিয়েছে তারা আত্মার শক্তি কামনা করছে। এই পথের সাধনা বিলম্বে সিদ্ধ হয়।

এই অন্তরের রাস্তা ছাড়া একটা বাহিরের বড়ো রাস্তাও আছে, স্বতন্ত্রতার লক্ষ্য। সেটা অন্নের পথ, আরোগ্যের পথ, দৈন্যলাঘবের পথ। বিজ্ঞানের সাধনা এই পথে, সে জয়ী করে জীবনসংগ্রামে। সে পথে মানুষের শয়তানির বাধা নেই। এমন-কি সে দলে টেনে নেয় বিজ্ঞানকে, কিন্তু সেজন্যে বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া অন্যায়, কেননা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বুদ্ধির সঙ্গে, শ্রেয়োনীতির সঙ্গে নয়। এখানে দোষ দিতে হয় সেই-সকল ধর্মমতকে যে-সকল মত মানুষকে অপমানিত করে, পীড়িত করে, তার বুদ্ধিকে অন্ধ করে, পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে, তার বিচারবর্জিত আচারকে চলার পথে বোঝা করে তোলে।

শতাব্দীর অধিক কাল হল আমরা শক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতির শাসনশৃঙ্খলে বাঁধা আছি। কিন্তু যন্ত্রশক্তির এই চরম বিকাশের দিনেও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা উপবাসী, আমরা রোগজীর্ণ, দারিদ্র্যে আমরা সর্বতোভাবে পঙ্গু। যে-বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে তার আমরা স্পর্শ পাই নি বললেই হয়। এই শিক্ষা জাপানের হয়েছে, আমাদের হয় নি যদিও বুদ্ধিতে আমরা জাপানির চেয়ে কম নই। চোখের সামনেই দেখছি, জাপান এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীর কাছে য়ুরোপের গর্বান্ধ জাতিদের অহংকার পদে পদে খর্ব হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিদ্যা আয়ত্ত করে শতাব্দীর অনতিকালের মধ্যে জাপান যখন এই গৌরব লাভ করলে, তখন আমাদের মনের দ্বারে একটা প্রবল আঘাত লাগল, জাগরণের জন্যে আহ্বান এল আমাদের অন্তরে। এশিয়ার পাশ্চাত্যতম ভূখণ্ডে দেখলুম তুর্কি— যাকে য়ুরোপে Sick-man oF Europe বলে অবজ্ঞা করত, সে কী রকম প্রবল শক্তিতে অসম্মানের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলল। য়ুরোপের প্রতিকূল মনোবৃত্তির সামনে সে আপনার জয়ধ্বজা তুলে ধরলে। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই আত্মগৌরব লাভের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের দুর্গতিগ্রস্ত ইতিহাসের আওতার

আবছায়ার ভিতরে একটা আশ্বাসের আলো প্রবেশ করল। মনে হচ্ছে অসাধ্যও সাধ্য হয়। স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নয়— যা চাই, তা পাব। মূল্য দিতে হবে, সে মূল্য দেবার লোক উঠবে।

এই যে এশিয়ার আকাশের উপরে তুর্কির বিজয়পতাকা উড়ছে, সেই পতাকাকে যিনি সকলরকম ঝড়ঝাপটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন— সেই দূরদর্শী, বীর, সেই রাষ্ট্রনেতার পরলোকগত আত্মাকে প্রগতিকাঙ্ক্ষী আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি যে কেবল তুর্কিকে শক্তি দিয়েছেন তা তো নয়, সেই শক্তিরথের চক্রঘর্ঘর ভারতবর্ষের ভূমিকেও কাঁপিয়ে তুলছে। একটা বাণী এসেছে তাঁর কাছ থেকে, তিনি বুঝিয়েছেন যে, সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে, বিরাট অধ্যবসায় ও অক্ষুণ্ণ আশার কাছে, দুরূহতম বাধাও চিরস্থায়ী হতে পারে না। এই কামালপাশা একদিন নির্ভয়ে দুর্গমপথে যাত্রা করেছিলেন। সেদিন তাঁর সামনে পরাভবের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংকল্পকে তিনি কখনো বিচলিত হতে দেন নি। য়ুরোপের উদ্যত নখদন্তভীষণ সিংহকে তার গুহার মুখেই তিনি ঠেকিয়েছেন। এশিয়াকে এই হল তাঁর দান— এই উৎসাহ।

তাঁর জীবনী সম্বন্ধে সব-কিছু জানা নেই, বলবার সময়ও নেই। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তুর্কিকে তিনি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেইটেই সব চেয়ে বড়ো কথা নয়, তিনি তুর্কিকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলমান ধর্মের প্রচণ্ড আবেগের আবর্তমধ্যে দাঁড়িয়ে, ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন। যে-অন্ধতা ধর্মেরই সব চেয়ে বড়ো শত্রু, তাকে পরাভূত করে তিনি কী করে অক্ষত ছিলেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে তাই ভাবি। তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, সে বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্লভ। বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন করা তাঁর সব চাইতে বড়ো মহত্ত্ব, বড়ো দৃষ্টান্ত।

আমরা অন্য সম্প্রদায়ের কথা বলতে চাই নে, বলা নিরাপদ নয়। নিজেদের দিকে যখন তাকাই তখন মন নৈরাশ্যে অভিভূত হয়। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে যা বলবার তা বলেছেন স্বয়ং মুসলমানবীর কামালপাশা, বলেছেন পারস্যের রেজা শা পহ্লবী।

তুর্কিকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এশিয়ার শোক। যে-হতভাগ্য জাতি তাঁর মন্ত্র গ্রহণ করে নি, তার অবস্থা শোচনীয়। তিনি তুর্কিকে যে প্রাণশক্তি দিয়ে গেছেন, তার অবসান হয়তো হবে না কিন্তু আমরা— হতভাগ্যের দল— এই এশিয়ায় কার দিকে তাকাব। জাপানের দিকে মুখ তোলবার দিন আর আমাদের নেই। এখন এইমাত্র প্রত্যাশায় আমরা সান্ত্বনা পাই যে, প্রাণে আঘাত পেয়েই চীনের প্রাণশক্তি দ্বিগুণ বলিষ্ঠ হয়ে জাপানকে পরাস্ত করবে। যদি সে পরাজিত হয় তবু সে পরাভূত হবে না। এত বড়ো জাত যদি জাগতে পারে, তবে সেই জাগরণের শক্তি ভারতকে প্রভাবান্বিত করবে। তাতে পরোক্ষভাবে ভারতেরই লাভ।

তোমরা প্রগতিপথের তরুণ যাত্রী আজ তোমাদের সম্মেলনের দিনে, সমস্ত এশিয়ার সম্মুখে যিনি প্রগতির পথ উদ্‌ঘাটিত করেছেন, যাঁর জয়গৌরবের ইতিহাসে সমস্ত এশিয়া মহাদেশের বিজয় সূচনা করছে সেই মহাবীর কামালের উদ্দেশে ভারতের নবযুগের অভিবাদন আমরা প্রেরণ করি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৯ পৌষ ১৩৪৫

## কেশবচন্দ্র সেন

আমাদের দেশে আশীর্বাদ করে শতায়ু হও। সে আশীর্বাদ দৈবাৎ হয়তো কখনো ফলে কখনো ফলে না। কিন্তু বিধাতা যাঁকে আশীর্বাদ করেন তিনি দেহযাত্রার সীমা অতিক্রম ক'রে শত শত শতাব্দীর আয়ু লাভ করে থাকেন। সেই বর লাভ করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। উপনিষদ বলেন য এতদ্বিদুরমিতাস্তে ভবন্তি। যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা মৃত্যুর অতীত হন, সেই অমৃত তাঁর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

আমাদের দেশে আশীর্বাদ করে
শতায়ু হও। সে আশীর্বাদ দৈবাৎ হয়তো
কখনো ফলে কখনো ফলে না। কিন্তু
বিধাতা যাঁকে আশীর্বাদ করেন তিনি
দেহমাত্রের সীমা অতিক্রম করে
শত শত শতাব্দীর আয়ু লাভ করে থাকেন।
সেই বর লাভ করেছেন ব্রহ্মানন্দ
কেশব চন্দ্র সেন। উপনিষদ বলেন
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। যাঁরা
তাঁকে জানেন তাঁরা মৃত্যুর অতীত
হন, সেই অমৃত তাঁর জীবনে পেয়েছেন
কেশবচন্দ্র, সেই অমৃত তিনি বিশ্ব
জনকে নিবেদন করেছেন, সেই তাঁর
প্রসাদ স্মরণ করে তাঁর আগামী
জন্ম শতবার্ষিকীর প্রথম শতবার্ষিকীর
দিনে সেই অমিতায়ুকে আমাদের
অভিবাদন জানাই।

১১ই পৌষ
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেশবচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

জীবনে পেয়েছেন কেশবচন্দ্র, সেই অমৃত তিনি বিশ্বজনকে নিবেদন করেছেন, সেই তাঁর প্রসাদ স্মরণ করে তাঁর আগামী বহু শতবার্ষিকীর প্রথম শতবার্ষিকীর দিনে সেই অমিতায়ুকে আমাদের অভিবাদন জানাই।

১৩ পৌষ ১৩৪৫
রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ

# বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

আজকের এই অস্তোন্মুখ সূর্যের মতোই আমার হৃদয় আমার জীবনের পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তার আশীর্বাদ বিকীর্ণ করছে।

তোমার সঙ্গে আজ আমার এই মিলন আর-একদিনকার শুভ সম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সে কথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবার উপলক্ষ ঘটল বলে আমি আনন্দিত। তখন তোমার জন্ম হয় নি, আমি তখন বালক। একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্যে যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম। প্রত্যাশা করি নি এবং এই বহুমানের যোগ্যতা লাভ করবার দিন তখন অনেক সুদূরে ছিল। তার পরে স্বাস্থ্যের সন্ধানে কার্সিয়ঙে যাবার সময়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডেকে নিয়েছিলেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করিতেন প্রিয় বয়স্যের মতো। তাঁর সংগীতের জ্ঞান অসাধারণ ছিল কিন্তু আমার সেই কাঁচা বয়সের রচিত ছেলেমানুষি গান তিনি আদর করে শুনতেন, বোধ হয় তার মধ্যে ভাবী পরিণতির সম্ভাবনা প্রত্যাশা করে। এ যেন কোন্ অদৃশ্য রশ্মির লিপি অঙ্কিত হয়েছিল তাঁর কল্পনার পটে। আজ সকলের চেয়ে বিস্ময় লাগে এই কথা মনে করে যে, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে মহারাজার মনে যে-সকল সংকল্প ছিল, আমাকে নিয়ে তিনি সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন এবং আমাকে সেই সাহিত্য অনুষ্ঠানের সহযোগী করবেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন। তার অনতিকাল পরেই কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হল; মনে ভাবলুম এই রাজবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধসূত্র এইখানেই অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তা যে হল না সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর। তাঁর অভাবে ত্রিপুরায় আমার যে সৌহৃদ্যের আসন শূন্য হল মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সমাদর পেয়েছিলুম তা দুর্লভ। আজ এ কথা গর্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্তমান ভারতবর্ষের কোনো রাজকুল আজ পর্যন্ত পান নি। এই সম্মেলনের যে একটা ঐতিহাসিক মহার্ঘতা আছে আশা করি সে কথা তুমি উপলব্ধি করেছ। যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা রাজারা তাকে রাজৈশ্বর্যের প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করতেন, তোমার পিতামহেরা সে কথা মনে মনে জানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, এবং সে সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির দক্ষিণ সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ। আজ তুমি বর্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছ, এই উপলক্ষে তুমি আমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৫ পৌষ ১৩৪৫

# ঈ. বী. হ্যাভেল

আজকে যাঁর স্মৃতি উপলক্ষে আমরা সমবেত হয়েছি, তাঁর পরিচয় অনেকের কাছেই আজ উজ্জ্বল নয়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম বয়সের কথা বলি। তখন ভারতের শিল্পকলার নিদর্শনগুলি দেশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। কেননা তাদের ইতিহাস ছিল পূর্বাপরের সূত্রচ্ছিন্ন, অস্পষ্ট, এবং সে-ইতিহাস আমাদের শিক্ষা-বিষয়ের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বকালে, নবাবী আমলে বেগবান ছিল চিত্রকলার ধারা। সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের কালে তার প্রভাব হল লুপ্ত। তার একটা কারণ এই যে, ভারতের চিত্রকলা তখনকার কালের ইংরেজের অবজ্ঞাভাজন ছিল। আমরা ছিলুম সেই ইস্কুলমাস্টারের ছাত্র, তাঁদের দৃষ্টি ছিল আমাদের দৃষ্টির নেতা, তার যা ফল তাই ফলেছিল। সেদিন ভারতীয় শিল্পবিদ্যা ছিল ভারতেরই উপেক্ষার দ্বারা তিরস্কৃত। তখন বনেদী রাজাদের ভাণ্ডারে পূর্বকাল থকে যে-সব ছবি সঞ্চিত হয়ে এসেছে তার ক্ষতি ঘটলেও সেটা কারো নজরে পড়ত না। তখন বিদেশের যত সব নিকৃষ্ট ছবি বিনা বাধায় ধনীদের ধনগৌরবের সাক্ষী হয়ে তাঁদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা পেত।

শিক্ষিতদের কাছে নিজের দেশের শিল্পকলার পরিচয় যখন একেবারেই অন্ধকারে, তখন বিদেশী গুণীদের কীর্তি আমাদের কাছে জনশ্রুতির বিষয় ছিল মাত্র। আমরা সেখানকার নামজাদাদের নাম কীর্তন করতে শিখেছি, তার বেশি এগোই নি। সেই নামাবলী জমা ছিল আমাদের মুখস্থ বিদ্যার ভাণ্ডারে। আমরা বিদেশী ছাপার বইয়ে দেখেছি ছাপার কালিতে সেখানকার শিল্পের প্রতিকৃতি, আর ছাপার অক্ষরে তাদের যাচাই দর। সে-সমস্ত পড়া বুলি ঠিকমতো আওড়ানোই ছিল আমাদের শিক্ষিতত্বের প্রমাণ। বিদেশী বইয়ে বিদেশী ছবির আবছায়া সঙ্গে নিয়ে ভেসে এসেছিল সমুদ্রপারের হাওয়ায় যে গুণগান, বিনা বিচারে বিনা তুলনায় তা আমরা মেনে নিয়েছি; কেননা তুলনা করবার কোনো উপাদান আমাদের কাছে ছিল না। অর্থাৎ রেলোয়ে টাইমটেবিলে চোখ বুলিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের ভ্রমণ।

তখন ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে সাহিত্যের অভ্যুদয়। সে কথাও নিজের জীবনের ইতিহাস থেকে বলতে পারি। কাব্যে বাংলা দেশের সাহিত্য থেকে যে প্রেরণা পাব তার পথ ভালো জানা ছিল না।

এমন সময় অক্ষয় সরকার মহাশয় যখন বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম প্রকাশ করলেন লুকিয়ে পড়লাম। পড়ে জানলাম যে কাব্যকলা বলে একটি জিনিস বাংলা প্রাচীন কাব্যে আছে। সেদিন সাহিত্যরসের উদ্দীপনা সহজে প্রাণে পৌঁছল। তারি প্রথম প্রবর্তনায় অন্তত আমার সাহিত্য-অধ্যাবসায়কে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।

চিত্রকলায় মাতৃকক্ষ থেকে পূজোপকরণ নিয়ে রূপসাধনার পরিচয় আমাদের বাড়িতেই পাই। অবন যখন প্রথম তুলি ধরলেন তিনিও বিদেশী পথেই শিক্ষাযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, ইস্কুলমাস্টারের স্বাক্ষরের মক্‌সো ক'রে ক'রে।

তখনকার দিনের মডেল-নকল-করা শিল্পবিদ্যাভ্যাস মনে করলে আজ হাসি পায় কিন্তু তখন গাম্ভীর্য ছিল অক্ষুণ্ণ। সেই চির-ছাত্রগিরির দুর্দিন আজও হয়তো চলত যদি হ্যাভেল এসে দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিতেন। তিনি ফিরিয়ে দিলেন সেই দিকে ভারতীয় রূপকলার যেখানে প্রাণপুরুষের আসন।

সেদিন অবন ও তাঁর ছাত্রেরা শিল্পকলায় আত্মপ্রকাশের আনন্দ-বেদনার প্রথম উদ্‌বোধন যখন পেয়েছিলেন, দেশে তখনো প্রভাতের বিলম্ব ছিল, তখনো আকাশ ছিল আলো-অন্ধকারে আবিল। তার পূর্বে সীসের ফলকে খোদাই করা ছবি দেখেছি পঞ্জিকায়, আর শিশুপাঠ বইয়ে নৃসিংহ-মূর্তি, আর ষণ্ডামার্কের চিত্র, এমন সময় দেখা দিল রবিবর্মার চিত্রাবলী। মন বিচলিত হয়েছিল সে কথা স্বীকার করি। তারা যে কত কৃত্রিম, তারা যে যাত্রার দলের পাত্রপাত্রীর

একশ্রেণীভুক্ত, সে কথা বোঝবার মন তখনো হয় নি। সেই লজ্জাকর অবস্থা থেকে এক দিন যে জাগতে পেরেছি সেজন্যে হ্যাভেলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। সেই নৃসিংহ-মূর্তির মধ্যেও সত্য ছিল কিন্তু রবিবর্মার ছবির মধ্যে ছিল না এ কথা বোঝবার পথ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।

য়ুরোপের শিল্পকলা গৌরবময় আমি জানি, কিন্তু সে-গৌরব আসল জিনিসে, তার প্রেতচ্ছায়ায় নেই। যে আনন্দলোকে তাদের উদ্ভব তারই আবহাওয়ায় যাদের প্রত্যক্ষ বাস, আনন্দের তারাই পূর্ণ অধিকারী। আমরা জহুরির দোকানে মোটা কাচের আড়ালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাপানো মূল্যতালিকা হাতে নিয়ে ঢাকাঢুকির ভিতর থেকে যা আন্দাজ করে নিই তাকে কিছু পেলুম বলে কল্পনা করা শোচনীয়। অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছি মনে করে নৃত্য করেছিলেন এ বিবরণ পড়লে চোখে জল আসে।

অবন ফিরলেন নকল স্বর্গসাধনা থেকে স্বদেশের বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পের স্বরাজ্য স্থাপন করতে। এ একটা শুভ দিন। তাঁর প্রতিভা দেশ থেকে আহ্বান পেল আর তাঁর আহ্বানে দেশ দিল সাড়া। তিনি জাগলেন বলেই জাগালেন। কিন্তু জাগাতে কত দেরি হয়েছিল সে কথা সকলেরই জানা আছে। শিল্পের সেই নব প্রভাতে চার দিক থেকে ভারতীয় কলাভারতীকে কত অবজ্ঞা কত বিদ্রূপ। অযোগ্য জনতার পরিহাসের খরশর বর্ষণের মধ্যে যাঁরা আপন সার্থকতা আবিষ্কার করলেন তাঁদের ধন্য বলি আর সেইসঙ্গে সমস্ত দেশের হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি যিনি তীর্থযাত্রীর সামনে বহুকালের বিলুপ্ত পথকে কাঁটার জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে দিলেন।

সেদিন তাঁরও ছিল না শান্তি। কেননা তাঁর স্বজাতীয়দের মধ্যে অল্প দুই-এক জন মাত্র ছিলেন যাঁরা তাঁর নির্দেশ-পথকে শ্রদ্ধা করতে পারতেন। আর আমাদের দেশের যে-সব ছাত্র শিল্পবিদ্যালয়ে মাথা নিচু করে অনুকৃতির কৃতিত্ব অর্জন করত তারা হায় হায় করে উঠেছিল। ভেবেছিল শিল্পের উচ্চ আদর্শে সম্মানভাজন হবার জন্যে তারা যে অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত, ইংরেজ গুরুর তা সহ্য হল না, তিনি বুঝি দিশি পোটোর দলেই চিরদিনের জন্যে তাদের লাঞ্ছিত করে রেখে দিতে চান। তাদের দোষ ছিল না, কেননা সেদিন ভারতীয় চিত্র-ভারতীর আসন ছিল আবর্জনাস্তূপে। ঘরে পরে তীব্র বিরুদ্ধতার দিনে হ্যাভেল যে সেদিন অবনের মতো ছাত্র পেয়েছিলেন এরকম শুভযোগ দৈবাৎ ঘটে। যোগ্য ছাত্র আবিষ্কার করতে ও তাঁকে যথাপথে প্রবর্তন করতে যে ক্ষমতার আবশ্যক সেও কম দুর্লভ নয়।

অন্ধকারের ভিতর থেকে যুগ-পরিবর্তন যে হল আজ তার প্রমাণ পাই যখন দেখি শিল্পকলায় নব জীবনের বীজ স্বদেশের ভূমিতেই অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। এক দিন আমাদের ঘরে আসত পাঠানের দেশ থেকে কাঠের বাক্সে তুলোয় ঢাকা আঙুর— খেতে হত সাবধানে নিজের পকেটের দিকে দৃষ্টি রেখে। দ্রাক্ষালতা যে স্বদেশের জমিতেও সফল হতে পারে সে কথা সেদিন জানাই ছিল না। সেদিনকার আঙুর-ব্যবসায়ীদের অনেক দাম দিয়েছি, আজ যারা এই মাটিতে আঙুর ফলিয়ে তুললেন তাঁরা চিরদিনের জন্য মূল্য দিলেন স্বদেশকে এ কথা যেন মনে রাখি। সব ফলই যে সমান উৎকর্ষ লাভ করবে এ সম্ভব নয় কিন্তু এখন থেকে আপন মাটির উপরে বিশ্বাস রাখতে পারব এইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা। সে কথাটিকে প্রথম সম্ভাবনা দিয়েছেন যিনি তাঁকে আজ নমস্কার করি। ভূমিকার প্রতি পরিশিষ্টের অশিষ্টতার প্রমাণ পদে পদে পেয়ে থাকি সেই অকৃতজ্ঞতার দুর্যোগকে যথাসাধ্য দূরে ঠেকিয়ে রাখবার অভিপ্রায়ে আজ আমাদের আশ্রমে হ্যাভেলের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করলুম। যাঁরা আজ এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগদান করলেন সেই সহৃদয় বন্ধুদের আমার অভিবাদন জানাই।

শান্তিনিকেতন
১১।১২।৩৮

প্রবাসী
মাঘ ১৩৪৫

# দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজ

আমাদের প্রিয়তম বন্ধু চার্লস অ্যান্ডরুজের গতপ্রাণ দেহ আজ এই মুহূর্তে সর্বগ্রাসী মাটির মধ্যে আশ্রয় নিল। মৃত্যুতে সত্তার চরম অবসান নয় এই কথা বলে শোকের দিনে আমরা ধৈর্যরক্ষা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সান্ত্বনা পাই নে। পরস্পরের দেখায় শোনায় নানাপ্রকার আদান-প্রদানে দিনে দিনে প্রেমের অমৃতপাত্র পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেহাশ্রিত মন ইন্দ্রিয়বোধের পথে মিলনের জন্যে অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। হঠাৎ যখন মৃত্যু সেই পথ একেবারে বন্ধ করে দেয় তখন এই বিচ্ছেদ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল অ্যান্ডরুজকে বিচিত্রভাবে পেয়েছি। আজ থেকে কোনোদিন আর সেই প্রীতিস্নিগ্ধ সাক্ষাৎ মিলন সম্ভব হবে না এ কথা মেনে নিতেই হবে কিন্তু কোনোরূপে তার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পেতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যে-মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ তার সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন উদ্‌বৃত্ত কিছুই থাকে না। তখন সহযোগিতার অবসানকে চরম ক্ষতি বলে সহজে স্বীকার করতে পারি। সেই রকম সাংসারিক সুযোগ ঘটানো দেনাপাওনার সম্বন্ধ মৃত্যুরই অধিকারগত। কিন্তু সকল প্রয়োজনের অতীত ভালোবাসার সম্পর্ক অসীম রহস্যময়, দৈহিক সত্তার মধ্যে তাকে তো কুলোয় না। অ্যান্ডরুজের সঙ্গে আমার অযাচিত দুর্লভ সেই আত্মিক সম্বন্ধই ঘটেছিল। এ বিধাতার অমূল্য বরদানেরই মতো। এর মধ্যে সাধারণ সম্ভবপরতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচয়ের ভিতর হতে এই খৃস্টান সাধুর ভগবদ্ভক্তির নির্মল উৎস থেকে উৎসারিত বন্ধুত্ব আমার দিকে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে না ছিল স্বার্থের যোগ, না ছিল খ্যাতির দুরাশা, কেবল ছিল সর্বতোমুখী আত্মনিবেদন। তখন কেনোপনিষদের এই প্রশ্ন আপনি আমার মনে জেগে উঠেছে, কেনেষিতং প্রেষিতং মনঃ, এই মনটি কার দ্বারা আমার দিকে প্রেরিত হয়েছে, কোথায় এর রহস্যের মূল। জানি এর মূল ছিল তাঁর অসাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তির মধ্যে। সেইজন্যে এর প্রথম আরম্ভের কথাটা বলা চাই।

তখন আমি লন্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্‌স্ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন অ্যান্ডরুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে-রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। অ্যান্ডরুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বর-প্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।

শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। তখন আমাদের এই দরিদ্র বিদ্যায়তনের বাহ্য রূপ ছিল যৎসামান্য এবং এর খ্যাতি ছিল সংকীর্ণ। সমস্ত বাহ্য দৈন্য সত্ত্বে তিনি এর তপস্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন তপস্যার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছিল। আমার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত করে তিনি শান্তিনিকেতনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। সবল চারিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা। কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও পারি নি। অন্যের কাছে কতবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কখনো কিছুই পান নি, কিন্তু সেই ভিক্ষা উপলক্ষে অসংকোচে খর্ব করেছেন যাকে সংসারের আদর্শে

বলে আত্মসম্মান। নিরন্তর দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শান্তিনিকেতন আপন আন্তরিক চরিতার্থতা প্রকাশের সাধনায় নিযুক্ত ছিল এতেই বোধ করি বেশি করে তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছিল।

আমার সঙ্গে অ্যান্ডরুজের যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল সেই কথাটাই এতক্ষণ বললুম কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম। তাঁর এই নিষ্ঠা দেশের লোক অকুণ্ঠিতমনে গ্রহণ করেছে কিন্তু তার সম্পূর্ণ মূল্য কি স্বীকার করতে পেরেছিল? ইনি ইংরেজ, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। কী ভাষায় কী আচারে কী সংস্কৃতিতে সকল দিকেই এঁর আজন্মকালের নাড়ীর যোগ ইংলন্ডের সঙ্গে। তাঁর আত্মীয়মণ্ডলীর কেন্দ্র ছিল সেইখানেই। যে ভারতবর্ষকে তিনি একান্ত আত্মীয় বলে চিরদিনের মতো স্বীকার করে নিলেন, তাঁর দেহমনের সমস্ত অভ্যাসের থেকে তার সমাজব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল বহুদূরে। এই একান্ত নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য। এ দেশে এসে নির্লিপ্ত সাবধানিতার সঙ্গে দূরের থেকে ভারতবর্ষকে তাঁর প্রসাদ বিতরণ করেন নি, অসংকোচে তিনি এখানকার সর্বসাধারণের সঙ্গে সবিনয় যোগ রক্ষা করেছেন। যারা দীন, যারা অবজ্ঞাভাজন, যাদের জীবনযাত্রা তাঁদের আদর্শে মলিন শ্রীহীন নানা উপলক্ষে সহজ আত্মীয়তায় তাদের সহবাস অনায়াসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ দেশের শাসক-সম্প্রদায় যাঁরা তাঁর এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা আপনাদের রাজপ্রতিপত্তির অসম্মান অনুভব করে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাঁকে ঘৃণা করেছেন তা আমরা জানি, তবু স্বজাতির এই অশ্রদ্ধার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নি। তাঁর যিনি আরাধ্য দেবতা ছিলেন তাঁকে তিনি জনসমাজের অভাজনদের বন্ধু বলে জানতেন তাঁরই কাছ থেকে শ্রদ্ধা তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। এই ভারতবর্ষে কী পরের কী আমাদের নিজের কাছে যেখানেই মানুষের প্রতি অবজ্ঞা অবারিত সেখানেই সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি আপন খৃস্টভক্তিকে জয়যুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হবে অনেক বার আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকেও তিনি বিরুদ্ধতা ও সন্দিগ্ধ ব্যবহার পেয়েছিলেন, সেই অন্যায় আঘাত অম্লানচিত্তে গ্রহণ করাও যে ছিল তাঁর পূজারই অঙ্গ।

যে-সময়ে অ্যান্ডরুজ ভারতবর্ষকে আপন আমৃত্যুকালের কর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই সময়ে এ দেশে রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। এমন অবস্থায় এ দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহৃদ্যের আসন রক্ষা করে তিষ্ঠে থাকা ইংরেজের পক্ষে কত দুঃসাধ্য সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দেখেছি তিনি ছিলেন অতি সহজে তাঁর আপন স্থানে, তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। এই যে অবিচলিতচিত্তে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা, এতেই তাঁর আত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে অ্যান্ডরুজকে আমি জানি দুই দিক থেকে তাঁর পরিচয় পাবার সুযোগ আমার হয়েছে, এক আমার অত্যন্ত কাছে, আমার প্রতি সুগভীর ভালোবাসায়। এমনতরো অকৃত্রিম অপর্যাপ্ত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। আর দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মোৎসর্গ। দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ দেশের অন্ত্যজদের প্রতি। তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখনি তাঁকে আহ্বান করেছে তখনি নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে। এইজন্যেই তাঁকে স্থিরভাবে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজে বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল।

এই যে তাঁর প্রীতি এ যে সংকীর্ণভাবে ভারতবর্ষের সীমাগত সে কথা বললে ভুল বলা হবে। তাঁর খৃস্টধর্মে সর্বমানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ। একদা তারই প্রমাণ পেয়েছিলুম যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কাফ্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখেছি, যখন সেখানকার ভারতীয়েরা কাফ্রিদেরকে আপনাদের থেকে স্বতন্ত্র করে হেয় করে দেখবার চেষ্টা করেছিল, এবং য়ুরোপীয়দের মতোই তাদের চেয়ে আপনাদের উচ্চাধিকার

কামনা করেছিল। অ্যান্ডরুজ এই অন্যায় ভেদবুদ্ধিকে সহ্য করতে পারেন নি— এই-সকল কারণে একদিন অ্যান্ডরুজকে সেখানকার ভারতীয়েরা শত্রু বলেই কল্পনা করেছিল।

আজকের দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত ঔদ্ধত্যে উদ্যত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা। কঠিন বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আসে যুগবিধাতার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই মূর্তি নিয়েছিল অ্যান্ডরুজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে-সম্বন্ধ সে তাদের স্বাজাত্য ও সাম্রাজ্যের অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের। সেই জালের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে মানুষ-ইংরেজ আপন ঔদার্য নিয়ে আমাদের নিকটে আসতে পদে পদে বাধা পায়, আমাদের সঙ্গে অহংকৃত দূরত্ব রক্ষা করা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার আড়ম্বরের আনুষঙ্গিকরূপে উত্তুঙ্গ হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশকে এই অমর্যাদার দুঃসহ ভার বহন করতে হয়েছে। সেই ইংরেজের মধ্য থেকে অ্যান্ডরুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব। তিনি আমাদের সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে বাস করতে এলেন এই পরাজয়-লাঞ্ছিত জাতির অন্তরঙ্গরূপে। এর মধ্যে লেশমাত্র ছিল না উচ্চমঞ্চ থেকে অভাগ্যদের অনুগ্রহ করার আত্মশ্লাঘা সম্ভোগে। এর থেকে অনুভব করেছি তাঁর স্বাভাবিক অতি দুর্লভ সর্বমানবিকতা। আমাদের দেশের কবি একদিন বলেছিলেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—

প্রয়োজন হলে এই কবিবচন আমরা আওড়িয়ে থাকি কিন্তু আমরা এই সত্যবাক্যকে অবজ্ঞা করবার জন্যে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সম্মার্জনীকে যে-রকম ব্যবহার করে থাকি এমন আর কোনো জাতি করে কি না সন্দেহ। এইজন্যে বিদ্রূপ সহ্য করেই আমাকে বলতে হয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণস্থলী স্থাপন করেছি। এইখানে আমি পেয়েছি সমুদ্রপার থেকে সত্যমানুষকে। তিনি এই আশ্রমে সমস্ত হৃদয় নিয়ে যোগ দিতে পেরেছেন মানুষকে সম্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম লাভ এবং সে-লাভ এখনো অক্ষয় হয়ে রইল। রাজনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অনেক বার অনেক স্থানে তিনি আপনার কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কখনো কখনো তার আলোড়নের দ্বারা আবিল করেছিলেন আমাদের আশ্রমের শান্ত বায়ুকে। কিন্তু তার ব্যর্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি, এবং রাষ্ট্রীয় মাদকতার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে বিপর্যস্ত হতে দেন নি। কেবলমাত্র তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য এবং সকল মানবের জন্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন— তাঁর মরদেহ ধূলিসাৎ হবার মুহূর্তে এই কথাটি আমি আশ্রমবাসীদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম।

৫।৪।৪০

প্রবাসী
বৈশাখ ১৩৪৭

# রাধাকিশোর মাণিক্য

ত্রিপুরা রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলেম আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এ রকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন, সেদিন এ কথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করত। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন।

সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি নূতন ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মনে ভাবলুম এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা হয় নি। কবি বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। অথচ সে সময়ে তিনি ঘোরতর বৈষয়িক দুর্যোগের দ্বারা দিবারাত্রি অভিভূত ছিলেন। তিনি আমাকে একদিনের জন্যও ভোলেন নি। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি এবং তাঁর স্নেহ কোনোদিন কুণ্ঠিত হয় নি। যদিচ রাজসান্নিধ্যের পরিবেশ নানা সন্দেহ বিরোধের দ্বারা কন্টকিত। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে ছিলেন পাছে আমাকে কোনো গোপন অসম্মান আঘাত করে। এমন-কি, তিনি আমাকে নিজে স্পষ্টই বলেছেন, আপনি আমার চারি দিকের পারিষদদের ব্যবহারের বাধা অতিক্রম করেও যেন আমার কাছে সুস্থ মনে আসতে পারেন, এই আমি কামনা করি। এ কারণে যে অল্পকাল তিনি বেঁচেছিলেন কোনো বাধাকেই আমি গণ্য করি নি। যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয়সংকুল ছিল, তার সঙ্গে কোনো রাজত্বগৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। সেই রাজবংশের সেই সম্মান মূর্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে বর্তমান মহারাজা অত্যাচারপীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে যে-রকম অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলা দেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে। এ বংশের সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব আজ পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠল এবং সেইদিনে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্বল, আমার ক্ষীণকণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবিজীবনের অন্তিম শুভ কামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহানৈঃশব্দ্যের মধ্যে শান্তিলাভ করুক।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪ মে, শান্তিনিকেতন
২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

# প্রমথ চৌধুরী

আমার এই নিভৃত কক্ষের মধ্যে সংবাদ এসে পৌঁছল যে প্রমথর জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ চলেছে— দেশের যশস্বীরা তাতে যোগ দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্তৃত্বপদ নেবার অধিকার স্বভাবতই আমারই ছিল। যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের

এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হই নি।

প্রমথর গল্পগুলিকে একত্র বার করা হচ্ছে এতে আমি বিশেষ আনন্দিত, কেননা, গল্পসাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে। বাংলা দেশে তাঁর গল্প সমাদর পেয়েছে, এই সংগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবে।

অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয় নি সেজন্য আমি বিস্ময় বোধ করেছি। আজ ক্রমশ যখন দেশের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর কীর্তির অবরোধ উন্মোচিত হল তখন আমি নিস্তেজ এবং জরার অন্তরালে তাঁর সঙ্গ থেকে দূরে পড়ে গেছি। তাই তাঁর সম্মাননাসভায় দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করতে পারলেম না। বাহির থেকে তার কোনো প্রয়োজন নেই অন্তরেই অভিনন্দনের আসন প্রসারিত করে রাখলুম, দলপুষ্টির জন্য নয় আমার মালা এতকাল একাকী তাঁর কাছে সর্বলোকের অগোচরে অর্পিত হয়েছে আজও একাকীই হবে। আজ বিরলেই না-হয় তাঁকে আশীর্বাদ করে বন্ধুকৃত্য সমাপন করে যাব।

[১৩৪০]

# অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে।

এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয়ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।

শান্তিনিকেতন
১৩ জুলাই ১৯৪১

# পরিশিষ্ট

## • কেশবচন্দ্র সেন

আজকার এই ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের সভায় সভাপতির কার্যের আমি একান্ত অযোগ্য। আজকার সভায় অনেক প্রবীণ ভক্তজন উপস্থিত, যাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মার সঙ্গী ছিলেন, যাঁহাদের ভক্তির সুরে সুর বাঁধিলে ভক্তের গুণগান ভালো শুনাইত; তাঁহাদের উপস্থিতিতে আমার এ কার্যভার গ্রহণ করা একান্তই অযোগ্যপাত্রে ভারার্পণ হইয়াছে। যেমন কখনো কখনো নৌকার মাঝি একজন দাঁড়িকে হাল দিয়া নিজে দাঁড় টানিতে থাকে, তেমনি আজ আমাকে সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছে। আমার নানা অযোগ্যতা সত্ত্বেও কেবল একটি কারণে আমি এ কার্যভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছি। পৃথিবীতে জনসমাজের পাপ দুর্গতি নাশের জন্য সাধু মহাত্মারা আসিয়া থাকেন। পরবর্তী সময়ের লোকেরা মনে করে যে আহা আমি যদি সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিতাম তবে সৌভাগ্যবান হইতাম। আমি এই ভক্তের সময়ে জন্মিয়াও তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারি নাই। তিনি যখন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হিন্দু আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, এবং আমার পিতৃগৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি সদ্যপ্রসূত শিশু। তার পর যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মসমাজে বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব। আমার মনে হইত, তিনি যে ধর্ম, যে সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের স্বদেশীয় নয়, বিদেশী। তাঁকে নিয়ে যখন খুব গোলমাল হচ্ছে তখন তাঁর প্রতি আমার একটি বিরোধভাব এসেছিল এটা আমার বেশ মনে আছে। আমারও মনে হয়েছিল তিনি যেন আমার দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। আর আজ দেখছি মহত্ত্বের প্রকাশ বিরোধভাবের মধ্যে দিয়েই হয়ে থাকে। স্বীকার করতে হবে আমার অন্তরের ভেতরে বিরোধভাবের সঞ্চার আমার বালককাল হতেই হয়েছিল। যেমন দেখা যায় ধোঁয়ার প্রাচুর্যবশত আগুনকে দেখা যায় না, আমি তেমনি তখন তাঁর তেজের কিছুই দেখতে পাই নি। যে-সকল মহাপুরুষ আমার জীবনকালের মধ্যেকার, তাঁদের চেনবার আমাদের অবকাশ হয় নি, সেই ভাগ্যহীনতার অবস্থা জীবনে ঘটেছিল এ কথা বলতেই হবে। যে মহাপুরুষের কীর্তি বলতে এসেছি তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল অথচ কী একটা কুহেলিকা এসেছিল যে তাঁর সঙ্গে সে যোগস্থাপন করতে পারি নি। আজ তাই তাঁর স্মৃতিসভায় তাঁর কাছে ভক্তি নিবেদন করতে এলাম। এজন্যই সভাপতি হওয়া। যাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন, তাঁদের কথা বহুমূল্য ও যথার্থ। সে মহাপুরুষের কিছু দান করতে আমার অধিকার নাই। আমার এমন কোনো সুযোগ হয় নাই যে আর কোনো দিন কোনোরকমে তাঁর প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে পারতাম, কারণ তাঁর বিষয়ে বলবার, তাঁর সময়কার বিষয় সকল শোনাবার মোটেই কোনো সুযোগ হবার সম্ভাবনা নাই, তাই আমি আজ সভাপতি হয়ে তাঁর প্রতি ভক্তি জানাতে সুযোগ নিলাম। তাঁর বিষয়ে যে তখন একটা বিরোধভাব আমার মনে এসেছিল তার একটা কারণও আছে। তখন আমার মনে হত বুঝি আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে, বুঝি সেই মহাপুরুষ সে গৌরবের কিছু ব্যাঘাত করেছেন, বিদেশী সত্যের মাহাত্ম্য বুঝি এত বড়ো করে প্রকাশ করেছেন, তাতে বুঝি আমাদের গৌরব খর্ব করেছেন। তখন বোল ছিল স্বদেশী। এই তখন দম্ভ, দর্প ছিল। একটা ধারণা ছিল আমার, সকলেরই হয়, যে যিনি যে দেশের মহাপুরুষ তিনি সে দেশের বাণী সকল বলতে বাধ্য। যখন কেউ স্বদেশের বাণী না বলে, বিদেশী কোনো মহাপুরুষের বাণী, জ্যোতিঃলাভের কথা বলেছেন তখনই সকলে মনে করেছে ইনি বুঝি বিরুদ্ধবাদী। এ হয়েই থাকে। আর তাঁরা আসেনই সেই সময় যখন আমাদের স্খলন হয়েছে, আমরা যখন ঘোর অন্ধকারে একেবারে তলিয়ে যাচ্ছি— তখনই তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন— তাই মানুষ বোঝে যেটা আমাদের লোকাচার, এখনকার ধর্ম, ইনি তার বিরুদ্ধে বলেছেন, সাধারণত

মানুষ এ কথাই মনে করে। সেই সময় বাইরের আবরণটাকে সরিয়ে ফেলতে চান যাঁরা, তাঁদের তখন বিরুদ্ধবাদী বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত পুরাতন ঋষিবাক্য উদ্ধার করবার জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এসেছিলেন। স্বাদেশিকতার গণ্ডির বাহিরে তাকে অনেকদিন ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু তা আর রইল না। আমরা ভারতবর্ষের লোক, আমরা সমুদ্রের এত কাছে জন্মগ্রহণ করেছি যে নৌকা একটুখানি নদীতে বেয়ে গেলেই সমুদ্রে গিয়ে পড়ি। তাই বুঝতে পারলাম কোনো মহাপুরুষ কেবলমাত্র জন্মাতে পারেন না আঘাত করতে। আমার সেটি মনে হল আমাদের দেশেতে অনেক বড়ো কথা ঋষিরা বলে গিয়েছেন তার মধ্যে সবচাইতে পুরাতন সেই দাঁড়িয়ে যে বলেছিলেন—

যোদেবাগ্নৌ যোহপ্‌সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যিনি সর্বত্র রয়েছেন, যিনি আকাশ বায়ু জলে রয়েছেন, যিনি ঔষধিপত্রপল্লবপূর্ণ বনস্পতিতে রয়েছেন তাঁকে নমস্কার করি।' কোনো একটা সংস্কারে হৃদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোনো একটা বিশেষ স্থানে আমাদের ভক্তি আসে। সকল স্থানে আসে না যখন তখনই বুঝতে পারি আমাদের সে শক্তি নাই। সেই সর্বশক্তিমানকে দূরে বলে মানুষ মনে করত। সেই যে মোহ কেটে গেল, তাতে কতখানি একটা চৈতন্য হয়েছে তখন যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারেন। এখন বিজ্ঞানের আলোকে দেখা যায় এক শক্তি সর্বত্র। তখন ঋষিরা দিব্যলোকে সর্বত্র সেই শক্তিকে অনুভব ক'রে সকলকে নমস্কার করলেন। সেইরকম আর-একটি জিনিস আছে, ইতিহাসে, জাতিতে, ধর্মে, আমরা কত অনৈক্য দেখতে পাই, কিন্তু সব মিলিয়ে একজন রয়েছেন এটা দেখতে বিশেষ চৈতন্য দরকার।

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকাযমব্রণমস্নাবিরং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোর্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

যিনি বিধাতা, তিনি বিধান করলেন— তিনি কবি— আনন্দে সমস্ত বিশ্বসংসারকে সৃষ্টি করলেন। তিনি মনীষী— মনকে তিনি শাসন করছেন। অব্যাহত তার কবিত্ব প্রকাশ হচ্ছে, তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর ঐশী-শক্তি প্রকাশ হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে। আমাদের ইচ্ছার উপর তাঁর ইচ্ছা জয়ী হচ্ছে তাই তিনি মনীষী। তিনি কবি ও মনীষী। তাঁর বিধান অনন্তকালের বিধান। সেই কথা যে মহাপুরুষ প্রকাশ করেছেন, সর্বোচ্চ বাণী তিনি জীবনের মধ্য দিয়ে নূতন করে প্রকাশ করেছেন। নববিধান পুরাতনকে নূতন ক'রে গ্রহণ ক'রে প্রকাশ করা। কোনো পুরাতন জিনিসকে নূতন করে যখন কেউ দেখতে চাইবে না, কখনো তাঁরা সে জিনিসে কিছু নূতন দেখতে পারেন না। প্রভাতকাল অতি পুরাতন, দিবা রাত্রি সূর্য চন্দ্র গ্রহমণ্ডল অতি পুরাতন, প্রত্যহ আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু কবি যখন একদিন প্রভাতকে নূতন ভাবে দেখতে পান, তখন তিনি মনে করেন, এ বুঝি কখনো আগে দেখেন নি, এমনটি বুঝি কেউ কখনো দেখে নি। ভারতবর্ষে যে সাধনা করে যে সত্যকে লাভ করেছে আমরা বলব তিনি তা ম্লান করতে দাঁড়িয়েছেন? আমরা বিরোধ দ্বারা কিছুতেই তাঁকে গ্রহণ করতে পারব না। আমরা অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি, সেই সত্যের বিদ্রোহ পতাকা আমরা তুলেছি, যিনি সে সত্যকে প্রচার করতে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে আমরা শত্রু বলে মনে করি! গুরুনানক, মহম্মদ প্রভৃতিকেও বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করেছি। আমাদের যেটুকু সাধনা সেটুকু নিয়েই আমরা নিজের ধর্মমন্দিরের মধ্যে, নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকি। তাতে আর কারোকে প্রবেশ করিতে দিই না, তা নিয়ে আর কোনো স্থানে যাই না। যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁকে সকল ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা এই কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা এবং তাই নূতন করে তিনি লাভ করে নূতন করে নববিধান বলে প্রকাশ

করেছেন। এ যখন বুঝলাম সে বিরোধ আমার ঘুচে গেল, আমি তাই আজ তাঁতে ভক্তি নিবেদন করতে এসেছি।

'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা
১ মাঘ ১৯৬৬ সংবৎ
১৩১৭ বঙ্গাব্দ

## রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণবাবুর গ্রন্থ ও জীবনী পড়িয়া তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহার কথা আমি বলিব না। শিশুকালে আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়িতে দেখিতাম। তখনই তাঁহার পক্ককেশ-গোঁপদাড়ি। তবু তিনি যেন শিশুভাবে আমাদের সহিত মিশিতেন।

তিনি যে অতি বড়ো লোক তখন আমরা তাহা বুঝিতাম না। এখনকার মতো তখন সংবাদপত্র, সভাসমিতি, সমালোচনা, প্রভৃতি ছিল না, সুতরাং মানুষ লোকচক্ষুর আড়ালে বাড়িতে পাইত। শকুনি যেমন শবদেহ লইয়া টানা-হেঁচড়া করে, এখন জীবিতদের লইয়া সংবাদপত্র সেইরূপ করে। রাজনারায়ণবাবুর আমলে 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি কাগজ ছিল বটে, তবে ওই-সকল কাগজ সংযত ছিল। অন্তত এখন যেমন কাগজে সত্যমিথ্যায় জোড়াতাড়া দিয়া এক-একটা লোকের সম্বন্ধে লেখা হয় তখন তেমন হইত না। তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার সুযোগ ছিল। এইরূপভাবে রাজনারায়ণবাবু মহৎ হইয়াছিলেন বলিয়া লোকের মধ্যে তিনি তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই। এমন-কি অমন মহৎ ব্যক্তির নামও হয়তো এইকালে অনেকে জানেন না।

রাজনারায়ণবাবু দিবারাত্র কার্য করিতেন। ভাঙাগড়ার এক বিশেষ যুগে তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সকল-প্রকার দেশের কার্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। আমার পূর্বে যাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহাদের মুখে আপনারা শুনিয়াছেন যে, স্বদেশী মেলা, এবং নানাপ্রকার সভার সহিত তাঁহার যোগ ছিল; কিন্তু তবু তাঁহার মুখে কোনো চাঞ্চল্য ছিল না।

জাপান-যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি, অতি ভীষণ ঝটিকার মধ্যে জাপানি জাহাজের কর্ণধার আমার সহিত তখনকার বায়ুর গতির বেগ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এত বড়ো প্রবল ঝড় সাধারণত হয় না। ওই ঝড় সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো চিন্তা ছিল না তাহা নহে; কিন্তু সকল কার্যের ব্যবস্থা, এমন-কি জাহাজ জলমগ্ন হইলে যাত্রীরা যাহা পরিয়া জলে ঝাঁপ দিবে, তাহার আয়োজন হইয়াছিল; তবু তিনি আমার সহিত গল্প করিতেছিলেন।

রাজনারায়ণবাবু তখনকার সেই প্রবল ভাঙাগড়ার যুগে সকল কার্যের মধ্যে থাকিয়াও আমার মতো বালকের সহিত মেলামেলা কর্তব্য মনে করিতেন। শিশুদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল।

ইহা যে তিনি কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে করিতেন তাহা নহে, ওই কর্তব্যবুদ্ধির পশ্চাতে তাঁহার একটা পরিপূর্ণ জীবন রহিয়াছে। কর্তব্যবুদ্ধি অনেক সময়ে সংকীর্ণভাবে কার্য করিয়া থাকে। রাজনারায়ণবাবুর কর্তব্যবুদ্ধি তেমন সংকীর্ণ নহে। তিনি আমার পিতার সকল কার্যের সঙ্গী ছিলেন; আমার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়ো, তিনি তাঁহার সুহৃদ ছিলেন; আবার আমার মতো শিশুরও তিনি বয়স্য ছিলেন। সকলের সহিত মিশিবার জন্য যেমন সরসতা দরকার তাহা তাঁহার ছিল।

উপর হইতে যে বারিবর্ষণ হয় উহাই পৃথিবীর সজীবতা রক্ষা করে তাহা নহে, পৃথিবীর ভিতরেও নিত্যপ্রবাহিত রসের ধারা আছে। কর্তব্যের চাপে নহে, আনন্দেই সংসারের সৃষ্টি হইতেছে। উপনিষদে আছে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অর্থাৎ আনন্দ হইতে জগৎ

সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনারায়ণবাবুর জীবনে এই আনন্দরসের প্রাচুর্য ছিল।

যাহাকে কিছু উৎপন্ন করিতে হয় তাহার নিজের পদতলের ভূমির উপর শ্রদ্ধা থাকা চাই। এই ভূমি বালুকাময়, এই ভূমি অসার, এইরূপ যিনি মনে করেন তাঁহার ভূমিকর্ষণ ও শস্যোৎপাদনে মনোযোগ হয় না।

এই দেশের প্রতি রাজনারায়ণবাবুর শ্রদ্ধা ছিল; শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি এই দেশের মঙ্গলের জন্য বিবিধ কার্য করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ের শিক্ষিতেরা দেশকে ভুলিয়া বিদেশী ইতিহাসকে উপাড়িয়া এই দেশে আনিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়াছিলেন ইতিহাসের রূপ দেশকে আশ্রয় করিয়া এক-এক স্থলে এক-এক ভাবে প্রকাশিত হয়। এইরূপ অনুসরণ করা যায় না। ইতিহাসের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে ওই সত্য সকল দেশেই এক।

রাজনারায়ণবাবুর বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। তিনি ডিরোজিয়োর শিষ্য, ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত, ওই ভাষাতেই চিরদিন ভাব প্রকাশে অভ্যস্ত। অথচ তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োগ করেন।

তিনি যখন এই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন, তখন এই সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন ইহার মধ্যে আকর্ষণের কিছু ছিল না। তাঁহাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইত— "এই ভাষায় কী আছে যে তুমি এই ভাষার সেবা করিবে?" উত্তরে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তো অমনভাবে দেখেন নাই। এই শিশুর সূতিকাগৃহে যখন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়াছিল তিনি সেই ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যতের গৌরববাণী নিঃসন্দেহ শুনিয়াছিলেন, তিনি শিশুর মুখমণ্ডলে ভবিষ্যতের গৌরবচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এইজন্যই তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের সেই শিশুকালেই ইহাকে যে আসন প্রদান করিয়াছিলেন এখনো বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই গৌরব দান করিতে চাহেন না। এইজন্য তিনি ওই সময়েই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান না করিলে বাঙালির উন্নতি হইতে পারে না ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতেন।

আমার তিনি বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮ বছরের সময় ইংলন্ড হইতে ফিরিয়া আমি ভারতীতে যাহা লিখিতাম, তাহা পাঠ করিয়া আমার লজ্জা হয়, তাহা এখনো ছাপার অক্ষরে আমার প্রতি চাহিয়া আমাকে লজ্জিত করে। রাজনারায়ণবাবু তাহা পরম আগ্রহে পড়িতেন, প্রত্যেকটি বাক্যের সমালোচনা করিয়া দেওঘর হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ পত্র পাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতাম।

ছোটো শিশুদের প্রতি রাজনারায়ণবাবুর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তাঁহারা অনেকে শিশুদের মধ্যে কেবল দোষই দেখেন, তাহাদের উপর কেবল অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণবাবু যখন পক্বকেশ বৃদ্ধ, তখন আমায় বয়স ৮ বছর; ওই বয়সে তিনি আমার বয়স্য ছিলেন, আমার সহিত তাঁহার মেলামেশার কোনো বাধা ছিল না। তাঁহার এই শিশুপ্রীতির মূলে অসীম বিশ্বাস ছিল। শিশুদের মধ্যে যে মহৎ পরিণাম আছে তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। জগতের একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন— "শিশুদের আমার নিকট আসিতে দাও।"

আমি যে এখন শিশু ও যুবকদিগকে ভালোবাসিতে পারি, ইহার মুলে দুই ব্যক্তি আছেন।

প্রথম আমার পিতা। তিনি কোনোদিন আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করেন নাই। তাঁহার সহিত আমার আলাপ-আলোচনা হাস্যপরিহাস সকলই চলিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। আমকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করিতেন।

দ্বিতীয় রাজনারায়ণবাবু। তিনি আমার সহিত সমবয়সীর মতো মিশিতেন।

আমাদের গৃহের দক্ষিণের কক্ষে দ্বিপ্রহর সময়ে তিনি শুইয়া থাকিতেন। তখন আমরা নির্ভয়ে ওই কক্ষে কোলাহল করিতাম। হয়তো তাঁহার সম্বন্ধে কত কথা বলিতাম। তিনি সময়ে সময়ে

চক্ষু মেলিয়া চাহিতেন। যেন বলিতেন, তোমরা ভাবিয়াছ আমি ঘুমাইয়া আছি, তাহা নহে, এই দেখো আমি দিব্য জাগিয়া আছি।

আমার সহিত সেই সময়ের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আনন্দস্মৃতি বহন করিয়া আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি এবং আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

প্রবাসী
কার্তিক ১৩২৪

# রামমোহন রায়

## ১

এ দেশে যে কীরূপে রাজা রামমোহনের জন্ম হইল, তাহা বুঝা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই, তিনি সেই অবস্থার বহু উচ্চে অবস্থিত। অরুণচ্ছটা যেমন নিম্নভূমি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকা কালেও উন্নত পর্বতশিখরকে অনুরঞ্জিত করে, সেইরূপ স্বর্গীয় আলোক তাঁহার উন্নত আত্মাকে আলোকিত করিয়াছিল— বিশ্বমানবের মুক্তির বাণী তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল। মানবজীবনে যেমন একটা সময় আছে, যখন তাহাকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই বর্ধিত হইতে হয়, বাহিরে গেলেই তাহার বিপদ, তেমনি মানবসমাজেও এরূপ শিশুকাল আছে। যে-সকল সমাজ সেরূপভাবে রক্ষিত ও বর্ধিত হইয়াছে তাহারাই আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু শিশুকাল অতিক্রান্ত হইলে যেমন তাহাকে বাহিরে বিশ্বজগতের মধ্যে যাইতে হয়, তাহা না হইলে তাহার উন্নতি ও বিকাশ হইতে পারে না, তেমনি যে সমাজ চিরকাল আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে, বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তাহারও উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠে। ভারতকে বিশ্ব- মানবের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই রামমোহন আসিয়াছিলেন। শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্বমানবের জন্য মুক্তির বাণী লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র আদর্শ, সমগ্র দৃষ্টি, সমগ্র ভবিষ্যৎ আপনার মধ্যে ধরিয়াছেন। চারিদিকের অন্ধকার মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়াছেন—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

'এই অন্ধকারের পরপারস্থিত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি।' সেই মহান পুরুষকে জানিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভুমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'— ভূমাতেই সুখ, ক্ষুদ্রে সুখ নাই। আমরা ক্ষুদ্র লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি না। ক্ষুদ্র দেশে আবদ্ধ থাকিলে হইবে না। দেশকে বিশ্বের অন্তর্গত করিয়া ভালোবাসিতে হইবে। সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। রামমোহন যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন সে-শস্য আমরা কর্তন করিব। আমরা অনেক সময় দুঃখ করি, আমাদের উপযুক্ত নেতা নাই। রামমোহনই আমাদের নেতা, আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলি, তাঁহার বাণী শুনিয়া চলি। আমরা ক্ষুদ্রে ডুবিয়া থাকিতে পারি না। মহান ব্রহ্ম আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়দ্বারে অতিথিরূপে উপস্থিত। এই অতিথিকে স্থান দিতে হইবে। প্রত্যাখ্যান করিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। আমরা কেহ ছোটো নই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যাহারা বড়ো তাহারাও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অহংকারী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, আর যে ছোটো সে বড়ো হইয়াছে। ইতিহাসে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ রহিয়াছে। আমরাও ছোটো নই, ছোটো থাকিব না। সেই মহাবাণী শুনিয়া চলি, সেই নেতার অধীন হইয়া চলি, আমরাও বড়ো হইয়া উঠিব, এ দেশ বড়ো হইয়া উঠিবে।

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা, আশ্বিন? ১৩২৪ বঙ্গাব্দ
পুনর্মুদ্রণ, 'প্রবাসী' কার্তিক ১৩২৪

# রামমোহন রায়

## ২

শিশু মায়ের কোলে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক জাতি তেমনি আপন আপন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাড়িয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি ও পরিণতির প্রয়োজন আছে। এক সময়ে পৃথিবীর সকল জাতি এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বৃদ্ধিই চরম বৃদ্ধি নহে। সকল জাতিকেই বিশ্বের মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য জোগাইতে হইবে।

আপনারা শুনিয়াছেন যে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে রামমোহন জন্মলাভ করেন। ওই বিপ্লবের যুগে যে বিশ্ববাণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া শিশু রামমোহনের প্রাণ স্পর্শ করে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

উষার অরুণরশ্মি যেমন উচ্চ শিখরগুলিকে আলোকমণ্ডিত করে, তেমনি সেই যুগে পৃথিবীর কতিপয় মহাত্মা বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। শিখরে যখন প্রথম আলোকসম্পাত হয় তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে। বঙ্গভূমি যখন নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন বালক রামমোহন অলৌকিক রূপে বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে দেশ অনুকূল ছিল না, বরং সমস্তই তাঁহার প্রতিকূলে ছিল। তিনি যেন দৈবশক্তিবলে এই জ্ঞান লাভ করিলেন।

বঙ্গদেশের এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে কেমন করিয়া বিশ্ববোধ লাভ করিলেন তাহা বিস্ময়কর। তিনিই এই দেশে তখন ভূমার বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সেই অন্ধকারের পরপারের মহান্ পুরুষকে তিনি জানিয়াছিলেন। অন্ধকারের পরপার হইতে জ্যোতির্ময় পুরুষের আলোক আসিয়া এই শিখরের উপর পতিত হইয়াছিল।

পৃথিবীর কোনো জাতি এখন আপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিবে না। উহাতে যে হীন দেশাত্মবোধ জাগাইয়া থাকে তাহা হইতেই হানাহানি-মারামারির সৃষ্টি হয়। এখন প্রত্যেক দেশকে আপন গৃহবাতায়ন খুলিয়া দিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ছোটো হইয়া থাকায় সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ।

ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।

পৃথিবীর কোনো জাতি হীনতার মধ্যে চিরকাল থাকিবে না। বাঙালির নিরাশার কারণ নাই। বাঙালির গৃহে রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙালির ভবিষ্যৎ গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাঁহারা মহৎ তাঁহারা অগৌরবের মধ্যে গৌরবকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে প্রত্যক্ষ করেন। এখন পৃথিবীতে যে রণকোলাহল চলিতেছে ইহারই মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃসংঘের ছবি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তখন জাতিতে জাতিতে কীরূপ মৈত্রী স্থাপিত হইবে তাহার আলোচনা চলিতেছে।

বঙ্গের ভবিষ্যৎ গৌরব তখনকার গভীর অন্ধকারের মধ্যেই রামমোহন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙালিকে বিশ্বের রাজপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙালির কোনো নিরাশার কোনো আশঙ্কার কারণ নাই, বাঙালি বৃহৎ মনুষ্যত্বের পথে যাত্রা করিয়াছেন।

'সঞ্জীবনী' পত্রিকা
কার্তিক ১৩২৪

# • রামমোহন রায়

## ৩

রামমোহন রায় ভারতবর্ষে নবযুগের উদ্‌বোধন করেন। যে যুগে আমাদের দেশ তাহার আত্মার সহিত মহান সত্যের যোগসূত্র হারাইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাসত্বে, বিচারহীনতার দুঃসহ ভারে পিষ্ট হইতেছিল, সেই যুগে রামমোহন আবির্ভূত হন। সামাজিক অনুষ্ঠানে, রাজনীতিতে, ধর্ম ও শিল্পকলায় আমরা সৃষ্টি-ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এবং জীবন্ত মানুষের ধর্ম বিস্মৃত হইয়া গতাসু ঐতিহ্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। অধঃপতিত ভারতের এই তামসযুগে সত্যদর্শীর দৃষ্টি লইয়া অপরাজেয় আত্মিক বল লইয়া রামমোহন ভারতের আকাশে দ্যুতিমান জ্যোতিষ্করূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার ভাস্বর বিভায় সমগ্র দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আত্মবিস্মৃতির দৈন্য হইতে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক শক্তিতে, তাঁহার আত্মার দুঃসাহসিক তেজস্বিতায় আমাদের জাতীয় সভা সৃষ্টিপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইল, আমরা আত্মানুভূতির দুর্গম পথে পদার্পণ করিলাম। তিনি বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক— প্রতি পদবিক্ষেপে যে অলঙ্ঘনীয় বিঘ্ন আমাদের পথরোধ করিতেছিল, তিনিই তাহা উচ্ছেদ করিয়া আমাদিগকে বর্তমান যুগের বিশ্বজনীন সহযোগিতায় দীক্ষা দান করিয়াছেন।

শাশ্বত মানবতার বাণী লইয়া যে-সকল আত্মদর্শী যুগঋষি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন, রামমোহন তাঁহাদেরই অন্যতম যুগাচার্য। মনুষ্যত্বের সাধনাপথে ঈশ্বরের অনুভূতি এবং দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষ-সভ্যতার প্রত্যেকটি সনাতন সত্যের উপলব্ধি ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে যে বিভিন্ন মনুষ্য সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, উহাদের বৈচিত্র্যে সমন্বয় সাধন করিয়া উহাদের পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতিকে একটি সুসামঞ্জস্য রূপ দান মানবেতিহাসের আদিম অধ্যায় হইতেই ভারতের গৌরবও বটে আবার ভারতের সমস্যাও বটে। মানবসভ্যতার আদিম যুগেই যে ভারতবর্ষ এই সমস্যা সমাধানের বিপুল প্রয়াসে বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সমাজের উদার বক্ষে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, জটিল জাতিবিভাগ -সংবলিত আমাদের বিশাল সমাজ-দেহই তাহার প্রমাণ। কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি রামমোহনের পূর্ববর্তী সাধু ও ঋষিগণ জাতি ও পঙ্‌ক্তির গণ্ডি ভাঙিয়া সমন্বয় প্রয়াসে আরও বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সামাজিক ও ধর্মগত সংকীর্ণতা চূর্ণ করিয়া তাঁহারা বাস্তব ধর্মের ঐক্যবন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐক্য প্রতিষ্ঠার আকুল আগ্রহে আজ আমাদের সমাজের বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি আপনা হইতেই বিলীন হইতেছে, জাতিভেদ এবং ধর্মের কঠোর বিধি-নিষেধ আজ আর স্বজাতিবোধের পরিপন্থী নহে, শতধা বিচ্ছিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের প্রেরণায় ভারতের সর্বত্র আজ এক অপূর্ব আত্মসম্বিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; আজ স্মরণ রাখিতে হইবে লোকোত্তর ঐক্যসাধক রামমোহনের অদম্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবেই ভারতের পৌরুষশক্তি তাহার শৃঙ্খল মোচন করিতে পারিয়াছে ভারতের চিরন্তন মহাসত্যোপলব্ধির পথ— প্রত্যেক মানুষের অন্তরশায়ী সর্বজাতির ঐক্যসাধক পরমপুরুষের অনুধ্যানে মনুষ্যমাত্রেরই সমানাধিকারের পথ রামমোহনই প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহনের যুগে সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই আধুনিক যুগের প্রকৃতার্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ স্বাধীনতা মানবসাধনার উদ্দেশ্য নহে, বরং ব্যক্তিত্বের এবং রাষ্ট্রে সর্বজনীন পারস্পরিক নির্ভরতা সৌভ্রাত্রেই মানবসভ্যতার চরিতার্থতা। অপরিসীম গভীর জ্ঞান এবং সহজাত আত্মদৃষ্টি সহকারে তিনি মানবতার এই আদর্শ সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্র এবং ধর্মজগতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, কদাপি বস্তুতান্ত্রিক গণ্ডিকে স্বীকার করেন নাই— কদাপি জাগতিক মোহের আকর্ষণে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হন নাই। ভারতের

জনগণকে তাহাদের আত্মোপলব্ধির সমুন্নত বেদির উপর প্রতিষ্ঠা করা, তাহাদের সভ্যতার তুলনাহীন সত্যরূপ উদ্ঘাটিত করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতার সহিত তাহাদিগকে উদার সহযোগিতায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলা রামমোহনের জীবনের সাধনা ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ও ধর্মের সীমাহীন সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, এবং ভারতের বিস্মৃত ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা- কল্পে সমগ্র জীবনের অনলস সাধনায় নিশ্চল ঊষর জীবনের ব্যর্থতা প্রমাণ করিয়াছেন : সামাজিক মতবাদে তিনি ছিলেন মানবজাতির সহযোগিতায় বিশ্বাসী— সামাজিক অবিচার ও কু-সংস্কারের নির্মম শত্রু, কিন্তু ভারতের ও বহির্দেশের সমস্ত সংস্কারকগণের দরদী সহযোগী। সংস্কৃত ভাষায় তিনি মহা বিজ্ঞ ছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ভাষা হইতেও শব্দ এবং ভাব বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন।

আজিকার শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা যেন এই মহাপুরুষের বহুমুখী প্রতিভা এবং বহুমুখী সাধনার মর্ম উপলব্ধি করি এবং আমাদের সমসাময়িক মানবজাতির মধ্যে প্রচার করি। রামমোহন তাঁহার যুগে নির্যাতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নির্যাতন হইতেই আধুনিক যুগে তাঁহার মৃত্যুহীন প্রভাব মঙ্গলময় প্রচেষ্টায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আজ এই জাতিগঠনের যুগেও যদি আমরা তাঁহার আদর্শ উপেক্ষা করিয়া— যে-সকল প্রথা ও সংস্কার মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই-সকল প্রথা ও সংস্কার যদি আমরা সবলে উচ্ছেদ না করি, তবে ইতিহাসে চিরকাল আমরা নিন্দাভাজন হইয়া থাকিব; আমাদের অক্ষমতাই রামমোহনের মহত্ত্বের মাপকাঠি হইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৭ ফাল্গুন, ১৩৩৯

# রামমোহন রায়

## ৪

রামমোহন রায় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সে এক অতি অগৌরবময় অধ্যায়। দেশের চারি দিকে তখন কুসংস্কার, ধ্বংসপ্রবণতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। যুক্তিহীনতা সত্য ও প্রেমের আলো আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া যাই যে, ভারতের ইতিহাসের এই সর্বাপেক্ষা অবনতির কালে কী করিয়া রাজা রামমোহনের মতো এমন একজন অসাধারণ মানুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

আজ পর্যন্ত ভারতে অমিল ও অনৈক্যের দৃষ্টান্ত বর্তমান। ইহা ভারতের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। ভবিষ্যদ্রষ্টার দূরদৃষ্টিসহকারে তিনি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লইয়া সজোরে এই-সকল কুসংস্কার প্রভৃতির মূলে আঘাত করিয়াছিলেন এবং হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টানগণের সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের মধ্যে সমন্বয়ের পথনির্দেশ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ভারতের নবযুগের প্রবর্তক। যে-সকল ঋষি যুগ যুগ ধরিয়া ভারতকে নব প্রেরণা ও বল জোগাইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কুসংস্কারের অন্ধ তমসা দূরীকরণে তিনি আপন শক্তি নিয়োজিত করেন। তিনি শুধু মানবে মানবে নহে, জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং এই বোধই তাঁহাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মৈত্রীসাধনে সচেষ্ট করিয়াছিল।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রামমোহন রায়কে নমস্কার।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৩ আশ্বিন, ১৩৪৩

# • বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## ১

আমি আজকে এই সভাতে আসবার জন্য আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলুম। আপনারা অনেকে জানেন, আমি স্বভাবত সভাভীরু লোক; পারতপক্ষে সভায় যেতে স্বীকার করি না। এখন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ক্ষীণ হয়েছে; যেটুকু বাকি আছে, মনে করি সেটুকুর আর অপব্যয় করব না। এইজন্যই সাধারণ সভায় যাওয়া বন্ধ করেছি। আমি তাঁহার আহ্বান দ্বিধার সহিত স্বীকার করেছি। তবে এবার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে যখন সম্মিলন হয়েছে, তখন তাঁহার প্রতি যদি আমার সম্মান-অর্ঘ্য দিতে পারি, তার জন্য এসেছি। শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে পূর্বেই অভয় দিয়েছিলেন যে, আমাকে বক্তৃতা করতে দিবেন না; কাজে কিন্তু তাহা হল না। আমার যা শিক্ষা হল ভবিষ্যতে স্মরণ করব।

আমি কী আর বলব। আমি অপ্রস্তুত, অনেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। অনেকে বলেছেন, অনেকে বলবেন। তবে এখানে সভ্য যাঁরা আছেন, তাঁদের চাইতে আমার অধিকার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশে বাংলা সাাহিত্যে ও ভাষায় নূতন প্রাণের ধারা দিয়েছিলেন। যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রথম বাহির হয়েছিল, তখন অমি যুবা বা তার চাইতেও কম বয়সের; আমি প্রাণের সেই স্বাদ পেয়েছিলুম। বাংলা ভাষা এখন অনেক পরিপূর্ণ; তখন নিতান্ত অল্পপরিসর ছিল। একলাই তিনি একশো ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, নভেল, সমালোচনা, কথা প্রভৃতি সকল দিকেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যে কত বড়ো কৃতিত্ব, এখন ভালো করে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। বাংলা ভাষা পূর্বে বড়ো নিস্তেজ ছিল; তিনি একাই একে সতেজ করে গড়ে তুলেছিলেন।

আগে আগে 'জয়দেব' প্রভৃতির এবং 'বেণীসংহারে'র ছাঁদে সংস্কৃত ভাষারই বিস্তার হয়েছিল। সর্বভারতে ভাব দান করতে হলে গ্রাম্য বা প্রাদেশিক ভাষা চলে না, এই বিশ্বাসে প্রাদেশিক বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে তখন সকলে ভাব দানাদান করতেন। ভাবসম্পদ দিতে গেলেই তাঁহারা তখন সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়ে যেতেন। কিন্তু এই বাংলা ভাষা তখন গ্রামের পরিধিকে অতিক্রম করে নাই; গ্রামের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। বাংলা ভাষার প্রতি লোকের সেকালে সে পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রদ্ধা না থাকিলেই দুর্ঘটনা, দৈন্য; তখন তাহাই হয়েছিল। আমরা আমাদের ভাষা দ্বারা যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে না পারি, তবে নিজকে বিলুপ্ত করে থাকতে হয়। যতদিন সেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ না হয়েছিল, ততদিন আপনার উপলব্ধি কী [?] পরের কাছে পরিচয় দিতে পারি নাই। এখন আমরা তাহা বুঝি না, কিন্তু কী পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে তাহা হয়েছিল— কী প্রতিভার বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেছিলেন, এখন তাহার কল্পনা করা যায় না। সেই প্রথম দিনে তিনি একলা ছিলেন; পরে আরও দু-চার জন হয়েছিলেন। ভাষার শুচিতার জন্য তাঁহারা কী করেছিলেন সে ইতিহাস এখন বিলুপ্ত। বিরুদ্ধতা ও বিদ্রূপ কত হয়েছিল, তিনি ভ্রূপেক্ষও করেন নাই। একাই সব্যসাচী ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নানা রূপে বিচিত্র ভাবে গড়ে তুলেছিলেন— এটা কম আশ্চর্য নহে। আমরা তাঁহার দ্বারা কত উপকৃত, তাহা বলে শেষ করা যায় না। আধুনিক যুগের যা-কিছু বাণী, সমস্ত আমাদের ভাষায় প্রকাশ করা বড়ো সাহস। তখন লোকে তাহা মনেই করতে পারত না। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস যে বাংলায় হয়, এটা তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল; কাজেই তখনকার কবিতাও ইংরেজিতে হইত। বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি তখন এইভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল— বঙ্কিমচন্দ্র সেই জাতীয় ধ্বংসের প্রতিরোধ করেন। তাঁর সেই কাজটা কত বড়ো, আপনারা ভেবে দেখবেন।

তিনি ভাষার প্রথম বন্ধন মোচন করেন এবং ভগীরথের মতো বহু দূর পর্যন্ত ভাগীরথীর প্রবাহ প্রবাহিত করেন। তাঁহারই কৃপায় আমরা আজ এই বর্তমান আকারের ভাষা পেয়েছি।

আমি ভাষার জন্য নিজেও যেটুকু চেষ্টা করেছি, তাও তাঁহারই কৃপায়। আমি যে আজ এসেছি তাহার কারণ, আমার সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা আজ সকলের সম্মুখে জানালাম। আমি যে তাঁহার কাছে কত ঋণী তাহা স্বীকার করলাম। তিনি যে অস্ত্র ও উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন তাহা বড়ো কম-জোর ছিল; তখনও ভাষায় শক্তিসঞ্চার হয় নাই। তিনি তখন সেই দুর্বল উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেইগুলিকে তিনি খুব বুঝে-সুজে প্রয়োগ করেছিলেন। পথ ও রথ তৈয়ারি করার মতো তাঁহাকে কত খাটতে হয়েছিল। সেইজন্য তাঁহাকে প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করতে হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যাহ্নগগনে আজ তিনি থাকলে অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা সকলকে লজ্জা দিতে পারতেন। কিন্তু সেই প্রভাতগগনে তিনি যে সাহিত্যের প্রাণ এনেছিলেন। প্রাণশক্তি বড়ো কম শক্তি নয়; তিনি ভাষাতে সেই শক্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ভাষায় ভাবের কাঠামোও ছিল এক, ধারাও ছিল এক— যেমন নাটক লেখা হলে সব 'বিজয়-বসন্তে'র ছাঁদে... তিনি সেই ভাষায় সেই ভাবে বৈচিত্র্য এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈচিত্র্য নানা ভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রাণসঞ্চারের পরেই নানা প্রকার রূপসৃষ্টি— আনন্দরূপ সৃষ্টি হয়। তিনি তখন ভাষার সেই প্রাণে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যখন শুয়ে থাকি, ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সবাই প্রায় এক— জাগলেই বৈচিত্র্যের প্রভেদ হয়। আমাদের ভাষায় প্রাণের নূতন জাগরণে পূর্বের একরকমের একঘেয়ের আর আবৃত্তি নাই। সকলেই সজাগ হয়ে [ভাষা] প্রয়োগ করতে পাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রই এই নূতন প্রাণের জাগরণ দিয়েছেন। প্রাণ ছোটো হয়ে আসে, পরে বাড়ে। তখন এই প্রাণের এই জাগরণের আয়তনের— আকার ছোটো ছিল, এখন সেই প্রাণবীজ বড়ো হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই তাঁহার প্রতি আজ আমাদের এই নমস্কার-নিবেদন। ভাষায় প্রাণ সকলের চাইতে বড়ো; জাতির প্রাণ অপেক্ষা ভাষার প্রাণ বেশি বড়ো; কাজেই সেই প্রাণদানকারীকে আজ আমাদের সকলের নমস্কার।

কার্য-বিবরণী পুস্তক

বঙ্গীয় চতুর্দশ সাহিত্য-সম্মিলন : ৮ আষাঢ় ১৩৩০

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## ২

বঙ্কিমের জন্য তোমরা যে শোক করছ, তার কি সবটা খাটে? তোমরা তাঁর মহত্ত্বের কি টের পেয়েছ? হয়তো তাঁর গভীর পুস্তকগুলি কিছুই পড় নি। কোনোটাই ভালো করে পড়েছ কি না সন্দেহ। যে পরিপ্রেক্ষার (Perspective) মধ্যে তাঁকে বোঝা যেতে পারত তা তো এখন দুর্লভ। তোমরা তাঁকে ঠিক করে বুঝবে কেমন করে? যদিও তখন আমরা অল্পবয়স্ক ছিলাম, তবু তাঁর মহত্ত্ব কতক পরিমাণে জানি আমরা।

ভাষা কী ছিল, তাঁর হাতে পড়ে কী হল? তাঁর বঙ্গদর্শনকে এখনকার মাপকাঠিতে দেখলে চলবে না। তখন তা এক অপরূপ সৃষ্টি। প্রতি মাসে এলে বাড়িতে কাড়াকাড়ি। গুরুজনদের কাছ থেকে আমরা পাই কেমন করে?

কী ভাষা নিয়ে বঙ্কিম আরম্ভ করলেন আর কী করে রেখে গেলেন?

তাঁর গুরু ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা তো এ নয়। তাঁর সময়কার রুচি ও দৃষ্টি তাঁর লেখার কোথাও ধরা পড়ে না। তিনি (Pioneer) যাত্রীদলের অগ্রদূত। নূতন পন্থা রচনায় সৃজনের দুঃসহ দুঃখ তাঁর। তাঁর দুঃখ তোমরা এখন বুঝবে কী করে? তখন বাংলা ছিল সংস্কৃতের দাসী। গরুড়ের মতো তিনি বিনতার দাস্য মোচন করলেন। দাসীবৃত্তি ছাড়লেও যে তার নিজস্ব ঐশ্বর্য তার অন্তরের মধ্যেই নিহিত আছে তা বঙ্কিম দেখিয়ে দিলেন।

বাংলা ভাষাকে তিনি এমন করে রেখে গেলেন যে তা সর্বসাধনা ও ঐশ্বর্যের আধার হতে পারে। নিজে যে সব ঐশ্বর্য আহরণ করে তাতে রেখে দেখলেন যে বাংলা কী অপূর্ব আধার হয়েছে। তাই তো আমরা তাতে আমাদের যা-কিছু সাধনা তা রাখতে পেরেছি।

বাংলা ভাষার উপর এই অটুট বিশ্বাস তাঁর ছিল। যাঁদের এই বিশ্বাস ছিল না সেই সব ক্ষুদ্র-প্রাণ অবিশ্বাসীদের কাছে তিনি প্রকাশ্য গুপ্ত কত আঘাতই নিত্যনিরন্তর পেয়েছেন। ক্ষতবিক্ষত তাঁকে করেছে। কিন্তু বীরপুরুষ তিনি তা গ্রাহ্যই করেন নি।

আজ আর নূতন করে কী বলব? তাঁর মৃত্যুর পরেই ১৮৯৪ সাালের প্রথম স্মৃতি-সভায় আমার সব কথা নিঃশেষে বলেছি। তখন অন্তর সদ্য আঘাতের ব্যথায় ভরা ছিল। এখন সেইসব কথা সহজে কি আর আসবে?

খুব রাসভারি লোক ছিলেন তিনি। যাকে ইংরেজিতে cultural aristocracy বলে তা তাঁর ছিল। সেই স্তব্ধ মহান সাধক ছিলেন হিমালয়ের মহা শিখরের মতো নিঃসঙ্গ গম্ভীর। কেউ তাঁর কাছে ঘেঁসতে পারতেন না।

আমি তখন ছেলেমানুষ। অত বুঝতামও না, মানতামও না। আমি হামেশা তাঁর কাছে গিয়েছি। পটলডাঙার কাছে তাঁর বাড়িতে তিনি থাকতেন। চুঁচড়োয় থাকতেও তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। একেবারে নির্জন ছিল তার পরিবেশ।

তাঁর মধ্যে এমন কী একটা ছিল যে, কেউ তাঁর কাছে ঘেঁসতে সাহস করত না। তাতে হিংসা হয়। আমরা কখনো এই সৌভাগ্যের আস্বাদ জানি না। আহূত অনাহূত রবাহূত নানা রকমের লোকের নিত্য আনাগোনায় আমাদের সাহিত্য সাধনা ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ছেলেমানুষ হলেও বঙ্কিম আমাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর কাছে যথেষ্ট প্রীতি ও স্নেহ পেয়েছি।

তাঁর দাদা সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন মজলিসী মানুষ। একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। মাটিতে তাকিয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে বিশাল দেহটি নিয়ে তিনি বিরাজ করতেন। আমাদের দেখলে আনন্দে হাস্যে-স্নেহে-আদরে সর্বভাবে স্বাগত করতেন।

তাঁরও প্রতিভা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তাঁর মধ্যে গিন্নীপনা ছিল না বলে তিনি তাঁর শক্তির অনুরূপ সম্পদ রেখে যেতে পারেন নি।

বঙ্কিম ছিলেন অন্যরূপ। তিনি ঋজু, অল্পবাক্, দুরারাধ্য, শুদ্ধ সাধক।

তিনি সাধকই বটে। তাঁর সাধনালব্ধ যে চিন্ময় আধারটি তিনি দিয়ে গেলেন, তাহাই ক্রমে বাঙালির নব ইতিহাস সৃজনের মূল কাব্য হল। সেই দিক থেকে এই যোগ্যপাত্রে দেশ-বিদেশের কত ঐশ্বর্য যে সংগৃহীত ও সঞ্চিত হতে শুরু করেছে, তা আর শেষ করা যায় না। নানা দেশের ও কালের সম্পদ তাতে তিনি সঞ্চয় করে দেখালেন। ভরসা পেয়ে অন্যেরাও তাতে তাঁদের অর্ঘ্য রাখতে শুরু করেন। যে ভাষা অবজ্ঞার আবর্জনার আঁস্তাকুড় ছিল, তা হল শ্রদ্ধাবান যজমানের অর্ঘ্যের আধার পবিত্র যজ্ঞভূমি। এত বড়ো দান আর নেই। আমরা নিজেরা সারা জীবনের সকল সঞ্চয় তাতে রাখতে পেরেছি বলে জানি কী অসামান্য অধিকার ও সম্পদ তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রসাদেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সকল স্থান কাল হতে সকল সম্পদ আহরণ করে ও অন্তরের সব চিন্ময় ভাণ্ডার উজাড় করে তাতে রাখতে পেরেছি।

তাঁর যজ্ঞবেদিটি তিনি প্রজ্বলিত করে গেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্ময় সম্পদ তাতে তিনি অর্ঘ্য দিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষায় সেই যজ্ঞবেদিটিকে যদি তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের সারাজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখ, তবেই বঙ্কিমের যথার্থ শ্রাদ্ধ হবে। নহিলে স্মৃতি-সভার যত কিছু আয়োজন ও সমারোহ সবই দুঃসহ বিড়ম্বনা। তাতে তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা তাঁর চিন্ময় লোক হতে প্রতি দিন পীড়িতই হবে।

একটা কথা বলে শেষ করি। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' গানে আমিই প্রথমে সুর দিয়ে তাঁকে

শুনাই। সবটা অমি গান করি নাই। যতটা আমি সুর দিয়েছিলাম ততটা তাঁকে শুনিয়েছি। তিনি তাতে খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৪ শ্রাবণ ১৩৪৫
'সাহিত্যিকা' ১৩৪৫

# মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

## ১

মহাত্মাজী যখন দুই বৎসর পূর্বে এই আমেদাবাদে আপনাদের সহিত বাস করিতেছিলেন, তখন আমি একবার এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম। তদবধি দিনের পর দিন ধরিয়া আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম যে, কবে আবার মহাত্মার পদরজঃপূত আশ্রম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। এতদিনে আমার বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে দেখিয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। আজ মহাত্মাজী আপনাদের মধ্যে নাই, আপনারা তাঁহার অনুপস্থিতির অভাব বৃশ্চিকদংশনের মতো অনুভব করিতেছেন ইহা জানি এবং তাহা জানি বলিয়াই আমি সংক্ষেপে দু-চার কথা বলিব।

আপনারা সকলে এই আশ্রমে স্বার্থবলিদান করিয়া বাস করিতেছেন। আপনারা 'সত্য' কী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রবৃত্তিতে মানুষকে পশু করিয়া তোলে, নিবৃত্তিই দেবত্ব গঠনের সহায়ক, এই 'সত্য' আপনারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন।

ত্যাগ কাহাকে বলে? ত্যাগের অর্থ এই যে, মানুষের দেহটাই প্রকৃত জীবন নহে, আত্মাই প্রকৃত জীবন। পশুর সহিত এই যে পার্থিব জীবন আমরা যাপন করি, এই জড় জগৎই কেবল জগৎ নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরও উচ্চতর যে জীবন লুক্কায়িত আছে, সেই জীবনের জন্য আরও উচ্চতর জগতের প্রয়োজন। আমাদের সেই লুক্কায়িত জীবন অবিনশ্বর— অমর, অক্ষয় ও অব্যয়। যে ব্যক্তি এই জড়জগতের স্বার্থকে জয় করিতে পারিয়াছে কেবল সেই-ই সেই অমর জীবন উপভোগ করিতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে 'দ্বিজ' হইতে হইবে, একবার দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সত্যের আলোক লইয়া অমর জীবনের সন্ধান পাইয়া নূতন জন্ম লাভ করিতে হইবে। যাহারা আপনার মধ্যে অসীমকে উপভোগ করিতে পারে তাহারাই অমর হয়। তাহারাই জানে যে, জীবনের কখনো ধ্বংস হয় না। মুরগির ছানা যেমন ডিম ভাঙিয়া আলোক আনে, মানুষ তেমনি আলোকে আনিতে পারে— যদি সে স্বার্থের ডিম্ব ভাঙিতে পারে— মানুষ যতদিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই জড় জগৎই চরম জগৎ নহে, সেইদিন হইতেই মানুষ এই শৃঙ্খল ভাঙিয়া নূতন জগতের সন্ধানে ফিরিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই এই অমর জগতে লোককে লইবার জন্য নানাভাবে আলোক প্রদর্শন করিতেছে। সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য কিন্তু অমর জগতের সন্ধান দেওয়া। সকল ধর্মই বলে ত্যাগের দ্বারা সেই অমর জগতে পৌঁছানো যায়। ত্যাগ যদি সত্য সত্য অবলম্বন করা হয় তবে তাহা অমর জগতে মানুষকে লইয়া যায়। এই ত্যাগ অবলম্বন করিতে গেলে কঠোর তপস্যা চাই। এই আশ্রমে আপনারা সেই তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। আপনারা নিশ্চয়ই অমৃতলোকের অধিকারী হইবেন।

মহাত্মাজী আজ আপনাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মা আপনাদের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। মহাত্মাজী আত্মাকে বিশুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এই আত্মশুদ্ধিতেই আপনাদের মুক্তি নিহিত। মহাত্মাজীর বাণী শুধু আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ নাই, তাহা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত

হইয়াছে। অতএব মহাত্মাকে 'বিশ্বকর্মা' বলা যাইতে পারে। তিনিই অসীম, তাঁহার জ্যোতিঃ আজ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রতি বিশ্বমানবের হৃদয়ে মহাত্মার জন্য রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে অসীমময়, সে অসীমকে পায়। উপনিষদের ইহাই বাণী। তাঁহাকে মনে ও বাক্যে জানিতে পারিলে বিশ্বকর্মাকে জানা হয়। জীবনটিকে বিশ্বের হিতের জন্য উৎসর্গ করিতে পারিলে সেই বিশ্ববন্ধুকে ধরা যায়। আপনাদের আশ্রমশিক্ষাও এই আলোকদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মা স্বয়ং ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্যাগের দ্বারাই সৃষ্টি হয়— কখনো ধ্বংস হয় না। আমরা এই সত্যটুকু হৃদয়ংগম করিতে পারিলে মহাত্মার হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় এক যোগসূত্রে বাঁধিতে পারিব এবং তখনই প্রকৃত মহাত্মার কর্মের অংশী বলিয়া গণ্য হইব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
মাঘ ১৮৪৪ শক

## মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

২

আমাদের দেশের উপর সবচেয়ে বড়ো শত্রু প্রভুত্ব করিতেছে, তাহা হইতেছে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, জাতিভেদের গোঁড়ামি ও ধর্মের অন্ধতা। সমুদ্রপারের যে প্রভুত্ব বিদেশীদের মধ্য দিয়া আমাদের উপর শাসন করিতেছে, এই সমস্ত অজ্ঞতা ও সংস্কারের বিদ্বেষ তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি কঠোরতর। এই-সমস্ত অমঙ্গলের যতদিন মূলোচ্ছেদ না হইবে, ততদিন আমরা ভোটের অধিকার ও সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় যতই বিবাদ করি-না-কেন, প্রকৃত স্বাধীনতা আমরা কিছুতেই পাইব না। মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে এক নবতর জীবনের শক্তি এবং স্বাধীনতা লাভের এক দৃঢ়তর সংকল্পের সাহস দিয়াছেন— আজ সেই গান্ধীজীর জন্মতিথিতে আমাদিগকে এই কথাগুলিই স্মরণ রাখিতে হইবে। অবশ্য আমরা অনুভব করিতেছি যে, মহাত্মাজী তাঁহার ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনের প্রচণ্ড শক্তির দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঔদাসীন্য ও আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে দুর্জয় সংকল্পের পথে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা একান্তভাবে তাঁহারই সৃষ্ট আন্দোলন; তথাপি আমরা আশা করিতেছি যে, সমগ্র জাতির নিদ্রিত মনের এই জাগরণের ফলে ভারতকে সমস্ত সামাজিক দুর্গতি হইতে উদ্ধারের জন্য সাহায্য করিবে এবং ভারতের পূর্ণতা লাভের পথে যে বাধা আছে, তাহা দূর হইয়া যাইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৬ আশ্বিন ১৩৩৮

## মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৩

আজ মৃত্যুর ভীষণ গম্ভীর মহিমায় মহাত্মাজীর জন্মদিন আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে। এই মৃত্যুর মহত্ত্ব তাঁহাকে জয়দান করিয়াছে। সাধারণত মানুষ গণ্ডিবদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনের সহিত গতানুগতিক সম্পর্ক রাখিয়া তাহার অতি সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং তাহার পর একদিন সে মারা যায়। প্রত্যেক বৎসরেই জীবনের একটি বিশেষ দিন সে উপভোগ করে— সে দিনে সে তাহার অল্প কয়েকজন বন্ধু এবং

আত্মীয়ের হৃদয়ে তাহার জন্মগত অধিকারের আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু মহান যে আত্মা, সে বিস্তৃত জীবনক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে। বহুলোক এবং বিভিন্ন জাতি সেই আত্মাকে স্বীকার করিয়া লয়। তাঁহার জন্মদিন অনুষ্ঠানে আমরা আজ তাঁহাকে আমাদের চিরকালের আপন করিয়াই অনুভব করি না, তাহার মধ্য দিয়া অভুভব করি মানুষের ও জগতের সহিত আমাদের আত্মার আত্মীয়তা।

আজ আমাদের মহৎ সৌভাগ্য এই যে, এইরকম একজন মানুষ আজ আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন— আরও সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমরা তাঁহাকে অস্বীকার করি নাই! স্বাধীনতা এবং সত্যের অগ্রদূতগণকে আমরা প্রায়শই যেভাবে অস্বীকার করিয়াছি, তাঁহাকে সেরূপ করি নাই— এই আমাদের মহত্তর সৌভাগ্য। তাঁহার প্রভাব ভারতের সর্বত্র— এমন-কি, ভারতের বাহিরেও মানুষকে প্রেরণা দিয়াছে। তাঁহার প্রেরণায় আমাদের মধ্যে সেই সত্য-বোধ জাগিয়াছে, সে সত্য আমাদের স্বার্থসংকীর্ণ বুদ্ধিকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনই আমাদিগকে সেবা-মুক্তি এবং আত্মোৎসর্গের পথে অবিরাম আহ্বান করিতেছে। আজ জাতির পক্ষ হইতে মহাত্মাজীকে মহৎ ভ্রাতা বলিয়া বরণ করিয়া লইবার দিন; কারণ বর্তমান যুগে আমাদের মাতৃভূমিতে তিনিই আমাদের সকলকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। আমি আশা করি, আমরা সমস্ত অন্তরের সহিত গভীরভাবে আমাদের এই মনোভাব প্রকাশ করিব— শুধু আবেগময় অহংকারে মাতিয়া কখনো এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্যকে লঘু করিয়া ফেলিব না।

এই যুগের যে আহ্বান আমাদের নিকট আসিয়াছে, আমরা যেন তাহার যোগ্য হই এবং মহাত্মাজীর নিকট হইতে আমরা সেই দায়িত্ব যেন গ্রহণ করি, যে দায়িত্ব তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা জানি যে, সর্বমানবের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান উপনিষদের দেবতাকে 'মহাত্মা' বলা হইয়াছে। আমরা আজ যে দেবমানবের সংবর্ধনা করিতেছি, তাঁহাকে ওই আখ্যাটি ঠিকই দেওয়া হইয়াছে— কারণ তাঁহার মহান আত্মা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং যাহারা পরে জন্মগ্রহণ করিবে সেই অগণিত জনগণের হৃদয়ে তিনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আত্মার এই মহত্ত্ব— অন্য সকলকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করিবার এই ক্ষমতা আমাদের ইতিহাসে যাহা কখনো ঘটে নাই, তাহাই সম্ভব করিয়াছে, আজ জনসাধারণ পর্যন্ত এ কথা বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভারতবর্ষ শুধু ভৌগোলিক অস্তিত্ব মাত্র নহে— ভারতবর্ষ একটি জীবন্ত সত্য, যে সত্যের মধ্যে তাহারা সর্বদা বাঁচিয়া আছে এবং সঞ্চরণ করিতেছে।

দৈবায়ত্ত জন্মসূত্রে যাহারা ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যাহাদের ন্যুব্জ পৃষ্ঠে শুধু অশ্রদ্ধারই বোঝা চাপানো হইয়াছে, যে সহানুভূতি সমস্ত মানুষের জন্মগত অধিকার, সেই সহানুভূতি হইতে আমাদের দেশের যে বৃহৎ জনসংখ্যাকে ইচ্ছাপূর্বক বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, তাহাদের প্রতি এই অনাচার বহু যুগ সঞ্চিত এই গুরুভার বোঝা, এই সহানুভূতি-বঞ্চনার পাপ দূর করিবার জন্য মহাত্মাজী সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহার এই মহৎ কার্যে যোগ দিবার জন্য আমাদের দৃঢ় চেষ্টা আমরা শুধু ভারতের নৈতিক দাসত্বের নিগড়কেই খসাইয়া ফেলিতেছি না— আমরা সমস্ত মনুষ্য জাতিকে পথপ্রদর্শন করিতেছি। অত্যাচার যেখানে, যে ভাবেই থাকুক-না-কেন, আমরা তাহাকে বিবেকের নিকট জবাব দিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। বিবেকের এই নিষ্করুণ প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাকেই মহাত্মাজী আমাদের যুগের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মহাত্মাজী যখন অনশনব্রত আরম্ভ করিলেন, তখন আমাদের নিজের দেশে এবং বিদেশে বহু সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তি তাঁহাকে উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমাদের চক্ষের সম্মুখেই অত্যাশ্চর্য যাহা, তাহা ঘটিয়া গেল। সনাতন সংস্কারের কঠিন পাষাণ বিচূর্ণ হইয়াছে। যে অর্থহীন বিধিনিষেধ আমাদের জাতীয় জীবনকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ইতিমধ্যেই খসিয়া পড়িতেছে। তাঁহার তপশ্চর্যার ফলে অদ্ভুত কাজ হইয়াছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতার পাপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না করা

পর্যন্ত, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বিঘ্ন, আমাদের স্বাধীনতা এবং ন্যায়পরায়ণতার পথের বাধা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া তিনি যদি তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার এবং আমাদের গৌরব মহত্তর হইবে।

বন্ধুগণ, আপনাদের নিকট আমার এই আবেদন— আপনাদের দেশবাসী যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া নীরবে অপমান সহ্য করিয়াছে, যাহারা মূকভাবে অত্যাচারকে মানিয়া লইয়াছে, দেবতাকে স্মরণ করিয়াও যাহারা কখনো ভর্ৎসনা করে নাই, নিজেদের অদৃষ্টকে পর্যন্ত দোষ দেয় নাই, তাহাদের প্রতি প্রীতি এবং ন্যায়বিচারের উদ্যম হইতে বিচ্যুত হইয়া আপনারা আপনাদের মহ্যমানবের প্রতি, আপনাদের অন্তর্নিহিত মানবত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। কিন্তু অবশেষে জাতির ভগবৎ-প্রেরিত অধিনায়কের ক্রুদ্ধস্বর আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তিনি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, যাহারা গর্বান্ধ হইয়া নিজের— আপনার জনের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের স্বাধীনতায় বাধা দেয়, তাহারা স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করে।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৩ আশ্বিন ১৩৩৯

## • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৪

বর্তমান যুগে আমাদের জন্মভূমিতে আমাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রধান যোগসূত্র হইতেছে মহাত্মা গান্ধী এবং গান্ধীজীকে আমাদের মহান ভ্রাতারূপে জাতির পক্ষ হইতে স্বীকার করিয়া লইবার দিন আজ আসিয়াছে। আমি আশা করি, আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের এই মনোভাবকে প্রকাশ করিব। কিন্তু কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসপূর্ণ গর্ববোধকে প্রশ্রয় দিয়া এই শুভক্ষণের যথার্থ ভাবধারাকে আমরা যেন হাল্কা করিয়া না ফেলি। যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দুঃখব্রত আরম্ভ করেন, তখন আমাদের দেশে এবং বিদেশে অনেক সংশয়বাদী তাঁহাকে বিদ্রূপ এবং ঠাট্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি আমাদের চক্ষের সম্মুখে এমন ঘটনা ঘটিল, যাহাতে যুগ-যুগান্তের কুসংস্কার ও যুক্তিহীন বিধিনিষেধের কঠিন পাষাণ স্তূপ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। এই-সমস্ত বিধিনিষেধ ও কুসংস্কার আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বনাশ সাধন করিতেছিল।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৩ আশ্বিন ১৩৩৯

## • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৫

এই ধরনের উৎসবাদিতে মন যখন ভাবাবেগে কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, মনের আবেগ প্রকাশ করিবার ভাষা যখন আমরা খুঁজিয়া পাই না, সেই-সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের আমদানি করা লম্বা লম্বা বক্তৃতা আমি মোটেই পছন্দ করি না। এই-সকল ক্ষেত্রে বরং সময়োপযোগী যে-সকল বৈদিক স্তবস্তোত্রাদি পবিত্রমনা ঋষিদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে, মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য প্রার্থনার আকারে ওইগুলি আবৃত্তি করা যাইতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী মানবজাতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার অদম্য মনঃশক্তি বলে তিনি এক তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে নিজ অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ জন্য প্রখর কর্ম-প্রচেষ্টার মুখে প্রধাবিত করিয়াছেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিয়া নূতন কর্মোদ্যমে তিনিই তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন ও দেশবাসিগণের সমক্ষে ভবিষ্যৎ ভারতের এক অত্যুজ্জ্বল চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন।

মহান কর্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জনের জন্য মহাত্মাকে দীর্ঘজীবন দান করিবার জন্য ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা প্রত্যেকেরই এক পবিত্র কর্তব্যবিশেষ।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৭ আশ্বিন ১৩৪১

## মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৬

বর্তমান বৎসরে মহাত্মাজীর জন্মদিবসে সমগ্র দেশের সহিত আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছি। সেইসঙ্গে এ বৎসর তাঁহার আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় পল্লীশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে বিরাট প্রচেষ্টার উদ্‌বোধন করা হইয়াছে, তাহাও আমি স্মরণ করিব। কারণ, ভারতের জাতীয়তার পুনর্গঠনে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৫ আশ্বিন ১৩৪২

## মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৭

আজিকার প্রধান সমস্যা হইল এই যে, জাতীয় ঐক্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হইলেও আমরা এখনো এক হইতে পারি নাই। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে; গান্ধীজীর রাজনীতির মূল লক্ষ্য হইল ঐক্য স্থাপন, সেই ঐক্য শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্রস্বরূপ নয়— উহা দুর্বার নৈতিক শক্তিও বটে। তিনিই সর্বপ্রথম রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের গোড়ার খবর রাখেন; কাজেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, একমাত্র সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া মহত্তর কিছুর অভাববশত পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্তঃস্থল গলদে পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য রাজনীতির পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন অনেক রাজনৈতিক নেতা আজও আমাদের মধ্যে আছেন। ইঁহাদের নিকট সাফল্যের স্থান সত্যেরও ঊর্ধ্বে তাঁহাদের যে তথাকথিত যোগ্যতা আছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে পারি না। আত্মসর্বস্ব পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুরতা প্রলয়ংকর বিপদের দিকে চলিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের বিষময় ফল দিনের পর দিন প্রকট হইয়া উঠিতেছে। পন্থা নির্বাচনের পূর্বে আমাদের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। খৃস্টধর্ম শিক্ষা দেয়, সত্যই পরমেশ্বর। কিন্তু বর্তমান যুগের খৃস্টানেরা তৎপরিবর্তে পাশবিক শক্তির গৌরব ঘোষণা করে। আধুনিক যুগের একমাত্র খাঁটি খৃস্টান কাউন্ট টলস্টয় গান্ধীজীকে দেখাইয়াছেন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও নৈতিক শক্তি কিরূপ কার্যকর। স্বদেশপ্রীতির বুলি বর্তমান যুগের অভিশাপ সত্য ও অহিংসা দ্বারা মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে ওই বিপদ হইতে

উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। উহাই তাঁহার সাধনা এবং মাতৃভূমির মারফত জগতের প্রতি উহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম দান। ভারতের ইতিহাসের এই স্মরণীয় দিনে আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৭ আশ্বিন ১৩৪৩

# মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৮

সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের কার্যেরও দোষগুণের বিচার হয়, কিন্তু তাঁহাদের কার্যের পশ্চাতে যে ত্যাগ এবং প্রেরণা থাকে, তাহা লৌকিক বিচারের অতীত। মহাত্মা গান্ধীর কার্য সমগ্র জগৎবাসীর প্রশংসা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে প্রেরণা তাঁহার কার্যে শক্তি এবং প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে আমাদের পক্ষে তাহা অনুভব করাই হইল বড়ো কথা। অকপটে, নির্ভীকভাবে এবং ফলাফলে উদাসীন হইয়া সত্যের নিকট ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ— ইহাই তাঁহার কর্মসাধনায় দুরপনেয় গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে ভাবধারার পুনঃ পুনঃ সংস্কার অপরিহার্য। আবার রাজনীতি এবং সমাজনীতির ক্ষেত্রেও নূতন নূতন প্রথা ও প্রণালীর আমদানি করিয়া কর্মপন্থায় সজীবতা সম্পাদনও অত্যাবশ্যক। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার যে নীতি আমদানি করিয়াছেন, তাহা স্থায়ী হইবে। যে যুগে সংঘবদ্ধ শঠতা এবং সরাসরি অসত্য প্রচারই হইল স্বাভাবিক প্রথা, সে যুগে মহাত্মা গান্ধীই কেবল রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় সততার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম হইতেই তিনি চরিত্রের উৎকর্ষের উপরই জোর দিয়া আসিতেছেন। রাজনৈতিক মতবাদের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। বৃহত্তর জাতীয় সেবার ক্ষেত্রেও দেশবাসীর সহিত ব্যবহারে মহাত্মা গান্ধী সেই একই সত্যের পথ অনুসরণ করিতেছেন। আমাদের গ্রামবাসী এবং অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির সম্পূর্ণ যোগ্যতা তিনিই সর্বপ্রথম স্বীকার করিয়াছেন এবং আমাদিগকেও স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন যে, আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের ভিত্তি মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনীতিকের উপর নহে, পরন্তু সমগ্র দেশবাসীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমার মনে পড়ে, কংগ্রেসের প্রথম আমলে পাবনাতে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে আমি বলিয়াছিলাম যে, নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা গ্রামবাসীদের হাতেই থাকা উচিত কিন্তু জনৈক সুবিখ্যাত নেতা (তাঁহার নাম প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন) আমার কথায় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলেন; তখন আমাদের দৃষ্টি পশ্চিমাভিমুখী ছিল এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের একদল সর্বপ্রথমে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে নিযুক্ত ছিলেন এবং অপর দল ক্রোধভরে শাসকবর্গের নিকট হইতে সকল অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন। আজ সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন আমাদের দেশবাসীরা একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রচারিত দেশপ্রেমের মধ্যেই তাহাদের নষ্ট মর্যাদা ফিরিয়া পাইয়াছে। সৃষ্টিশক্তির এক অফুরন্ত উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভিক্ষুকের বেশধারী এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির জন্মতিথিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। এই শুভ উপলক্ষে আমি আমাদের আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ আশ্বিন ১৩৪৫

# মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৯

আমি আশা করি যে, আমাদের আশ্রমে আপনাকে সংবর্ধিত করিবার সময় আমরা সংযত ভাষায় আপনাকে প্রীতি নিবেদন করিতে পারিব এবং অনাবশ্যক শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষাকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে দিব না। মহতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন স্বভাবতই সরল ভাষাতেই ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং আপনাকে আমরা যে আমাদের এবং বিশ্বমানবের স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, সেই কথা জানাইবার জন্য আপনাকে মাত্র এই কয়টি কথা বলিতেছি।

বর্তমান মুহূর্তে এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা আমাদের ভাগ্যকে অন্ধকারাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা জানি যে, এই-সমস্ত সমস্যা দ্বারা আপনার পথও আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং আমাদের মধ্যে কেহই ইহাদের আক্রমণ হইতে মুক্ত নহে। যাহা হউক, আমরা যেন ক্ষণিকের জন্যও এই কোলাহলের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আমাদের অদ্যকার এই সাক্ষাৎকারকে হৃদয়ের অনাড়ম্বর সাক্ষাৎকারের পরিণত করিতে পারি। আমাদের বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক আবর্তের যখন অবসান হইবে, তখনও আমাদের এই সাক্ষাৎকারের স্মৃতি জাগরূক থাকিবে এবং আমাদের সমস্ত সত্য প্রচেষ্টার শাশ্বত মূল্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৫ ফাল্গুন ১৩৪৬

# সু-সীমো

সাধারণত একজাতি অন্যজাতির কাছে রাজদূত প্রেরণ করেন। তাঁরা হন রাজনীতিবিদ; রাজনীতির এ-সকল ব্যবসাদাররা যান লাভের জন্য, অর্থের জন্য; তাঁরা যে বন্ধন বাঁধেন সে বাঁধন হচ্ছে রাজনীতির বাঁধন। কোনো জাতিই অন্য জাতির কাছে কবিদূত পাঠান না; কিন্তু আমি গিয়েছিলেম তোমাদের দেশে কবিদূত হয়ে ভারতবর্ষ আর চীনের মধ্যে সখ্যের বাঁধন বাঁধতে; লাভ নয়, অর্থ নয়, রাজ্য নয়, আমি চেয়েছিলাম প্রীতি। তোমরা আমাকে আদরে আত্মীয় বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলে তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি যে য়ুরোপে যশলাভ করেছি বা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি তার জন্যে তোমরা আমাকে অভ্যর্থনা কর নি; তোমাদের একান্ত আত্মীয়রূপেই তোমরা আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলে। তোমাদের দেশের সব জায়গাতেই আমি এই সহজ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেম।

বহু প্রাচীন যুগ হতেই ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যে অতি নিবিড় সখ্যের সম্বন্ধ ছিল আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলাম তাকেই নূতন করে জাগাতে। ঘটনাচক্রের আবর্তনে এই যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ যোগসূত্র যাঁরা অতীতকালে একদিন বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁরা রাজনীতিক ছিলেন না— তাঁদের পিছনে পিছনে অস্ত্রধারী সৈন্য ছিল না— তাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সাধনার সম্পদ নিয়ে।

আমি তোমাদের দেশের নানা জায়গায় গুহা দেখেছি, যেখানে সে যুগের সাধকরা দিনের পর দিন সাধনায় কাটিয়েছিলেন। তোমাদের দেশে গিয়ে আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি জেগে উঠেছিল, আমার মনে হয়েছিল যেন এই সাধকেরাই আমার মধ্যে নব জীবন লাভ করে এ যুগের কবিদূতরূপে তোমাদের কাছে আবার গিয়েছেন।

তোমাদের সহজ প্রীতির সেই সুন্দর অভ্যর্থনা আমি চিরদিন স্মরণ করে রাখব। বিশেষ করে তোমার কথা। আমার মনে পড়ে যেদিন তুমি আমার কাছে প্রথম এসেছিলে। একান্ত সহজ

ভাবেই তুমি এসেছিলে— আমার পরম আত্মীয়রূপে। সেদিন আমি কামনা করেছিলাম আজ যে-প্রীতি তোমার ও তোমার দেশের কাছ থেকে আমি পেলাম যেন ভবিষ্যতে তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে সেইভাবে আত্মীয়রূপে একদিন অভ্যর্থনা করে নিতে পারি।

আজ তুমি এখানে আমাদের কাছে এসেছ। আশ্রমের সকলের পক্ষ থেকে আমাদের প্রীতি আজ আমি তোমাকে জ্ঞাপন করছি। এ আমার আশ্রম; এখানে আমি শুধু কবি নই, এখানে আমি বস্তুকে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছি। তোমাদের দেশে আমাকে যে রূপে দেখেছিলে সে রূপ শুধু আমার কবিরূপ। সেটা আমার জীবনের একটি বড়ো প্রকাশ হলেও সেটা আংশিক। এখানে তুমি আমাকে পূর্ণতররূপে আমার নিজের সত্য আবেষ্টনের মধ্যে দেখবে। এখানে দেখবে কবি কীরূপে তার স্বপ্নকে বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করবার সাধনা করছে।

এই আশ্রমে আমরা সমগ্র বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করেছি; সমস্ত বিশ্ব এখানে আমাদের অতিথি; তুমি আমাদের আশ্রমের এই সখ্যের বাণী বহন করে তোমাদের দেশে নিয়ে যাবে এই আমার কামনা।

প্রবাসী

পৌষ ১৩৩৫

## মদনমোহন মালব্য

বন্ধু সর্বজনবন্ধু,

ভারতবর্ষ যে দেবতাকে বলেছেন, এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ সেই সর্বজনের হৃদয়বাসী পরম দেবতার উপাসনায় তুমি আজ পৌরোহিত্য পদ গ্রহণ করেছ, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।

তুমি ব্রাহ্মণ, সর্ববর্ণকে সম্মানিত করবার উদার অধিকার তোমার, সেই অধিকারকে তুমি অশঙ্কচিত্ত অধ্যবসায়ে স্বীকার করেছ, ভারতে ব্রাহ্মণকে ধন্য করেছ, ব্রাহ্মণকে সত্য করেছ, তোমাকে অভিবাদন করি।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আছে

সুখং হবমতঃ শেতে মুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে
সুখং চরতি লোকে, শ্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি।"

ভারতে আমরা দীর্ঘকাল মানুষকে অপমানিত করেছি। তাকে হীন করে রেখেছি, সেই পাপে আমরা বিনাশের পথে চলেছিলুম, সেই পাপ মোচন করে বিনাশের থেকে দেশকে রক্ষা করবার চেষ্টায় তুমি প্রবৃত্ত, তোমাকে আমি অভিবাদন করি।

সংসারে পাণ্ডিত্য দুর্লভ নয় যে পাণ্ডিত্য আক্ষরিক। তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে আত্মায় গ্রহণ করেছ, সেই বিদ্যার প্রভাবে দেশকে মোহমুক্ত করবার জন্য তোমার উদ্যম, সেই বিদ্যাকে তুমি মানব ইতিহাসে ফলশস্যশালী করে তুলবে, তোমাকে অভিবাদন করি।

দেশে একদা শিক্ষার ক্ষেত্র তুমি প্রসারিত করেছ, আজ তুমি ভারতে স্বরাষ্ট্রের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য তোমার অসম্মান শক্তিকে নিযুক্ত করেছ। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা তোমার চেষ্টার সমর্থন না করাতেও পারে, কিন্তু যে সাধনা মহতী ব্যর্থ হলেও তা দেশের লোকের পক্ষে চিরসম্পদ, সেই সম্পদ থেকে কোনো প্রতিকূলতা দেশকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমাকে আমি অভিবাদন করি।

সমস্ত ভারতবর্ষের নামে এখানে আমরা তপস্যাক্ষেত্র রচনা করেছি। দেশের চিত্তকে স্বকৃত ও পরকৃত সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করব, এই আমাদের সংকল্প। আমাদের স্বল্প শক্তিতে এই সংকল্প সমস্ত বিরুদ্ধতা অতিক্রম করে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করবে কি না জানি না। কিন্তু দুঃসাধ্যতার ভয়ে চেষ্টামাত্র না করলে যে আত্মলাঘব ঘটত, তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দীর্ঘকাল সকল প্রকার আঘাত-ব্যাঘাত, বিদ্রূপ ও বিমুখতার সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছি। হে কৃতী

হে যশস্বী আজ আমাদের সেই সাধনার ক্ষেত্র তোমার প্রসন্ন আগমনের দ্বারা সার্থক হল, তোমাকে আমি অভিবাদন করি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

# · পোরে দেবৌদ

হে পারস্য সভ্যতার বার্তাবহ, আমরা আপনাকে শান্তিনিকেতন তথা ভারতের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করি। ভারতবর্ষ শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শনের ভিতর দিয়া আপনাদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। ভাষা ও ব্যবধানের দূরত্ব সত্ত্বেও এশিয়ার আত্মপ্রকাশের দিন আপনাদের সহিত একসূত্রে ভারত তাহার চিন্তাধারা ও আত্মানুভূতির সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছিল।

বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়া ভারত ও ইরানের বন্ধুত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু এশিয়ার এই নবজাগরণে আমাদের সেই পূর্বসম্বন্ধ ফিরিয়া আসিয়াছে।

আপনি এশিয়ার জাগরণের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে যে সত্যের আলো ইরান ও ভারত জ্বালিয়াছিল, তাহা আবার আমাদিগকে প্রজ্বলিত করিতে হইবে। কিছু পূর্বে আমরা যে স্তোত্রটি পাঠ করিয়াছিলাম উহা ওই ভাবেরই দ্যোতক। আমাদের অন্তর আবার একীভূত হইবে এবং আত্মজ্ঞানের সন্ধানে এশিয়ার আকাশ বাতাসকে আলোড়িত করিবে।

অমরা এশিয়াবাসিগণ আপনার দেশের শ্রেষ্ঠ নরপতির নিকট কৃতজ্ঞ; কারণ তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বহুদূরপ্রসারী কল্পনার প্রভাবে এশিয়াতে নবযুগের প্রবর্তন করিয়া নিকটবর্তী দেশসমূহে আত্মবিশ্বাস ও আশার আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন, আজিকার এই শুভ মুহূর্তে তাঁহার মহানুভবতাকে স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের অনাবিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আমাদের এই অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ মনীষীর আগমন আমাদের প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

এশিয়ার লুপ্ত গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ইরান ও ভারতের সমচেষ্টায় মানবসভ্যতা রচনায় আজ এশিয়াকে তাহার নিজস্ব সম্পদ দিতে হইবে। সেই স্মরণীয় মুহূর্তকে স্মরণ করিয়া আমাদের ইরান বন্ধুকে অভিনন্দিত করিতে আজ আমরা গর্বানুভব করিতেছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৮ পৌষ ১৩৩৯

# · যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে-সমস্ত সাহসী যোদ্ধা সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের অন্যতম। মাতৃভূমির উন্নতি সাধনের জন্য কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকারেই তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি তাঁহার লাভজনক আইন ব্যাবসা পরিত্যাগ করেন এবং স্বয়ং আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমগ্র পরিবারের সহিত অপরিসীম দুঃখের জীবন বরণ করিয়া লন। আচরণে মহৎ এবং সৌজন্যে সর্বজয়ী যতীন্দ্রমোহন সমগ্র ভারতের একজন সর্বজনপ্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক নেতা ছিলেন, ভারতের জাতীয় জীবনের এই সংকট মুহূর্তে এরূপ একজন নেতাকে হারাইয়া দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক বন্দীরূপে আবদ্ধ থাকার জন্যই যে তাঁহার মৃত্যু এত ত্বরান্বিত এবং এত অসময়ে সংঘটিত হইল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তিনি রুচিসম্পন্ন এবং

শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার স্বদেশের আহ্বান আসিল, তখন তিনি স্বাধীনতার বেদিমূলে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই আনন্দ উপভোগ করিলেন। যে জীবন মহৎভাবে উদ্‌যাপিত এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে উৎসর্গীকৃত, তাঁহার স্মৃতি ভারতের পক্ষে গৌরবের ও বেদনার।

শান্তিনিকেতন
২২ জুলাই ১৯৩৩
আনন্দবাজার পত্রিকা
৯ শ্রাবণ ১৩৪০

## · বিঠলভাই প্যাটেল

বিঠলভাই-এর মৃত্যুতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহা সাহসী যোদ্ধার তিরোধান হইল। আত্মত্যাগী এই স্বদেশ প্রেমিক তাঁহার যাহা-কিছু মূল্যবান সমস্তই অকাতরে স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় তাঁহার প্রয়োজন যখন একান্ত হইয়া উঠিল ঠিক সেই সময়েই নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। এতৎ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, প্রিয় মাতৃভূমি হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূর প্রবাসে তাঁহাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইল। সমগ্র ভারতের সহিত মিলিত হইয়া আমিও এই পরলোকগত মহান নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১০ কার্তিক ১৩৪০

## · হজরত মহম্মদ

ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে ইহার অনুবর্তীগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতে যে সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের প্রতি সভ্যজাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্‌ভাবিত করিতে হয় তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না, তবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদিগের অমর জীবন হইতে চির-উৎসারিত। অদ্যকার এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মস্লেম ভ্রাতাদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশে আমার ভক্তি-উপহার অর্পণ করিয়া উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি। ১০ আষাঢ় ১৩৪১

রবীন্দ্রজীবনী ৩/৫৪০-৪১

## · রামচন্দ্র শর্মা

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা আত্মত্যাগের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা দুর্বলচেতা— তাঁহার সংকল্পের ফল কী হইবে, তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু বাংলায় শক্তিপূজায় পশুবলি বন্ধ করা যে সহজ কথা নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। আমি জানি রামচন্দ্র শর্মার উদ্দেশ্য আপাতত সফল হইবে না। কিন্তু তাঁহার আত্মত্যাগের তুলনা নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ দিয়া তাহার বিচার করিলে চলিবে না। তাঁহার আত্মবলিদানে আমরা ব্যথিত হইব, কিন্তু তাঁহার আত্মত্যাগের জন্য ওই মূল্যই আমাদের দিতে হইবে। তিনি আত্মবলি দিলে কী ফল

ফলিবে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্ত যে ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে, সেই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পার্থের মন অবসন্ন হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে তাহাই আমার মনে হইতেছে। আমরা তাঁহার সংকল্পে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করিলে, তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে না। পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা তাঁহার কর্তব্য ভালোই জানেন, তিনি আরও জানেন যে, "নিজ নিজ বিশ্বাসের জন্য জীবন উৎসর্গ করাও বাঞ্ছনীয়।"

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৯ ভাদ্র ১৩৪২

# রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং

যে কণ্ঠ ইংরাজি ভাষায় নূতন শক্তি সঞ্চার করিত তাহা আজ নীরব হইয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে আমি তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি।

শান্তিনিকেতন ১৮ জানুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকা
৫ মাঘ ১৩৪২

# পঞ্চম জর্জ

এত অকস্মাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর যে শোকভার নিপতিত হইয়াছে, আমরা সকলেই তাহার অংশ গ্রহণ করিতেছি। সম্রাট পঞ্চম জর্জের এই পরলোকগমন ব্রিটিশ প্রজামণ্ডলীর নিকট কেবল একটা ক্ষতি নহে, তদপেক্ষাও অধিক। কেননা সমগ্র জগৎ আজ একজন প্রকৃত বিশ্বশান্তিকামীকে হারাইল।

শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

আনন্দবাজার পত্রিকা
৮ মাঘ ১৩৪২

# দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ১

বাল্যকাল হইতে একটা জিনিস আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে অসংখ্য কর্মের ভিতরেও আমার পিতা নিজেকে আশ্চর্যরূপে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। এই শক্তি লইয়াই তিনি জন্মিয়াছিলেন— তাঁহার চরিত্রের ইহাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাংসারিক প্রয়োজন, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের আকর্ষণ কিছুতেই তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি ক্ষুণ্ণ করিতে পারিত না। মনে হইত যেন তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এক অফুরন্ত শান্তির উৎসের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাতেই ইঁহাকে এই নিঃসঙ্গতা ও স্বতন্ত্রতার অধিকারী করিয়াছিল। যখন আমার পিতামহ পরলোক গমন করেন, তখন তিনি প্রায় বিনাশের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি বীরের মতো ঐহিক ও সাংসারিক সমস্ত জিনিসের প্রতি একটা অনাসক্তি বজায় রাখিয়াছিলেন, আত্মার ভিতরেই তখন তিনি সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়াছিলেন।

আমার দশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইলে পিতার সহিত হিমালয় প্রবাসে যাইবার সুযোগ

আমার মিলিয়াছিল। ইহার পূর্বে এত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার অবসর আমার হয় নাই। তিনি নির্জনবাস হইতে যখন মাঝে মাঝে গৃহে আসিতেন, তখন আমি এবং পরিবারের অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে ভীতি ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতাম। তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব যখন করিলেন, তখন আমার যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। হিমালয়ে যাইবার পথে আমরা কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। সেইখানেই তাঁহার নিকট আমার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইহা ৬৫ বৎসর পূর্বের কথা। এখনকার মতো তখনও আমি লেখাপড়ায় উদাসীন ছিলাম। বর্তমানে যেখানে নাট্যঘর নির্মিত হইয়াছে, ওইখানে একটি নারিকেল গাছ ছিল। তাহার ছায়ায় বসিয়া আমি প্রথম কবিতার বই লিখি। আমার বালকোচিত খেয়ালে পিতা কখনো কোনো বাধা দিতেন না কিন্তু অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াও, এ কথা আমি সর্বদাই অনুভব করিতাম যে, তাঁহার আত্মা নক্ষত্রের মতো এক স্বতন্ত্র উর্ধ্বলোকে বিরাজ করিত। আমি এখনকার মতো তখনও বুঝিতাম যে, তিনি যখন ধ্যানমগ্ন হইতেন, তখন তিনি নিজের ভিতরে ডুবিয়া যাইতেন, অন্তরের সহিত তাঁহার যোগ সংস্থাপিত হইত। হিমালয়ে যখন তিনি পূর্বাস্য হইয়া ধ্যানে বসিতেন তখন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমার মনে যে ভীতি ও শ্রদ্ধার উদয় হইত, তাহা এখনও আমার স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা এই প্রশস্তি ও বৈরাগ্যের মহিমা অনুভব করিয়াছেন। সৌর জগতে সূর্যের মতো তিনি তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বিরাজ করিতেন। সকলের অতি নিকটে থাকিয়াও তিনি তুষারশীর্ষ কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো সকলের উর্ধ্বে মস্তক সমুন্নত রাখিতেন।

এই আশ্রমই আমাদের নিকট তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বাহিরের কলকোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও মানুষের অন্তরতম কল্যাণ চিন্তা করা ইহার কাজ। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ ও জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যোপলব্ধির পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা ভবিষ্যদ্‌বাণীর দ্বারা তিনি কখনো কাহাকেও প্রতারিত করিতেন না। কোনো অবস্থাতেই তিনি শাশ্বত আনন্দে তাঁহার যে অবিচল বিশ্বাস ছিল তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। তিনি জানিতেন যে, বন্ধন মুক্তি ব্যতীত আত্মোন্নতি সম্ভবপর নহে। তিনি এই আশ্রমের ভিতরে সেই মুক্তির ভাব সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। কৃত্রিম বন্ধনে সত্য যাহাতে শৃঙ্খলিত না হয় তজ্জন্য আমার যথাশক্তি চেষ্টা আমি করিয়াছি। আমার পিতার ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি যে স্বাধীনভাবে পরিবর্ধিত হইবার সুযোগ না পাইলে আত্মা বা মন কখনো চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। আমি তাঁহার নিকট আমার ঋণের কথা কখনো বিস্মৃত হইতে পারি না। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করিতে এবং সত্যকে সকলের উপর স্থান দিতে তিনিই তাঁহার জীবনাদর্শ দ্বারা আমাকে শিখাইয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৮ মাঘ ১৩৪২

শান্তিনিকেতন
২০ জানুয়ারি ১৯৩৬

# দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ২

অদ্য সকালে ঘুম ভাঙিলে চাহিয়া দেখি পূর্বাকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। মনে হইল আবহাওয়ার বিপর্যয়ে বুঝি আজিকার আনন্দের বাধা ঘটিবে। তাহার পর চিন্তা আসিল, সত্যকার আনন্দ লাভ কত দুর্ঘট। এই প্রাত্যহিক বাস্তবতার জগতে আনন্দের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আত্মার গভীরতর প্রদেশে ইহার স্থান। হয়তো ঈশ্বরেরই বিধান এই যে, সত্যকার আনন্দ পাইতে হইলে মানুষকে নিজেরই অন্তরে ইহার উৎস খুঁজিতে হইবে।

মানুষ এই জগতে বহু অক্ষমতা লইয়া আসিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ জগতের আর আর প্রাণীর মতো হিংস্রতা ও জড়তার মাত্রা তাহারও মধ্যে পুরোপুরিই রহিয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া, আত্মার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করাই মানুষের জীবনের ব্রত বলিয়া বোধ হয়। আমি মনে করি, আজিকার আকাশপটে উজ্জ্বল অক্ষরে এই সত্যই লিখিত রহিয়াছে। মানুষকে এই অন্ধকারের যবনিকা ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে যে জীবন ও আলোক নির্ঝর রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে।

আজ আমার পূজনীয় পিতৃদেবের কথা মনে পড়িতেছে— সারা জীবন ধরিয়া ঐকান্তিক তীব্রতা-সহকারে তিনি এই অন্ধকার ও মৃত্যুকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জগতের অপূর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তিনি অমৃতের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বিপুল পার্থিব সম্পদ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহাকে আত্মপ্রসাদ ও আরামের অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে বদ্ধ করে নাই। জীবনের এই বৃহত্তর লক্ষ্যের অনুসন্ধানে রত ছিলেন বলিয়াই যেদিন দারিদ্র্যের রূঢ় আঘাত ভূমিকম্পের আকস্মিকতার মতো তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সর্বোপরি তাঁহার ছিল সেই আধ্যাত্মিক নিরাসক্তি বাহ্য ঘটনায় যাহা এতটুকুও বিচলিত হইত না। ঐশ্বর্যের গুরুভারমুক্ত তাঁহার হৃদয় ত্যাগের আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিবিধ কর্মের দায়িত্ব এড়াইতে চাহেন নাই। 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' গীতায় উপদিষ্ট এই সত্য তিনি নিজ জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। নাবিকের মতন তিনি জীবনের বোঝাই তরী সংকট-সংকুল সমুদ্রের দুঃখকষ্ট ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

জীবনযুদ্ধের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে বিবিক্ত থাকিতে হইবে— পিতৃদেবের উদাহরণ হইতে এই শিক্ষাই আমি লাভ করিয়াছি এবং দৃঢ়তাসহকারে এই কথা বলিতে পারি যে, এই প্রতিষ্ঠান গঠনে যে চল্লিশ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে এই শিক্ষা আমার বিশেষ কাজে আসিয়াছে। এই সময়ে আমি বহু ও বিবিধ দুর্ভাগ্যের আঘাতে জর্জরিত ও নিরাশ হইয়াছি, বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছি। উদাসীন জনসাধারণের হৃদয়হীন অবহেলা সহ্য করিয়াছি। এই প্রতিকূলতার দিনে আমার পিতৃদেবের মহান ভাব আমাকে পথ দেখাইয়াছে। ইহাকে আমি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করি।

বহু বাধা, বিপদ সত্ত্বেও আমার জীবনের দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমি এই আশ্রমটি গড়িতে চেষ্টা করিয়াছি— কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে। এই আশ্রমে এবং আশ্রমের মধ্য দিয়া আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপলব্ধি করিবার দৃঢ় ইচ্ছার বশে এই চেষ্টা করিয়াছি। যাহারা স্বার্থ খোঁজে, যাহারা আত্ম-প্রচারের অভিলাষী, এই স্থান তাহাদের জন্য নয়। যাহারা প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতিগত সংযোগের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্লোকের পুনরুজ্জীবন চায়, এই স্থান তাহাদেরই মিলন-ভূমি। আজিকার উৎসব দিনের ইহাই বাণী।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৯ পৌষ ১৩৪৩

## মুন্সী প্রেমচাঁদ

সাহিত্যিক হিসাবে প্রেমচাঁদজীর খ্যাতি কেবলমাত্র প্রদেশ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহার মৃত্যুতে আজ আমরাও অভাব বোধ করিতেছি।

শান্তিনিকেতন ১৫ অক্টোবর ১৯৩৬

আনন্দবাজার পত্রিকা
৩০ আশ্বিন ১৩৪৩

# মহম্মদ ইকবাল

১

স্যার মহম্মদ ইকবালের কবিত্বের প্রতি সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা নিবেদনে আপনাদের সহিত আন্তরিকভাবে যোগদান করিতেছি। উর্দু ভাষায় অনভিজ্ঞতার দরুন আমি তাঁহার রচিত প্রাঞ্জল মৌলিক রচনা পাঠের আনন্দ হইতে বঞ্চিত। এজন্য আমি সততই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তিনি দেশের সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা করি।

লাহোর, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭

আনন্দবাজার পত্রিকা
১ পৌষ ১৩৪৪

# মহম্মদ ইকবাল

২

ইকবালের মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূরণ হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। আমাদের সাহিত্যজীবনে ইহা একটা মারাত্মক আঘাত। জগতে আজ ভারতের স্থান অতি সংকীর্ণ, এই সময় ইকবালের মতো একজন কবিকে হারানো তাহার পক্ষে খুবই কষ্টের কথা। কারণ ইকবালের কবিতার একটা বিশ্বজনীন মূল্য ছিল।

কলিকাতা ৮ বৈশাখ ১৩৪৫

আনন্দবাজার পত্রিকা
৯ বৈশাখ ১৩৪৫

# কামাল আতাতুর্ক

এক সময়ে এশিয়া আপনার প্রাচীন সভ্যতার গর্ব করিত এবং বর্তমানের অবমাননা বিস্মৃত হইবার জন্য গৌরবময় অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিত। তৎপর আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই অন্ধকার ও নৈরাশ্যের যুগ আসিল। এই সময়ে এশিয়া ইউরোপের হীন অনুকরণ করিয়া আপনার উপর হীনতার ছাপ মারিয়া দিল। কিন্তু অলৌকিক ঘটনার ন্যায় হঠাৎ নবযুগের আবির্ভাব হইল এবং এশিয়া আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল। সুদূর প্রাচ্যে জাপান নতুন যুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নিজ নিজ সম্পদ নিয়োজিত করিয়া পৃথিবীর সর্বপ্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে আপনার আসন ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু ভাবিতে দুঃখ হয় যে, ঔদ্ধত্য জাপানের ধ্বংসের পথ সুগম করিতেছে এবং আমরা আর তাহাকে এশিয়ার মর্যাদার পুনরুদ্ধারকারীরূপে দেখিতে পাই না। যে সময় নব জাগরিত তুরস্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তখন কামালের মৃত্যু সংবাদ আসিল। এক সময়ে তুরস্ককে 'ইউরোপের রুগ্‌ণ ব্যক্তি' আখ্যায় অভিহিত করা হইত; অবশেষে কামাল আসিয়া আমাদের সম্মুখে নূতন এশিয়ার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রাচ্যে এক নবজীবনের আশা দিয়াছে। এই দিক হইতে কামালের তেজস্বিতা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভের যোগ্য। তাঁহার মৃত্যুতে তুরস্কের যেরূপ গুরুতর ক্ষতি হইল সমগ্র এশিয়ারও সেইরূপ ক্ষতি হইল। কামাল পাশার বীরত্ব কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি মানুষের সর্বপ্রধান শত্রু অন্ধ কুসংস্কারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি মুক্তিদাতা ছিলেন। আমাদের নিকট তিনি এক উচ্চ আদর্শস্বরূপ থাকিবেন। কারণ কুসংস্কার অপেক্ষা অনুৎকৃষ্টতর

ধর্মানুরাগরূপ চোরাবালির উপর দাঁড়াইয়া আমরা জাতীয় বিচ্ছিন্নতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমার হিন্দু স্বদেশবাসীদের নিকট আমার দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ বক্তব্য এই যে, 'তোমাদের সমাজ অর্থহীন আচার ও অনুষ্ঠানের ভারে কাতর; তোমরা যদি কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া নূতন যুগের আহ্বানে সাড়া না দাও, তাহা হইলে তোমাদের ধ্বংস হইবে।' আমার মুসলমান স্বদেশবাসী যাহারা যে-কোনোরূপ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়— আমি কেবল তুরস্ক ও পারস্যের দৃষ্টান্তের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি।

শান্তিনিকেতন
১৯ নভেম্বর ১৯৩৮

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

# জগদীশচন্দ্র বসু

স্যার জগদীশের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যখন আমার হয় তখন তিনি যুবক এবং আমিও ছিলাম তাঁহার প্রায় সমবয়সী। সে সময় জড়জগতের সহিত প্রাণীজগতের গভীর আত্মীয়তার কল্পনায় তিনি আচ্ছন্ন মূক প্রকৃতির গোপন ভাষা জানিবার জন্য তাঁহার আশ্চর্য আবিষ্কার-প্রতিভার নিয়োজনে ব্যাপৃত। বাহিরের পরস্পর বিরোধিতার অন্তরালে যে জগতের অর্থ লুকানো, তাহার রহস্য ধরা পড়িতেছে তাঁহার নিপুণ জিজ্ঞাসার সাড়ায়। তাঁহার নিরন্তর বিস্ময়ের দৈনন্দিন আনন্দের অংশভাগী হওয়ার বিরল সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আদিম যুগে সমস্ত বস্তুর শৈশব সারল্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র ধরা পড়িত; আমার বিশ্বাস, কবির মন সেই আদিম কালের উত্তরাধিকারী। সমস্ত সৃষ্টির উপর নিজের সত্তা বিস্তৃত রহিয়াছে, এই অনুভূতির আনন্দ আস্বাদন করেন মায়ার এই পূজারীরা; তাই আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রাণহীন তাহার মধ্যে প্রাণীয় সমধর্ম তাঁহারা খোঁজেন। মনের এই ভঙ্গি সব ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাসের— সর্বজীবত্ববাদই হোক বা সর্বেশ্বরবাদই হোক— উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ ভঙ্গি নিছক মন ভুলানো হইতে পারে, যেমন দেখি শিশুর খেলায়; নৈসর্গিক জগতের সমস্ত ক্রিয়ায় প্রাণশক্তি আরোপের যে ঝোঁক আমাদের অবচেতন মনের আছে সেই ঝোঁক হইতেই শিশুর খেলার সৃষ্টি। শৈশব হইতেই আমি উপনিষদের পরিচয় লাভ করি; আদিম অপরোক্ষানুভূতিতে উপনিষদ ঘোষণা করে যে, এই পৃথিবীতে যাহা-কিছু বিদ্যমান সমস্তই প্রাণশক্তিতে স্পন্দমান, যে প্রাণ অনন্তে একীভূত।

এ কারণেই আমি উদ্‌গ্রীব উৎসাহে আশা করিতে থাকি, পৃথিবীতে প্রাণের সীমাহীন বিস্তৃতির কল্পনা এইবার বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে মঞ্জুর হইবে। নিভৃত সাধনপথে আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণের সুযোগ আমি পাই; আমি ছিলাম পল্লবগ্রাহী, তবু প্রাত্যহিক বিষয়ের সমারোহে আমার ভাগ ছিল তাহার দুর্গম যাত্রার এই প্রারম্ভকালে যখন বাধা ছিল প্রচুর ও দুর্লঙ্ঘ্য এবং গুণগ্রাহীতার উপর ছিল ঈর্ষার পাষাণভার, তখন তাঁহার পক্ষে সুহৃদ সঙ্গ ও সহানুভূতির কিছু মূল্য ছিল— আসুক না সে সঙ্গ ও সহানুভূতি এমন একজনের নিকট হইতে, যে তাঁহার সহিত মানসিক যোগাযোগ রক্ষার পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী। তবু আমার সগর্ব দাবি এই যে, সেই স্বল্প স্বীকৃতি ও জনসাধারণের দুর্বল সমর্থনের কালে আমি তাঁহাকে তাঁহার কোনো কোনো আশু প্রয়োজনে ও মাঝে মাঝে হতাশার মুহূর্তে সাহায্য করিয়াছি।

আমার সেই দূরাপসৃত স্মৃতির পটভূমিতে তাঁহার বিপুল ভবিষ্যৎ সাফল্যের স্বল্পতম আলোক-রেখা দেখিতে পাই না। দেশবাসীকে বিজ্ঞানের কল্যাণস্পর্শে সঞ্জীবিত করিবার জন্য সমৃদ্ধ এই বিজ্ঞান মন্দির নির্মাণের পক্ষে আবশ্যক প্রভূত সম্পদের সহিত বৈজ্ঞানিক খ্যাতিকে যুক্ত

করিয়াছিল যে সাফল্য, তাহার কোনো চিহ্নই সে পটভূমিতে দেখি না। বাস্তবিক, আমার কতকগুলি পুরানো চিঠি আজ পড়িলে আমার নিজের প্রতি করুণা হয়, আমার হাসি পায়। আমার প্রতি বিশ্বাস রাখার মূর্খতা যাহাদের ছিল সেই বন্ধুদের উৎসাহ জিয়াইয়া রাখিবার মতো পুঁজি আমার খুব কম ছিল; তবু সেই সময় তাঁহার অর্থ ভাণ্ডারের ঘাটতি পূরণ করিবার সম্ভাবনার কথা জানাইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পরে তিনি নিজের আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব দ্বারা এবং তাঁহার প্রতিভার প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস জাগ্রত করিয়া শ্রদ্ধার অজস্র দানলাভ করেন; তাঁহার পাশে আমার অনিয়মিত সাহায্য তুচ্ছ ও হাস্যকর; আমার সেই-সব প্রতিশ্রুতির গর্বিত গাম্ভীর্যের কথা ভাবিলে হাসিও পায়, ভালোও লাগে। কিন্তু আমি আবার বলি, অবাস্তব স্বপ্ন দেখায় মাধুর্য ছিল; মাধুর্য ছিল যথাসাধ্য সাহায্য দান, যতই সে সামান্য হোক। কারণ মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসে যে আনন্দ ও যে সাহস আছে তাহার প্রমাণ উহাতে পাই আর মহত্ত্বে বিশ্বাসই তো মনের মহার্ঘ সম্পদ।

বিজ্ঞানীর আত্মোপলব্ধির উজ্জ্বল মুহূর্তে খেয়ালি কবি তাঁহার যোগ্য সঙ্গী নয়; তা ছাড়া আমার শিক্ষাতেও ছিল ত্রুটি তথাপি আমি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গৃহীত হই এবং সম্ভবত আমাদের স্বভাবগত বৃত্তির বৈপরীত্যের জন্যই আমি তাঁহার সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে কিছু উদ্দীপিত করিতে পারি। আমার মানসিক গঠনে আবশ্যক পরিমাণ দম্ভ নাই বলিয়া এ ব্যাপারটি আমার মনে চিরকালের বিস্ময় হইয়া আছে।

তার পর আমাদের সময় কাটিয়াছে দ্রুত, আমাদের আশা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার দ্রুতবর্ধমান সাফল্যের কালে তাঁহার লক্ষ্যপথে আমার সঙ্গদানের প্রেরণা আমি ক্রমশ কম বোধ করিয়াছি। তাঁহার পথ তখন আর দুর্গম বা অনিশ্চয় ছিল না। তাঁহার কর্মজীবনের মেঘাবৃত প্রভাতে ভাগ্যের দ্বিধাবিজড়িত বেদনাকর মুহূর্তে আমার অবিচলিত বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার আত্মবিশ্বাসকে কিছু দৃঢ়তর করার গৌরব আমি দাবি করিতে পারি, আমার দাবি অসংগত নয়। সন্ধিক্ষণে সেইরূপ সামান্য সংগতির লোকও খুব বেশি কাজে আসে।

জয়ের উপর যথার্থ শক্তির দাবি অপ্রতিযোগ্য। তাহার ভ্রমণপথে সমস্ত সমধর্মী উপাদানকে আকর্ষণ করিয়া সে কাজে লাগায় এবং জয়শ্রীর প্রতিমূর্তি গড়িয়া তোলে। এই বিজ্ঞান মন্দির সেইরূপ একটি প্রতিমূর্তি, ইহার মধ্যে আচার্যের জীবনব্যাপী উদ্যম, অনুরূপ উদ্যমের প্রেরণা কেন্দ্ররূপে স্থায়ী মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে।

ভাগ্যের প্রতি আচার্যের প্রতিভা প্রথম যে দ্বন্দ্বের আহ্বান জানায়, তাহার সহিত আমার সংযোগ দূর ইতিহাসের কথা; আমার নিজের কাছেই সে পৃষ্ঠা অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে এই প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সভায় সম্মান-আসনে উপবেশনের আমন্ত্রণ গ্রহণে আমি রীতিমতো ইতস্তত করিয়াছিলাম। যৌবনের প্রগল্‌ভতার মূঢ় গর্বে আমি কল্পনা করিয়াছিলাম যে, আমার সম্মুখে যে ইতিহাস রূপ গ্রহণ করিতেছে, আমার সাহচর্যও তাহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। সেই বিশ্বাসে আমি আচার্যকে উৎসাহদানের চেষ্টা করি; সে চেষ্টা ছিল আমার অহমিকারই অঙ্গ। কিন্তু মূঢ় যৌবন চিরজীবী নয়; আমার ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিবার সময় আমি পাই। এ কথা সকলেরই জানা, আমি নেহাত একজন কবি; ভাষা মন্দিরে আমার সাধনা, এ দেবতা সবচেয়ে খেয়ালি, যুক্তির নিকট তাঁহার দায়িত্ব তিনি প্রায়ই ভুলিয়া যান এবং প্রায়ই কল্পনার ছায়াচ্ছন্ন জগতে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। পবিত্র পীঠস্থানে যোগ্য অর্ঘ্যদান আমাদের প্রাচ্য রীতি; কিন্তু বিদ্বান সমাজের এই স্মরণীয় সম্মেলনে আমার ভাষার অর্ঘ্য নিতান্ত অনুপযুক্ত।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে আজ এমন কয়েকজন আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞানের রাজ্যে অভিজাত শ্রেণীর সহিত সমান আসনের অধিকারী এবং যাঁহাদের চিন্তাসম্ভার এই অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমি শুধু এই প্রতিষ্ঠানকে আশীর্বাদ করিতে পারি দূর

হইতে, যেখানে এই দেশের অবজ্ঞাত জনগণ পুরুষ-পরম্পরায় আদিম হলকর্ষণের নিষ্করুণ শ্রমকে অসহায়ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বৈজ্ঞানিক শয়তানীর বিপদ এবং জীবনের সম্পদ শোষণ হইতে যে জ্ঞান তাহাদের রক্ষা করিতে পারে সেই জ্ঞান হইতে তাহারা বঞ্চিত; এই-সব বিড়ম্বিত হতভাগ্যের নিকটে বসিয়া আমি বিজ্ঞান মন্দিরের যশস্বী প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। যে দস্যুরা বিজ্ঞানের মহৎ ব্রতকে অকুণ্ঠ বর্বরতায় পর্যবসিত করিতেছে, তাহাদের কবল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা যেন স্বয়ং বিজ্ঞানের নিকট আমাদের আহ্বান জানাই, বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতি আমার এই আবেদন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

## ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আমি একজন পুরাতন বন্ধু হারাইলাম। তাঁহার প্রতি সর্বদাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। ভারতের যে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি এই বৃহৎ পৃথিবীর মনীষী সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার জীবনের শেষ অংশ রোগরূপ মেঘে আবৃত থাকায় তাঁহার পক্ষে মানবীয় বাণিজ্যের অধিকাংশ পথ রুদ্ধ হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার বিপুল বিদ্যাবত্তার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহা ভুলিতে পারি না যে, আমাদের যুবকগণ দুই-তিন পুরুষ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এবং সর্ববিষয়ে জ্ঞান হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

## ডবলিউ. বি. ইয়েটস

মৃত্যুর কঠিন স্পর্শে ইয়েটসের স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না। সাহিত্যের দরবারে তিনি সমুন্নত মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আজ আমার সেই দিনের স্মৃতি মনে পড়িতেছে, যেদিন তরুণ কবি ইয়েটসের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সেই গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অম্লান থাকিবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি ইহাই স্মরণ করিব যে, আমার জীবনের সহিত বর্তমান ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৭ মাঘ ১৩৪৫

## লর্ড ব্রাবোর্ন

ব্যক্তিগতভাবে লর্ড ব্র্যাবোর্নের সহিত আমার পরিচয় সামান্যই ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বে এবং বাংলার লাট হিসাবে তিনি যে ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমি তাঁহার ব্যক্তিত্বের

প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি একজন সত্যিকার ভদ্রলোক ও ইংরেজ জাতির একজন সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধির মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিতেছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১২ ফাল্গুন ১৩৪৫

## • তাই-সু

এই শুভ মুহূর্তে আপনাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া অপরিসীম আনন্দলাভ করিতেছি। আপনি আপনার দেশ হইতে প্রেমের দূতরূপে আমাদের দেশে আসিয়াছেন। আপনাকে সংবর্ধনা করিতে গিয়া আপনার দেশ হইতে বহু বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তির ভিতর দিয়া তীর্থযাত্রিগণ তাঁহাদের ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মানবের শ্রেষ্ঠ দানের আদান-প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে এ দেশে আসিতেছেন, এই দৃশ্যই আমার স্মৃতিপটে পুনরায় উদিত হইতেছে। আপনাকে এবং আপনার মারফতে আপনার দেশকে আমরা আমাদের প্রেম নিবেদন করিতেছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৪ মাঘ ১৩৪৬

## • তুলসীদাস

তুলসীদাসের স্মৃতিবাসরে আজকে তোমরা আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করেছ— তুলসীদাসের সাহিত্যের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত নই, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠবে না। নৌকোর ধ্বজা তার গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য, যাত্রার সময়ে ধ্বজা তাকে সহায়তা করে না। আমি কেবলমাত্র তেমনি তোমাদের স্মৃতিবাসরে গৌরব বৃদ্ধিই করতে পারব— তুলসীদাসকে জানবার সহায়তা করতে পারব না।

ছোটো ছোটো কবিরা জন্মগ্রহণ ক'রে ভাষার গাঁথুনিকে ধীরে ধীরে শক্ত করে বেঁধে তোলে, সাহিত্যকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাহিত্য তাদের শক্তিসঞ্চারে যে-পরিমাণে পরিপুষ্টিলাভ করে তা দেশের জনসাধারণের কাছে ধরা পড়ে না। বড়ো কবিরা যখন তাঁদের অপূর্ব শক্তি নিয়ে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন মহীরূহ বনস্পতির মতো তখন তাঁদের কাব্যের মূল পৌঁছায় দেশের অন্তস্তলে। সমগ্র দেশকে তাঁরা রস পরিবেশন করে থাকেন; তাঁদের কর্মকুশলতা ভাষাকে নতুন ক'রে গড়ে তোলে, চিন্তা করবার প্রণালীকে নতুন রূপ দেয়, মানুষের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে নতুন প্রেরণায়।

তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিতে'র উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন বাল্মীকির রচনা থেকে; কিন্তু সেই উপকরণকে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ভক্তিতে রসসমৃদ্ধ করে নতুন করে দান করেছেন। সেইটেই তাঁর নিজস্ব দান— পুরাতনের আবৃত্তি নয়, তাতে তাঁর যথার্থ প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নতুন দৃষ্টি নিয়ে সেই পুরাতন উপকরণকে নতুন রূপ দান করে পরিবেশন করেছেন সমস্ত দেশকে। ভক্তিদ্বারা যে ব্যাখ্যায় তিনি রামায়ণকে নতুন পরিণতি দিয়েছেন সেটা সাহিত্যে অসাধারণ দান।

বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করছে, মানুষের রুচিতে পরিবর্তন এসেছে। তবু তুলসীদাসের দান যুগকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে। এই-যে সমস্ত কালকে অধিকার করা— এ সৌভাগ্য অল্পলোকেরই হয়। হিন্দীসাহিত্যে তুলসীদাসের দানকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে গণ্য করা হয়েছে এবং চিরকাল তাঁর সে গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাঁর রচনা

হিন্দী সাহিত্যে স্রোত বইয়ে দিয়েছে— পরিবর্তনের পথে নতুন গতিদান করেছে— হিন্দী ভাষার গৌরব বাড়িয়েছে। অনুভবে এর সত্যতা আমাদের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। আজ পর্যন্ত সেই স্রোত বিশিষ্ট পথ রচনা করে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বয়ে চলে এসেছে।

আমার মনে পড়ে বাল্যকালে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির দারোয়ানরা তুলসীদাসের রামায়ণ গান করত। তারা সেই গান থেকে যেন অমৃতলাভ করে সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করত— তাদের অবসর সময়কে রসময় করে তুলত। তাদের ভিতর দিয়ে আমি সর্বপ্রথম তুলসীদাসের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি।

বর্তমানে বাংলা এবং হিন্দী সাহিত্যে নতুন কাল এসেছে। সমস্ত পরিবর্তিত হতে চলেছে— আমাদের চিত্তের গতি বদলে গিয়েছে কালের প্রভাবে— মানুষের কাব্যরুচিকেও সে-গতি দিয়েছে বদলে। য়ুরোপের সাহিত্য আমাদের দেশের সাহিত্যকে এক নতুন পন্থায় নিয়ে গেছে— নতুন বিকাশের পথ খুঁজে দিয়েছে। তবু এ কথাও ভুললে চলবে না— যাঁদের শিক্ষিত বলি তাঁদের প্রভাব অতি সামান্য, জনসাধারণের চিত্ত হচ্ছে দেশের যথার্থ ভূমি; যেখানে স্বভাবত প্রকৃতির প্রেরণায় ফসল ফলে সে হচ্ছে সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র। সে-ক্ষেত্রে যথার্থ সৃষ্টির অধিকারের পথে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব ব্যাঘাত জন্মাতে পারবে না। দেশের সেই সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র থেকে তুলসীদাসের অধিকার কোনো কালেই যাবে না। তাঁর দান স্থায়ী মহান প্রতিভার বিকাশ নিয়ে কালের প্রভাবকে অতিক্রম করে চিরকাল দেশকে সমৃদ্ধ করবে।

রচনাকাল শ্রাবণ ১৩৪৭

বালুচর
২০ আশ্বিন ১৩৬০

# নাটক ও প্রহসন

# যোগাযোগ

## প্রথম অঙ্ক

বিপ্রদাস। কুমু, জানলার কাছে সমস্ত সকাল একলা বসে কী করছিস, বোন? মানিকতলার তেলকলের বাঁশি শুনছিস? আর দেখছিস ওই রাস্তার ধারে জলের কলের কাছে হিন্দুস্থানী মেয়ের সঙ্গে উড়ে বামুনের ঝগড়া!

কুমুদিনী। দাদা, আমি ভাবছি কলকাতাটা কী ভয়ানক বড়ো, আর আমি তার এক কোণে কতই ছোটো!

বিপ্রদাস। কলকাতা যে অচেনা, তাই তো এর বড়োর বড়াই রে। ওকে হৃদয় দিয়ে ঘিরে নিতে পারি নি রে বোন, পারি নে। আর আমাদের সেই নুরনগরের পৈতৃক ভিটে, সে এর চেয়ে কত ছোটো কিন্তু কত বড়ো। সেই যে পুব আকাশের দিগন্তে ঘন বন, সেই যে ধানের খেত পেরিয়ে বালুর চর, চর পেরিয়ে নীল জলের রেখা, কাশবন, বন-ঝাউয়ের ঝোপ, গুণ টানার পথ, জেলের নৌকোর খয়েরি রঙের পাল, বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে গোপীনাথজির মন্দির-চুড়ো, সে আমাদের নীল-আকাশ-ভরা শ্যামল নুরনগর, সে কত বড়ো কিন্তু কত আপন।

কুমুদিনী। কচি ছেলের কাছে মা যত বড়ো সে আমাদের ততই বড়ো, তবুও সে নিতান্ত সহজ আমাদের কাছে, নিতান্ত আপনার।

বিপ্রদাস। আর এই কলকাতাটা কোন্ দৈত্য-ইস্কুলের ক্লাসে ময়লা আকাশের বোর্ডের উপর জিয়োমেট্রির খোঁচা-ওয়ালা আঁক-কাটা প্রব্লেম। কিন্তু ভয় করলে চলবে না কুমু।

কুমুদিনী। করব না ভয়।

বিপ্রদাস। এই শক্ত প্রব্লেম নিয়েই পরীক্ষা পাস করতে হবে।

কুমুদিনী। নিশ্চয় পাস করব তোমার আশীর্বাদে। শক্তকেই জোরের সঙ্গে মেনে নেব। তুমি আমার জন্য ভেবো না দাদা।

বিপ্রদাস। কী জানিস, আমাদের বাপ-দাদার ছিল সেকেলে নবাবি চাল। আতসবাজির মতো সেদিনকার ঐশ্বর্যের ঝলক তাঁরা শূন্যে মিলিয়ে শেষ করে দিয়ে গেছেন। আমাদের জন্যে রেখে গেলেন পোড়া ঐশ্বর্যের ঋণের অঙ্গার। ওইটে সাফ করে যেতে হবে। ভালোই হয়েছে, কুমু, সেকালের বাবুগিরির নোংরা উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে আমরা আসি নি। কী বলিস কুমু?

কুমুদিনী। হাঁ দাদা, ভালোই হয়েছে।

বিপ্রদাস। আমরা সহ্য করতে জয় করতে এসেছি। ভোগ করতে আসি নি। সেই দেউলে সেকাল, সেই ভূতে পাওয়া হানাবাড়ি, তার চেয়ে অনেক ভালো এই পাষাণী কলকাতার নীরস অনাদর।

কুমুদিনী। ভালো, ভালো, ঢের ভালো। দাদা, তুমি ভাবছ আমাদের চিরদিনের ভিটে ছেড়ে এসে আমি কষ্ট পাচ্ছি— তাই মাঝে মাঝে আমাকে সাহস দিতে চাও! কিন্তু কষ্ট পেলেই বা কী! আমার ঠাকুর আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন, তিনি আমাকে ভুলতে দেবেন না বলেই। আমি ঐশ্বর্যের কাঙাল নই। আমি চাই তাঁকেই, আমার প্রাণের ঠাকুরকে। কিন্তু দাদা, আমাকে একটি কথা দিতে হবে।

বিপ্রদাস। কী বল্ কুমু।

কুমুদিনী। তুমি যখন কোনো দুঃখ পাবে আমার কাছে লুকোতে পারবে না। তোমার দুঃখের ভাগ নেব আমি; ঐশ্বর্যের ভাগ নাই-বা রইল!

বিপ্রদাস। আচ্ছা, তাই হবে।

কুমুদিনী। তা হলে এখনি তার প্রমাণ দাও।

বিপ্রদাস। হাতে হাতে তোর জন্যে দুঃখ বানাতে হবে নাকি?

কুমুদিনী। না, বানাবার দরকার নেই। আমি জানি আজ তোমাকে ব্যথা লেগেছে। আমার কাছে তুমি লুকোতে পারবে না।

বিপ্রদাস। আমার ব্যথার হাল খবরটা নাহয় তোর কাছ থেকেই শুনে নিই।

কুমুদিনী। আজ বিলেতের ডাকে তুমি ছোড়দাদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছ, সেই চিঠিতে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে।

বিপ্রদাস। তুই আমার সুখদুঃখের ব্যারোমিটার হয়ে উঠলি দেখছি।

কুমুদিনী। না দাদা, কথাটা উড়িয়ে দিয়ো না।

বিপ্রদাস। তাই তো বটে। প্রতিদিনের যত কাঁটা খোঁচা সবই তোর জন্যে জমিয়ে রাখতে হবে? এমন ভীষণ দাদাগিরি নাই-বা করলেম।

কুমুদিনী। আমাকে তুমি ছেলেমানুষ বলেই ঠিক করেছ। সত্যিই ছিলুম ছেলেমানুষ, নুরনগরে যতদিন পূর্বপুরুষের জীর্ণ ঐশ্বর্যের আওতায় ছিলুম। তার ভিত ভাঙতেই আজ একদিনেই যেন আমার বয়স বেড়ে গেছে। আজ আমাকে স্নেহের আড়ালে ভুলিয়ে রেখো না, আজ তোমার দুঃখের অংশ আমাকে দাও, তাতেই আমার ভালো হবে। বলো, ছোড়দাদা কী লিখেছেন।

বিপ্রদাস। সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, অত টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।

কুমুদিনী। দাদা, একটা কথা বলি, রাগ করবে না বলো।

বিপ্রদাস। রাগ করবার মতো কথা হলে, রাগ না করতে পারলে যে দম ফেটে মরব।

কুমুদিনী। না দাদা, ঠাট্টা নয়। শোনো আমার কথা। মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে, তাই নিয়ে—

বিপ্রদাস। চুপ, চুপ, তোর গয়নাতে কি আমরা হাত দিতে পারি?

কুমুদিনী। আমি তো পারি।

বিপ্রদাস। না, এখন তুইও পারিস নে। থাক্ সে-সব কথা। যা, তোর সংস্কৃত পড়া তৈরি করতে যা, অনেকদিন পড়া কামাই গেছে।

কুমুদিনী। না দাদা, 'না' বোলো না, আমার কথা রাখতেই হবে।

বিপ্রদাস। মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর শাসনে 'না'কে 'হাঁ' করতে হবে?

কুমুদিনী। আমার গয়না সার্থক হোক, দিক তোমার ভাবনা ঘুচিয়ে।

বিপ্রদাস। সাধে তোকে বলি বুড়ি! তোর গয়না নিয়ে আমার ভাবনা ঘোচাব আমি, এমন কথা ভাবতে পারলি কোন্ বুদ্ধিতে? ওই-যে দেওয়ানজি আসছেন।

কুমুদিনী। আমি তা হলে যাই।

বিপ্রদাস। না, যাবি কেন? এখন থেকে সব কথা তোর সামনেই হবে।

দেওয়ানজির প্রবেশ

বিপ্রদাস। ভূষণ রায় করিমহাটি তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিল, না? কত পণ দেবে?

দেওয়ানজি। বিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।

বিপ্রদাস। একবার ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্তা কইতে চাই।

দেওয়ানজি। বিশেষ কি তাড়া আছে?

বিপ্রদাস। তুমি তো জান সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।

দেওয়ানজি। তিনি তো ছেমোনুষ নন, বুঝবেন না কি টাকা না থাকলে টাকা দেওয়া যায় না?

বিপ্রদাস। সুবোধ দূরে গিয়ে পড়েছে। দরদ দিয়ে বোঝবার এলেকা সে পেরিয়ে গেছে,

বোঝাতে চেষ্টা করলে দ্বিগুণ অবুঝ হয়ে উঠবে— ভালো ফল হবে না।

দেওয়ানজি। বড়োবাবু, একটা কথা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। মধুসূদন ঘোষাল হঠাৎ গায়ে পড়ে আমাদের চাটুজ্জেগুষ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এল, আমাদের সব দেনা এক ক'রে এগারো লাখ টাকা কম সুদে তোমাকে ধার দিলে, একদিন হঠাৎ তার অপঘাত এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ের উপর, তার জন্যে তো সময় থাকতে প্রস্তুত হতে হবে।

বিপ্রদাস। অপঘাতের জন্যে দশ-বিশটা ডাণ্ডা ওঁচানো ছিল দশ-বিশ জন মহাজনের হাতে। তার জায়গায় একখানা মোটা ডাণ্ডা এসে ঠেকেছে কেবল ওই ঘোষালের হাতে। আগেকার চেয়ে এতে কি বেশি ভাবনার কারণ ঘটেছে?

দেওয়ানজি। তবে শোনো, সে তোমার জন্মের আগেকার কথা, স্বর্গীয় কর্তাবাবুর দপ্তরে তখন আমি মুনশিগিরিতে সবে ভর্তি হয়েছি। সেই সময়ে চাটুজ্জে আর ঘোষাল বংশে ভীষণ কাজিয়া বেধে গেল কার্তিক মাসে বিসর্জনের মিছিল নিয়ে। দু-পাঁচটা খুনোখুনি হয়ে গেল। তারই মকর্দমায় ঘোষালরা উচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। সেই বংশের ছেলে মধুসূদন একদিন রজবপুরে পাটের আড়তে আট টাকা মাইনের মুহুরিগিরিতে ঢুকে আজ ক্রোড়পতি হয়ে উঠেছে, সে হঠাৎ তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে আসে কেন?

বিপ্রদাস। সে তো বহু পুরোনো ইতিহাসের কথা।

দেওয়ানজি। বড়োবাবু, তোমার সরল মন, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না— তোমরা মেরেছিলে, ওরা মার খেয়েছিল। তোমাদের ইতিহাস ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু ওদের ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা।

বিপ্রদাস। তা হতে পারে, কিন্তু কী পরামর্শ দাও শুনি।

দেওয়ানজি। তুমি যে ছোটোবাবুর খেয়ালে আজ তালুক বিকিয়ে দিতে বসেছ সেটা ভালো কথা নয়— সমস্তই হাতে রাখতে হবে শেষ মারটা ঠেকাবার জন্যে। চুপ করে রইলে যে। কথাটা মনে নিচ্ছে না! তোমরা হচ্ছ রাজার বংশের ছেলে, আমরা মন্ত্রীর বংশের। বরাবর দেখে আসছি— যে ডালে দাঁড়াও সেই ডালে তোমরা কোপ মার, আর আমরা তলায় দাঁড়িয়ে বৃথা দোহাই পাড়ি। তোমাদেরই সর্বনেশে জেদ বজায় থাকে। শেষকালে ধুপ করে ঘারে এসে পড়ে ওই হতভাগা মন্ত্রীর ছেলেরই।

বিপ্রদাস। সুবোধ যখন এমন কথা লিখতে পেরেছে যে সম্পত্তিতে তার অর্ধেক অংশ বেচে তাকে টাকা পাঠাতে হবে, তখন এর চেয়ে বড়ো আঘাতের কথা আমি ভাবতে পারি নে। আমার সম্পত্তি আর তার সম্পত্তিতে আজ তার ভেদবুদ্ধি ঘটল! এক দেহকে দু ভাগ করবার কথা আজ সে ভাবতে পারলে! এ নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাই নে— আমি চললুম। এখনো আমার সকালবেলার অনেক কাজ বাকি আছে।

[ প্রস্থান

কুমুদিনী। কাকাবাবু, ছোড়দাদা এমন চিঠি কী করে লিখতে পারলেন?

দেওয়ানজি। সে কথা ভেবে লাভ কী মা! দুঃখ যার সহ্য করবার মহত্ত্ব আছে, ভগবান তারই ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা করেন। তোমার দাদা দুঃখ পাবেন জানি, কিন্তু হারবেন না সেও জানি।

কুমুদিনী। কাকাবাবু, মায়ের দেওয়া আমার গয়না তোমারই তো জিম্মেয় আছে। সেইগুলো বেচে তুমি দাদাকে ভাবনা থেকে বাঁচাও-না।

দেওয়ানজি। সর্বনাশ! তাঁর মনকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় তাকে কি আরো আগুন করে তুলতে হবে? শান্তিরক্ষা করার সহজ উপায় এ নয় মা।

কুমুদিনী। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে সংকটের দিনে কি কিছুই করতে পারি নে, কেবল কেঁদেই মরতে পারি?

দেওয়ানজি। সে কী কথা! দুঃখের দিনে তোমার দাদাকে তুমি যে সান্ত্বনা দিচ্ছ গয়না

দেওয়ার সঙ্গে তার কি তুলনা হয় মা? চোখ জুড়িয়ে আজ তুমি যে তাঁর সামনে আছ এই তো পরম সৌভাগ্য। বিধাতা আমাদের সর্বস্ব নিতে পারেন, কিন্তু তোমার দাদার সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে তিনি তোমারই হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন, সে কথা তুমি বুঝবে কী করে।

কুমুদিনী। এ কথা কাউকে বলি নি, আজ তোমাকেই বলছি, কাকাবাবু, জানি নে কেন কেবলই আমার মন বলছে আমারই আপন ভাগ্যে আমিই আমার দাদাকে রক্ষা করব— সেইজন্যেই এই সর্বনাশের দিনে আমি জন্মেছি। নইলে আমার কী দরকার ছিল এই সংসারে।

দেওয়ানজি। তোমার মুখখানি দেখলেই বুঝতে পারি মা, লক্ষ্মী আমাদের ঘরে বিদায় নেবার সময় তোমাকেই তাঁর প্রতিনিধি রেখে দিয়ে গেছেন। সব অভাব দূর হবে।

কুমুদিনী। পরশুদিন যখন দাদার মুখ বড়ো শুকনো দেখেছিলুম, আমি থাকতে পারলুম না, ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরকে বললুম— আমাদের দুঃখের দিন শেষ হল এই কথাটি বলো তুমি, প্রসন্ন যদি হয়ে থাক তবে তোমার পায়ে যেন আজ অপরাজিতার একটি ফুল দিয়ে প্রণাম করতে পারি। থালা থেকে চোখ বুজে নানা ফুলের মধ্যে যেই একটি ফুল তুলে নিলেম— দেখি সেটি অপরাজিতা। সেই দিন থেকে আমার বাঁ চোখ নাচছে। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে দাদাকে এই সুখবরটা দিই। কিন্তু দাদা যে এ-সব কিছুই মানেন না, তাই বলতে পারলুম না। কাকাবাবু, তুমিও কি ঠাকুর মান না?

দেওয়ানজি। সে কী কথা মা! যে ঠাকুর তুমি আর তোমার দাদার মতো মানুষ গড়েছেন তাঁকে মানব না এত অসাড় কি আমার মন?

কুমুদিনী। দাদা শুনলে হেসে বলবেন এ সমস্তই রূপকথা— কিন্তু কাল রাত্রে অরুন্ধতী তারার দিকে চেয়ে যখন বসে ছিলেম, আমি যেন বুকের মধ্যে শুনতে পেলেম দূরের রথের শব্দ— অন্ধকারের ভিতর দিয়ে রাজা আসছেন, আমাকে গ্রহণ করবেন, সব দুঃখ দূর করবেন। কাকাবাবু, দুটি পায়ে পড়ি আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো।

দেওয়ানজি। খুব বিশ্বাস করি। আমি যে কিনু আচার্যির কাছে বর্ষফল গণনা করাতে গিয়েছিলেম, তিনি কুষ্ঠি দেখে বললেন তুমি রাজরানী হবে, আর দেরি নেই। তবে যাই মা— আমার কাজ আছে। [ প্রস্থান

কুমুদিনী। বনমালী। ও বনমালী!

বনমালী ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কী দিদিমণি!

কুমুদিনী। ওই-যে ভিখারি যাচ্ছে। একটু থামতে বল্— আমার একখানা কাপড় নিয়ে আসি, ওকে দিতে হবে। আমার হাতে আজ কিছু নেই।

বনমালী। আমার কাছে আছে, আমি কিছু দিয়ে দিচ্ছি, কাপড়খানি কেন নষ্ট করবে?

কুমুদিনী। তুই দিলে আমার তাতে কী? তুই জানিস নে ওই ভিক্ষুকের কাছেও আমি ভিক্ষুক— ওর আশীর্বাদে আমার দরকার আছে!

[ প্রস্থান

বিপ্রদাসের প্রবেশ

বিপ্রদাস। বনমালী!

বনমালী। আজ্ঞে!

বিপ্রদাস। খবর পাঠিয়েছে কে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে, ডেকে দে তো।

বনমালীর প্রস্থান ও ঘটককে নিয়ে পুনঃপ্রবেশ

ঘটক। নমস্কার।

বিপ্রদাস। কে তুমি?

ঘটক। আজ্ঞে, কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন— আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।

বিপ্রদাস। কী প্রয়োজন?

ঘটক। পাত্রের খবর নিয়ে এসেছি, আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।

বিপ্রদাস। কে বলো তো?

ঘটক। বিশেষ করে পরিচয় দেবার দরকার হবে না— স্বনামধন্য লোক।

বিপ্রদাস। শুনি কী নাম?

ঘটক। রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষাল।

বিপ্রদাস। মধুসূদন!

ঘটক। ওই-যে আলিপুরে লাটসাহেবের বাগানবাড়ির এক পাড়াতেই মস্ত তিনতলা বাড়ি যাঁর।

বিপ্রদাস। তাঁর ছেলে আছে নাকি?

ঘটক। আজ্ঞে না, তিনি অবিবাহিত। আমি তাঁর কথাই বলছি।

বিপ্রদাস। তাঁর সঙ্গে বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।

ঘটক। পুরুষ মানুষের বয়েস, ওটা তুচ্ছ কথা। ঐশ্বর্যে বয়েস চাপা পড়ে যায়। এ কথা জোর করেই বলব এমন পাত্র সমস্ত শহরে আর একটিও মিলবে না।

বিপ্রদাস। কিন্তু পাত্রী তো মিলবে না আমার ঘরে।

ঘটক। ভেবে দেখবেন, আমাদের রাজাবাহাদুর এবার বছর না পেরোতেই মহারাজা হবেন, এটা একেবারে লাটসাহেবের নিজ মুখের কথা, পাকা খবর।

বিপ্রদাস। তুমি তাঁদের ওখান থেকে কথা নিয়ে এসেছ নাকি?

ঘটক। তাঁর মতো লোকের তো ভাবনা নেই, ভাবনা আমাদেরই। এ শুধু আমার ব্যাবসার কথা নয়, এ আমার কর্তব্য— সৎপাত্রের জন্যে উপযুক্ত পাত্রী জুটিয়ে দেওয়া একটা মস্ত শুভকর্ম।

বিপ্রদাস। কর্তব্যের কথাটা আরো অনেক আগে চিন্তা করলেই ভালো করতে। এখন সময় পেরিয়ে গেছে।

ঘটক। সময় আমাদের হাতে নেই, আছে গ্রহদের হাতে। তাঁদেরই চক্রান্তে এতদিন পরে রাজাবাহাদুরের মাথায় ভাবনা এসেছে যে, যখন মহারাজ পদবির সাড়া পাওয়া গেল তখন মহারানীর পদটা আর তো খালি রাখা চলবে না। আপনাদের গ্রহাচার্য বেচারাম ভট্চাজ দূর সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠী দেখা গেল। লক্ষণ ঠিকটি মিলেছে। দেখে নেবেন, আমি বলেই দিচ্ছি, এ সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ, কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

বিপ্রদাস। বৃথা সময় নষ্ট করছ। প্রজাপতির কাজ প্রজাপতিই সেরে নেবেন— আমি এর মধ্যে নেই।

ঘটক। আচ্ছা, তাড়া নেই, ভালো করে ভেবে দেখুন। আমি আসছে শুক্রবার এসে আর-একবার খবর নিয়ে যাব।

[ প্রস্থান

দেওয়ানজির প্রবেশ

বিপ্রদাস। একজন ঘটক এসেছিল।

দেওয়ানজি। এখানে আসবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছে।

বিপ্রদাস। আমি ওকে বিদায় করে দিয়েছি।

দেওয়ানজি। প্রস্তাবটা শুনেই আমার বুকটা লাফিয়ে উঠেছিল। ভাবলুম হঠাৎ বুঝি কূল পাওয়া গেল। কিন্তু বড়ো বেশি লোভ যখন হয় তখনি বড়ো বেশি ভুল করবার আশঙ্কা। তাই চুপ করে গেলুম, ভাবলুম, বড়োবাবু শুনে কী বলেন দেখা যাক।

বিপ্রদাস। নিজেদের উদ্ধার করবার লোভে কুমুকে ভাসিয়ে দিই যদি তা হলে কি আর বেঁচে সুখ থাকবে?

দেওয়ানজি। ওর মধ্যে ভয়ের কথা আছে। ঘটককে ফিরিয়ে দিলে পাত্রের সেটা কি সইবে? ওর হাতে যে আমাদের মারের অস্ত্র।

বিপ্রদাস। নিজের অন্তরের মারই সব চেয়ে বড়ো মার, সেই লোভের মারকেই সব দিয়ে ঠেকাতে হবে।

দেওয়ানজি। কথাটা নিছক লোভের কথা নয় তাও বলি। ওই মানুষটি একটা জাল তো জড়িয়েছে, সে ঋণের জাল, তার উপরে সম্বন্ধের ফাঁস যদি আঁট করে লাগায় তা হলে অন্তরে বাইরে প্রাণ নিয়ে টান পড়বে। এটা ওর কিস্তিমাতের শেষ চাল কি না সেও তো ভেবে পাচ্ছি নে।

কুমুর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদা, কেন তোমরা আমার জন্যে মিছে ভাবছ?

বিপ্রদাস। কী ভাবছি?

কুমুদিনী। আমি এই ঘরেই আসছিলুম— এমন সময়ে ঘরের বাইরে চটিজুতো আর ছাতা দেখে থেমে গেলুম। বারান্দা থেকে সব কথা আমি শুনিছি।

বিপ্রদাস। ভালোই হয়েছে। তা হলে জেনেছ আমি ঘটকের কথায় কান দিই নি।

কুমুদিনী। আমি কান দিয়েছি দাদা।

বিপ্রদাস। ভালাই তো। কান দেবার আর মত দেবার মতো বয়স তোর এল। এ প্রস্তাবে তোর কথাই শেষ কথা। বাবা যখন ছিলেন, তোর বয়স দশ, বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েই গিয়েছিল। হয়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা থাকত না। আজ তো তা আর সম্ভব নয়। রাজা মধুসূদন ঘোষালের কথা আগেই নিশ্চয় শুনেছিস। বংশমর্যাদায় খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাত। আমি তো রাজি হতে পারলেম না। এখন তোরই মুখের একটা কথা পেলেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস নে কুমু।

কুমুদিনী। না, লজ্জা করব না। ইতস্তত করবারও সময় নেই। যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হয়েই গেছে।

বিপ্রদাস। কেমন করে স্থির হল?

কুমু নীরব

বিপ্রদাস। ছেলেমানুষি করিস নে।

কুমুদিনী। তুমি বুঝবে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষ করছি নে।

বিপ্রদাস। তুই তো তাঁকে দেখিস নি।

কুমুদিনী। তা হোক। আমি যে ঠিক জেনেছি।

বিপ্রদাস। দেখ্ কুমু, চিরজীবনের কথা, ফস্ করে খেয়ালের মাথায় পণ করে বসিস নে।

কুমুদিনী। না দাদা, খেয়াল নয়। এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি আর-কাউকেই বিয়ে করব না।

বিপ্রদাস। আমি তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি নে।

কুমুদিনী। তুমি বুঝতে পারবে না দাদা। আমার যাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে তিনি আমার অন্তর্যামী।

দেওয়ানজি। বড়োবাবু, উনি যাঁর কথা শুনতে পান আমরা তাঁর কাছে কালা। এতে আমাদের হাত দেওয়া ভালো হবে না। আমি মনে বিশ্বাস রাখি ওঁর ঠাকুর ওঁকে ফাঁকি দেবেন না।

বিপ্রদাস। কিছুদিন সবুর করে দেখবি নে কুমু? যদি তোর ভুল হয়ে থাকে?

কুমুদিনী। না দাদা, হয় নি ভুল।
বিপ্রদাস। তা হলে আমি কথা পাঠিয়ে দিই?
কুমুদিনী। হাঁ, পাঠিয়ে দাও।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

অখিল। নবুকাকা!
নবগোপাল। কী রে অখিল?

অখিল। তোমাদের বর বয়সেও যেমন শিবের সমতুল্য, তার ব্যবহারটাও দেখি সেই রকমের। এল বিয়ে করতে, সঙ্গে আনলে রাজ্যের ভূতপ্রেতের দল, ওর যত-সব ফিরিঙ্গি ইয়ারের ফৌজ। গ্রামটাকে শোধন করতে শেষকালে গোবর মিলবে না। গোরুগুলোকে বেবাক খেয়ে নিকেশ করে না দেয়।

নবগোপাল। দেখ্‌-না অখিল, অঘ্রানের সাতাশে পড়েছে বিয়ের দিন, এখনো দিন দশেক বাকি। এমন সময়ে লোকমুখে জানা গেল রাজা আসছে দলবল নিয়ে। বিয়ে নয় যেন লড়াই করতে আসছে— একখানা চিঠি লিখেও খবর দেয় নি। মনে ঠাউরেছে, ভদ্রতা করবে সাধারণ লোকে, গুমর করে অভদ্রতা করবে রাজা-রাজড়া।

অখিল। সে কী খুড়ো, রাজা বলো কাকে? ও কিসের রাজা? সরকার বাহাদুর ওকে রাজার মুখোশ পরিয়ে এক চোট হেসে নিয়েছেন। ও সরকারি যাত্রার দলের সঙ রাজা। সত্যিকার রাজা তো আমাদের বড়োবাবু, সেইজন্যেই মিথ্যে রাজার খেতাবে ওঁর দরকার হয় না।

নবগোপাল। আমার দাদা তো মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, স্থির করলেন স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করে আনা চাই। আমি বললেম এ হতেই পারে না। ও যখন অগ্রাহ্য করে খবরই দিলে না তখন আমরা গায়ে পড়ে গিয়ে ওর খবর নেব এ চলবে না। ওঁর গাড়ির কোচম্যানকে বলে দিয়েছি কম্বলমুড়ি দিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকতে। দাদা বলে কি না, অভদ্রতায় পাল্লা দেওয়া আমাদের বংশের ধারা নয়— আমরা জিতব ভদ্রতায়। আমি জোড় হাত করে বললুম, ভদ্রতারও বাড়াবাড়ি ভালো নয়। অতি দর্পে হতা লঙ্কা সত্য হতে পারে, কিন্তু অতি অদর্পে হত নুরনগরই কি মিথ্যে হবে?

অখিল। খুড়ো, তুমি ভাবছ বড়োবাবুকে তুমি ঠেকাতে পেরেছ? তিনি রাত দশটার পরে ঘোড়ায় চড়ে সাত ক্রোশ পথ পেরিয়ে স্টেশনে গিয়ে হাজির। রাত্তির একটার পর গাড়ি এল, তার পরে ভাবী ভগ্নীপতির সঙ্গে তোমার দাদার যে সদালাপ হল সে স্টেশনমাস্টারের কাছেই শুনতে পাবে।

নবগোপাল। কী রকম শুনি!

অখিল। সেলুন থেকে রাজা নামলে বুক ফুলিয়ে দলবল সমেত। বড়োবাবুকে দেখে সংক্ষেপে একটা শুকনো নমস্কার করে বললে, 'আপনার আসবার কী দরকার ছিল? আমি তো খবর দিই নি।' বড়োবাবু বললেন, 'আমার দেশে এই তোমার প্রথম আসা, অভ্যর্থনা করব না?' রাজা বলে উঠল, 'ভুল করছেন, আপনার দেশে এখনো আসি নি। আসব বিয়ের দিনে।' বড়োবাবু বুঝলেন, সুবিধে নয়, বললেন, 'খাওয়াদাওয়ার জিনিসপত্র তৈরি, বজরা আছে ঘাটে।' লোকটা জবাব দিলে, 'কিছু দরকার হবে না। আমার স্টীম লঞ্চ প্রস্তুত। একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমারই পূর্বপুরুষের জন্মভূমিতে, আপনার দেশে নয়। সাতাশে তারিখে সেখানে যাবার কথা।' সেই রাত্রেই বড়োবাবু ফিরে এলেন— তার পর দিন থেকে জ্বর, গায়ে ব্যথা, একেবারে শয্যাগত।

নবগোপাল। কী আর বলব! সাত জন্মের পাপে কন্যাকর্তা হয়ে জন্মেছি, অযোগ্যের ল্যাজের

ঝাপটা চুপ করেই সইতে হয়। তা হোক, তবু এখান থেকে যাবার আগেই ওঁর আড়তদারি দেমাকের বারো আনাই নিজের পেটে হজম করে ওঁকে ফিরতে হবে— সহজে ছাড়ব না। দেওয়ানজি আসছেন।

দেওয়ানজির প্রবেশ

নবগোপাল। দেওয়ানজি, ব্যাপারখানা দেখছেন তো।

দেওয়ানজি। দেখবার জন্যে চশমা লাগাবার দরকার হবে না, ব্যাপারটা প্রকাণ্ড বড়ো হয়ে উঠেছে।

নবগোপাল। আমরা ভাবছি আপনাদের জামাইয়ের পদগৌরবের উপযুক্ত নাগরা জুতো মিলবে কোন্ দোকানে!

দেওয়ানজি। জামাইবাবুর খুব বড়ো মাপের পা বটে, এরই মধ্যে আমাদের নুরনগরের সীমানা অনেকখানিই পদতলস্থ করেছেন। আজ চাটুজ্জেরাই হল অপদস্থ।

নবগোপাল। কী রকম?

দেওয়ানজি। ওদের পূর্বপুরুষের নামের দিঘি ঘোষালদিঘি, তার চার দিক ঘিরে তাঁবু গেড়ে বেড়া তুলে সেটাকে মধুপুরী নাম দিয়ে জেঁকে বসেছেন।

নবগোপাল। সে তো জানি। বেশ বোঝা গেছে বিয়ে করতে আসাটা উপলক্ষ, দেমাক করতে আসাই লক্ষ্য। আমাদের প্রজারা তো ক্ষেপে উঠেছে।

দেওয়ানজি। দাদাবাবু, তুমিই তো তাদের বেশি করে ক্ষেপিয়ে তুলেছ।

নবগোপাল। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে উনি ধুম করে আইবুড়ো ভাতের নেমন্তন্ন জারি করলেন বিশ গাঁয়ে। গাছতলায় গর্ত করে বড়ো বড়ো উনুন পাতা হল, তার চার দিকে নানা বহরের হাঁড়ি হাড়া মালসা কলসি জালা— সারি সারি গোরুর গাড়িতে করে দুদিন ধরে আসতেই লেগেছে আলু বেগুন কাঁচকলা, ঘি ময়দা ক্ষীর সন্দেশ। আমি ঘরে ঘরে জানিয়ে দিয়েছি, খবরদার কেউ যেন ওর পাত চাটতে না আসে!

দেওয়ানজি। তা, দু-চার জন ভিখিরি আর ভিন্ গাঁয়ের লোক ছাড়া আর কেউ আসে নি খেতে। রোশনাই জ্বলল, রসুনচৌকি বাজল, শীতের রাত, আটটা নটা দশটা বাজল, গোবর দিয়ে নিকোনো পাতা-পাড়া প্রকাণ্ড আঙিনা শূন্য ধূ ধূ করতে থাকল, জনপ্রাণী আসে না।

নবগোপাল। সেই সময়টাতে আমাদের দুই বাড়ির চারটে হাতিকে গলার ঘণ্টা ঢংঢঙিয়ে রাস্তার সামনে দিয়ে টহল করানো হয়েছিল তো?

দেওয়ানজি। হয়েছিল। দাদাবাবু, তোমার কথা শুনে এই কাজটি হয়েছে— কিন্তু আমার মন ভালো নেই। শুনেছি ওদের পরামর্শ হয়েছে বিয়ের দিনে বরযাত্ররা আলো নিবিয়ে বাজনা থামিয়ে চুপচাপ আসবে, কেউ আমাদের ওখানে জলস্পর্শ করবে না।

নবগোপাল। অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে। খেল কী না খেল লক্ষ্যই কোরো না, আর যাই কর সাধতে যেয়ো না।

দেওয়ানজি। আমাদের তো একদিনের হারজিতের সম্বন্ধ নয় দাদাবাবু। মেয়ে যে দেওয়া হচ্ছে ওদের ঘরে, চিরদিনের জন্যেই যে হার মেনে থাকতে হবে।

নবগোপাল। কিচ্ছু ভয় কোরো না দেওয়ানজি। নরমের জোর সব চেয়ে বড়ো জোর, আমাদের ভালোমানুষ কুমুর কাছে ওই গোঁয়ারকে পোষ মানতেই হবে, এ আমি বলে দিলুম।

বিপ্রদাসের প্রবেশ। অখিলের প্রস্থান

নবগোপাল। এ কী! বড়োবাবু যে! ডাক্তার যে তোমাকে বিছানা থেকে এক পা নড়তে বারণ করেছেন!

বিপ্রদাস। যখন শেষের সে দিন ভয়ংকর আসবে তখন নড়ব না, তোমাদের ভাবতে হবে

না। এখন বেঁচে আছি। দেখেশুনে বেড়াবার মতো দেহের অবস্থা নয়, তাই তোমাদের কাছে খবর নিতে এলুম।

নবগোপাল। সব চেয়ে বড়ো খবরটা এই যে, জামাইবাবু আমাদের কাশীর উপর আড়ি করে ব্যাসকাশী বানাতে বসেছেন। ঘোষালদিঘির পানা সব তোলানো হয়ে গেল। ঘাটে একজোড়া পাল খেলাবার বিলিতি নৌকা— একটার গায়ে লেখা মধুমতী, আর-একটার গায়ে মধুকরী। রাজাবাহাদুরের তাঁবুর সামনে হলদে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা নাম লেখা মধুচক্র। ঘাটের উপরেই নিমগাছটার গায়ে কাঠের পাটায় লেখা মধুসাগর। কলকাতা থেকে ত্রিশটা মালী এসে লেগেছে এক রাত্তিরে বাগান বানিয়ে ফেলতে, যার নাম হয়েছে মধুকুঞ্জ। বাগানের সামনে লোহার গেট বসেছে, নিশেন উড়ছে, তাতে লেখা মধুপুরী। আর লাল-উর্দি-পরা তকমা-ঝোলানো পাইক বরকন্দাজ পায়ে পায়ে নুরনগরের বুকে বিলিতি বল্লমের খোঁচা দিয়ে দিয়ে চলেছে।

বিপ্রদাস। ধৈর্য ধরতে হবে নবু। এই সেদিন মধুসূদন ফাঁকা খেতাব পেয়েছে রাজা, এখানে এসে সাধ মিটিয়ে ফাঁকা রাজত্বের খেলা খেলে যেতে চায়। তাতে মনে মনে হাসতে চাও হেসো, কিন্তু দয়া কোরো, রাগ কোরো না।

নবগোপাল। তুমি সহ্য করতে পার দাদা, কিন্তু প্রজারা সইতে পারছে না। তারা বলছে ওদের উপর টেক্কা দিতে হবে, তাতে যত টাকা লাগে লাগুক।

বিপ্রদাস। নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা, ওটা ইতরের কাজ। কী বল দেওয়ানজি?

দেওয়ানজি। তোমার মুখেই এমন কথা শোভা পায় বড়োবাবু, আমাদের ছোটো মুখে মানায় না।

নবগোপাল। চতুর্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশির ভাগ মানুষ গড়েছেন। কেবল বড়ো বড়ো কথা বলবার জন্যেই তাঁর চারটে মুখ। পৃথিবীতে সাড়ে পনেরো আনা লোকই যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।

বিপ্রদাস। তাতেও পেরে উঠবে না ভাই, তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ সেরে নিই, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে অনুষ্ঠান করা যাবে। ওরা রাজা হয়েছে, করুক আড়ম্বর; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম আমাদের।

নবগোপাল। দাদা, পাঁজি ভুলেছ, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে? মনে রেখো তোমার প্রজাদের কথা— ওই আছে তিনু সরকার তোমার তালুকদার, আছে ভাদু পরামানিক, কমরদ্দি বিশ্বেস, পাঁচু মণ্ডল— এদের ঠাণ্ডা করতে চাও সামবেদের মন্ত্র আউড়িয়ে? যাজ্ঞবল্ক্যের নাম শুনলেই কি এদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে? এদের বুক যে ফেটে যাচ্ছে। তুমি যাও শুতে, মিথ্যে ভেবো না। যা কর্তব্য আমরা তার কিচ্ছু বাকি রাখব না।

[ নবগোপালের প্রস্থান

কুমুর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদা!

বিপ্রদাস। কী কুমু!

কুমুদিনী। এ-সব কী শুনছি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল

বিপ্রদাস। লোকের কথায় কান দিস নে বোন।

কুমুদিনী। কিন্তু ওঁরা এ-সব কী করছেন? এতে কি তোমাদের মান থাকবে?

বিপ্রদাস। ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস। পূর্বপুরুষের জন্মস্থানে আসছে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটা স্বতন্ত্র করে দেখিস।

অখিলের প্রবেশ

অখিল। জ্যাঠামশায়, একটা পরামর্শ দাও।

বিপ্রদাস। কেন অখিল, কী হয়েছে?

অখিল। সঙ্গে এক পাল সাহেব— দালাল হবে, কিংবা মদের দোকানের বিলিতি শুঁড়ি— কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো দুশো কাদাখোঁচা মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চলেছে চন্দনীদহের বিলে। শীতের সময় সেখানে হাঁসের মরসুম— রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যে হবে— অহিরাবণ, মহীরাবণ, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ, ইস্তিক কুম্ভকর্ণের পর্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত, প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধরে যাবার মতো।

বিপ্রদাস নীরব

অখিল। তোমারই হুকুমে ওই বিলে কেউ শিকার করতে পারে না। সেবার তো জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলে। তখন আমরা ভয় করেছিলুম তোমাকেই পাছে সে রাজহাঁস বলে ভুল করে। লোকটা ছিল ভদ্র, মেনে গেল নিষেধ। কিন্তু এরা কেউ গোমৃগদ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বলো একবার নাহয়—

বিপ্রদাস। না, না, কিছু বোলো না।

কুমুদিনী। কাকাবাবু, বারণ করে পাঠাও।

দেওয়ানজি। কী বারণ করব?

কুমুদিনী। পাখি মারতে।

বিপ্রদাস। ওরা ভুল বুঝবে, কুমু, সইবে না।

কুমুদিনী। তা বুঝুক ভুল। মান অপমান শুধু ওদের একলার নয়।

বিপ্রদাস। রাগ করিস নে কুমু। আমিও একদিন পাখি মেরেছি, তখন অন্যায় বলে বুঝতেই পারি নি। এদেরও সেই দশা।

কুমুদিনী। জীবহত্যা করে এরা যদি আমোদ পায় করুক আমোদ। কিন্তু এদের কি ভদ্রতাও নেই? তোমার অনুমতিও নিল না! এত অবজ্ঞা তোমাদের 'পরে!

বিপ্রদাস। এ ভদ্রতার কথা নয়, কুমু, হয়তো আত্মীয়তার দাবি।

কুমুদিনী। আত্মীয়তা! আমাকে ছেলেমানুষের মতো ভোলাচ্ছ কেন? আমার ঘর থেকে কোনোদিন একখানা বই তুমি সরাও না আমাকে না জিজ্ঞাসা করে। আত্মীয়ের কাছে ভদ্র হবার দরকার নেই এ তো কোনোদিন তুমি আমাকে বল নি! কাকাবাবু!

দেওয়ানজি। কী মা!

কুমুদিনী। আমি শুনতে পেলুম, দাদা ওঁদের আনবার জন্যে স্টেশনে গিয়েছিলেন। কেন তোমরা যেতে দিলে?

দেওয়ানজি। আমরা তো জানতুমই না।

কুমুদিনী। দাদা গিয়েছিলেন অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে আমারই জন্যে। তার পরে এঁরা কি একবার দেখতে এসেছিলেন কাকাবাবু?

দেওয়ানজি। না।

কুমুদিনী। কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকে অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন! দাদা কেন নিজেকে খাটো করলেন আমার জন্যে! আমার মরণ হল না কেন?

বিপ্রদাস। কুমু, গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছি আমরা জাতে আলাদা। এখনো যদি বলিস এ বিয়ে আমি ভেঙে দিতে পারি!

দেওয়ানজি। চুপ করো বড়োবাবু, এ-সব কথা এখন নয়, সময় বয়ে গেছে।

বিপ্রদাস। না দেওয়ানজি, না— সময় কাকে বলছ তুমি! এই পাঁজির লগ্ন! কুমুর সমস্ত

জীবন যে তার চেয়ে অনেক বড়ো সময় নিয়ে।

দেওয়ানজি। সমাজে—

বিপ্রদাস। সমাজকে ভয় কর তোমরা, আমি তার চেয়ে ভয় করি অধর্মকে। আমার সমাজ বাঁচাবার জন্যে আমি মারব কুমুকে! কুমু!

কুমুদিনী। কী দাদা?

বিপ্রদাস। এখনো বল্ তুই। তোর মত পেলে এ বিয়ে ভাঙতে আমি একটুও দ্বিধা করব না।

কুমুদিনী। আমি তো জানি, এ বিয়ে হয়ে গেছে প্রথম থেকেই। তোমার ঘটক ঘটকালি করে নি, যিনি করেছেন তাঁকে প্রণাম করে ভালো মন্দ সব মেনে নিলুম। দাদা, রাগ করে তোমার আশীর্বাদ থেকে আমাকে একটু[ও] বঞ্চিত কোরো না।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### মেয়ের দল

প্রথম। দেখ্ ভাই গঙ্গাজল, আমাদের নতুন রানী[র] বয়েস বড়ো কম নয়, বোধ হয় পলাশির যুদ্ধের সময় জন্মেছিল।

দ্বিতীয়া। একটু পোস্টাই নেই গায়ে। বুঝি শিবের মতো বর পাবার জন্যে এতদিন না খেয়ে তপিস্যে করছিল।

প্রথমা। বর তো জুটল। এখন আমাদের রাজবাড়ির ক্ষীরসর পেটে পড়লে দুদিনে গড়নটা মোলায়েম হয়ে আসবে।

তৃতীয়া। হাঁগা রানী, গায়ে কী রঙ মাখ তুমি? বিলেত থেকে তোমার দাদা বুঝি কিছু আনিয়ে দিয়েছে!

দ্বিতীয়া। ওলো, শুনেছি মেমসাহেবদের ঘরে আঁতুড়-ঘরে মদে চুবিয়ে চান করায়, রঙ ধব্‌ধবে হয়ে ওঠে। এদের ঘরে বিলেতে আনাগোনা আছে কি না, এরা সব জানে।

তৃতীয়া। আচ্ছা ভাই, বউরানীর যে গা-ভরা গয়না দেখছি এ কি সব বাপের বাড়ি থেকে এনেছে?

প্রথমা। তাই তো শুনতে পাই। কিন্তু দেখ্-না, গয়নাগুলোর গড়ন দেখ্, কোন্ মান্ধাতা আমলের ফ্যাশান।

দ্বিতীয়া। ওই-যে আছেন মোতির মা— ক'নে বাড়িতে আসা অবধি তাকে দিনরাত আগলে আগলে বেড়াচ্ছে।

তৃতীয়া। বউরানী, দেখে নাও, উনি হচ্ছেন তোমার ছোটো জা, তোমার দেওর নবীনের বউ। এতদিন ঘরকন্নার সমস্ত ভার ছিল ওঁরই হাতে, এখন তুমি এসেছ ঘরের সত্যি গিন্নি হয়ে, তাই মেকি গিন্নির মাথায় মাথায় ভাবনা পড়েছে।

প্রথমা। খোশামোদ করে তোমাকে হাত করবার চেষ্টায় লেগেছেন, এই কথাটা মনে রেখো।

দ্বিতীয়া। খুব আদর দেখাচ্ছেন কিন্তু শেষকালে তার দাম চুকিয়ে নেবেন।

তৃতীয়া। চল্ ভাই, বউয়ের ভাগ নিয়ে ওর সঙ্গে মামলা বাধিয়ে লাভ কী বল্। ফুলশয্যের নেমন্তন্নে এসেছি— আমোদ আহ্লাদ করব— বাতি নিববে, আমরাও চলে যাব। তার পরে দুই জায়ে মিলে রাজ্যি ভাগ চলবে, দেখব কার ভাগে কতটা পড়ে।

প্রথমা। গঙ্গাজল, আর নয়। ওই এল। মান বাঁচাতে চাস তো দৌড় মার্। দেখ্-না ওর মুখের ভাবখানা, যেন হাতে মাথা কাটবে।

[ কুমু ব্যতীত সকলের প্রস্থান

কুমুদিনী। ঠাকুর! কোথায় আমায় আনলে!

মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। মন কেমন করছে ভাই! ওই-সব মেয়েদের কথায় কান দিয়ো না। প্রথম কিছুদিন তোমার উপর উপদ্রব চলবে, টেপাটেপি বলাবলি করবে, তার পরে কণ্ঠ থেকে ক্রমে ক্রমে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে। বউরানী, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। কিন্তু ছোটো জা, সম্পর্কে ছোটো। আমার কাছে মন খুলে কথা বোলো দিদি, নতুন চেনা বলে যেন বাধো-বাধো না করে।

কুমুদিনী। তোমাকে মনে হয় না নতুন চেনা। আপনাকে তোমার চিনিয়ে নিতে দেরি হয় না ভাই, তুমি সহজে ভালোবাসতে পার, সে কথা গোড়া থেকেই বুঝেছি।

মোতির মা। কী কথা ভাবছ আমাকে বলো ভাই, তোমার মন খোলসা হয়ে যাক।

কুমুদিনী। ক'দিন ধরে আমি ঠাকুরকে কেবলই বলেছি, আমি তোমাকে বড়ো বিশ্বাস করেছি, তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙো না।

মোতির মা। বুঝতে পারি ভাই, তোমার কী যে হচ্ছে মনে। আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তো ছিলুম কচি খুকি। মন তৈরিই হয় নি, মনের মধ্যে কিছুতেই কোনো খটকাই ছিল না। ছোটো ছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ্ করে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি করেই আমাকে এক গ্রাসে গিলেছে, কোথাও কিছু বাধে নি। সবাই বললে ফুলশয্যে, হয়ে গেল ফুলশয্যে, সে একটা খেলা। কিন্তু তোমার এই ফুলশয্যে নিয়ে তোমার বুক যে কেঁপে উঠেছে, দোষ দেব কাকে! পর আপন হতে সময় লাগে। সে সময় যে কেউ দিতে চায় না। টাকা পেতে বড়োঠাকুরের কত যুগ লেগেছে, আর মন পেতে তার যে দুদিন সবুর সইবে না। যেমনি হুকুম অমনি হাজির!

কুমুদিনী। আমি তো মন দিতে সম্পূর্ণ তৈরি হয়েই এসেছিলুম এঁদের ঘরে, কিন্তু সে মন কি এমনি করেই নিতে হয়— এত অশ্রদ্ধা ক'রে, ছি ছি, এমন অপমান ক'রে! যে ভালোবাসা আমি ওঁকে দিতে এলুম, সে যে আমার ঠাকুরের প্রসাদ থেকে নেওয়া, বিয়ের আগে থেকেই পদে পদে তার অসম্মান ঘটেছে। এমন ব্যবহার যে কোথাও হতে পারে সে আমি মনে করতেও পারি নি, এ আমার একটুও জানা ছিল না, তাই আমি এত নির্ভয়ে এত বিশ্বাস নিয়েই এসেছিলেম।

মুখে কাপড় দিয়ে কান্না

মোতির মা। কেঁদো না, দিদি, কেঁদো না। আজকের দিনে তোমার চোখের জল এখানকার গৃহলক্ষ্মী সইবেন না।

কুমুদিনী। আজকে নিজের জন্যে আমার কান্না অন্যায় সে আমি জানি। আজকে সব কান্না আমার দাদার জন্যে। আজ তিনি রোগে বিছানায় পড়ে, সেই বিছানা থেকে তিনি আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।

বুকের কাপড় থেকে টেলিগ্রাম বের করলে

তিনি আশীর্বাদ করেছেন, 'ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।' আজ সকাল থেকে সেই আশীর্বাদ আমি বুকে আঁকড়ে ধরে আছি— না, আজ আমি ভয় করব না, কোনো ভয় করব না। ঠাকুর, আজকের মতো আমাকে বল দাও।

মোতির মা। একটা কথা মনে রেখো রানীদিদি, বড়োঠাকুর তোমাকে ভালোবেসেছেন। ওঁর জীবনে এটা এমন অসম্ভব আশ্চর্য ঘটনা যে উনি ঠিকমতো করে তাকে মানিয়ে নিতে পারছেন না, তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে ওঁর ব্যাবসাদারের ভাষা। আজ তো বাড়ি ভরা মেয়ে— তবু কতবার কাজকর্ম ফেলে ঘুরে ফিরে বাড়ির মধ্যে এসেছেন, কোনো ছুতোয় একবার তোমাকে

দেখে যাবার জন্যে। মেয়েরা হাসাহাসি করেছে। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। ঠিক তোমাদের চিঠির দিনেই উনি তারে খবর পেয়েছেন, তিসি চালানের কাজে ওঁর লাভ হয়েছে বিশ লাখ টাকা,— সেই টাকায় তোমারই দাম বেড়ে গেছে, বিশ্বাস হয়েছে তুমি পয়মন্ত। এই সুযোগ নিয়ে তুমি যদি আপনার আসন জোর দখলে রাখতে পার উনি সাহস করবেন না তোমাকে অপ্রসন্ন করতে। ওই দেখো, বলতে বলতেই দেখছি যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়।— এখনো সন্ধে হতে বাকি আছে। আমি যাই ভাই!

আঁচল ধরে টেনে

কুমুদিনী। যেয়ো না, যেয়ো না তুমি।

মোতির মা। না, আমার থাকা ভালো হবে না।

[ দ্রুত প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। লোকজন বড়ো যাওয়া-আসা করছে, পর্দাটা ফেলে দিই, কী বলো!

কুমু নিরুত্তর। মধুসূদন কী কথা বলবে ভেবে পাচ্ছে না।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

মধুসূদন। শীত করছে না?

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। ঠাণ্ডা পড়েছে বৈকি। সাবধান হওয়া ভালো।

একটা বিলিতি কম্বল কতকটা নিজের এবং কতকটা কুমুর পায়ে চাপা দিয়ে পাশাপাশি বসল।
কুমুদিনী হঠাৎ কম্বলটা নিজের পায়ের থেকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, আপনাকে সামলিয়ে নিলে।

তোমার হাত আঁচলে ঢাকা কেন? একবার দাও-না দেখি।

কুমুদিনী হাত বাড়িয়ে দিল

আংটি যে। এ কী, এ যে নীলা! সর্বনাশ!

কুমুদিনী নিরুত্তর

দেখো, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।

কুমুদিনী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে, মধুসূদন ছাড়লে না

আমি যে বছর নীলা কিনেছিলুম সেই বছরেই আমার পাট-বোঝাই নৌকো হাওড়া ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়।

কুমুদিনী আবার হাত মুক্ত করবার চেষ্টা করলে, মধুসূদন ছাড়লে না

এটা আমি খুলে নিই।

চমকে উঠে

কুমুদিনী। না, থাক্।

মধুসূদন। তোমার ভাব দেখে ভয় হয়েছিল, কেবল আমার উপরে কেন, কোনো কিছুতেই তোমার আসক্তি নেই। এখন দেখছি আংটির উপরেও বেশ লোভ আছে। তা, ভয় কিসের, আর-একটা আংটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক দামি।

নিজের হাত থেকে মস্ত বড়ো কমলহীরের আংটি খুলে নিয়ে কুমুকে পরাবার চেষ্টা করলে। এবার কুমু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলে। কড়া সুরে

মধুসূদন। দেখো, এ আংটি তোমাকে খুলতেই হবে।

কুমু নীরব

শুনছ? আমি বলছি, ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।

হাত টেনে নিতে উদ্যত। হাত সরিয়ে

কুমুদিনী। আমি খুলছি।

খুলে ফেললে

মধুসূদন। দাও ওটা আমাকে।
কুমুদিনী। ওটা আমিই রেখে দেব।

বিরক্তির স্বরে

মধুসূদন। রেখে লাভ কী? মনে ভাবছ এটা ভারি একটা দামি জিনিস। এ-সব জিনিস চেন? এ কিছুতেই তোমার পরা চলবে না, এই আমি বলে রাখছি।
কুমুদিনী। আমি পরব না।

পুঁতির কাজ করা থলের মধ্যে আংটি রেখে দিলে

মধুসূদন। ( উত্তেজিত ) কেন? এই তুচ্ছ জিনিসটার 'পরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়!

কুমুদিনী নিরুত্তর

এ আংটি তোমাকে দিলে কে?

কুমুদিনী নিরুত্তর

তোমার মা নাকি?

সংকুচিত স্বরে

কুমুদিনী। দাদা।
মধুসূদন। দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্ছে। নইলে এমন দশা কেন? শনির সিঁধকাঠি তোমার দাদাকেই মানায়। এ আমার ঘরে আনা চলবে না এই বলে গেলুম। মনে রেখো।

[ প্রস্থান

কুমুদিনী দ্রুতপদে লেখবার টেবিলের দেরাজ খুলে ঝুলি রেখে দিলে। দাদার টেলিগ্রামের কাগজ বুকের কাপড় থেকে বের করে মাথায় ঠেকালে।

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরী। মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, ঘিরে রাখবে তোমাকে, যেন সিঁধকাঠি নিয়ে বেড়াচ্ছি, বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব। আমায় চিনতে পারছ না ভাই, আমি তোমার বড়ো জা, শ্যামাসুন্দরী— তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্যন্ত জমা-খরচের খাতাটাই হবে ওর বউ। তা ওই খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, ওই খাতার জোরেই তো এত বয়সে এমন সুন্দরী জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ওইখানে খাতার মন্তর খাটে না।

কুমুদিনী অবাক

বুঝেছি, তা পছন্দ না হলেই বা কী, সাত পাক যখন ঘুরেছ তখন একুশ পাক উল্‌টে ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না।
কুমুদিনী। কী কথা বলছ দিদি!

শ্যামাসুন্দরী। খোলসা করে কথা বললেই কি দোষ হয় ভাই! মুখ দেখে বুঝতে পারি নে? তা, দোষ দেব না তোমাকে। ও আমাদের আপন বলেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি? কিন্তু বড়ো শক্ত হাতে পড়েছ বউ, বুঝেসুঝে চোলো।

মোতির মার প্রবেশ

ভয় নেই, বকুল ফুল, যাচ্ছি আমি। ভাবলুম তুমি নেই এই ফাঁকে নতুন বউয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি গে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখতে হবে। সইকে বলছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন আধকপালে মাথা ধরা; বউকে ধরেছে ওর বাঁ দিকের পাওয়ার কপালে, ডান দিকের রাখার কপালে যদি ধরতে পারে তবেই পুরোপুরি হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত পরেই পুনঃপ্রবেশ

একটা পান নেও, দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে?

কুমুদিনী। না।

মুখে একটিপ দোক্তা নিয়ে শ্যামার প্রস্থান

ছি ছি, কী বললেন উনি! স্বামীর বয়স বেশি বলে তাঁকে ভালোবাসি নে, এ কথা কখনোই সত্য নয়— লজ্জা, লজ্জা, এ যে ইতর মেয়েদের মতো কথা! ছোটোবউ, আমাকে একবার তোমাদের পুজোর ঘরে নিয়ে চলো।

মোতির মা। আর তো দেরি নেই, সময় হয়ে এল।

কুমুদিনী। সেখানে একবার যদি না যেতে পারি হাঁপিয়ে মরে যাব।

মোতির মা। আচ্ছা চলো, দেরি কোরো না।

কুমুদিনী। আমি ঠাকুরের পায়ে কেবল একটি ফুল দিয়ে আসব, আর কিছুই না।

[ উভয়ের প্রস্থান

মধুসূদন ধীরে ধীরে এসে পুঁতির থলি দেরাজ থেকে
বের করে নিয়ে পকেটে ভরল

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরী। অসময়ে ঠাকুরপো যে এখানে? শূন্য খাঁচার দিকে বেড়ালের মতো তাকিয়ে আছ। লোকে বলবে কী? বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

মধুসূদন। চুপ করো, তোমার রসিকতা ভালো লাগছে না।

শ্যামাসুন্দরী। আমার মুখে ভালো লাগছে না, রস জোগাবার লোক এসেছে যে।

মধুসূদন। আজকাল তোমার আস্পর্ধা কেবল বেড়ে যাচ্ছে, আগে এমন ছিল না।

শ্যামাসুন্দরী। আদর কমলেই আস্পর্ধা বাড়ে— কী আর রইল বাকি যে ভয় করব?

মধুসূদন। বাকি রয়েছে এখানে তোমার আশ্রয়।

শ্যামাসুন্দরী। এক বউকে এনেছ বলে বাড়ির আর-এক বউকে রাখবার জায়গা যদি না থাকে তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবারও তো গাছতলাটা মিলবে।

মধুসূদন। একটা কথা বলে রাখি, বড়োবউয়ের সঙ্গে যদি মিলে মিশে না থাকতে পার তা হলে রজবপুরের বাসায় তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

শ্যামাসুন্দরী। বড়োবউয়ের সঙ্গে আমার মেলামেশার কথা ভেবো না, নিজের কথাটা ভেবে দেখো। তুমি আমি এক দরের লোক, মিলতে পেরেছি খুব সহজে, এত সহজে যে লোকে কানাকানি করেছে। তামায় পিতলে গলিয়ে এক করা যায়, কিন্তু তামায় হীরেয় গলিয়ে মেলানো যায় না।

মধুসূদন। মানে কী হল?

শ্যামাসুন্দরী। মানে এই, বউ এনেছ, ওকে সিংহাসনে বসানো চলবে কিন্তু ওকে অর্ধাঙ্গ

করতে পারবে না, শেষকালে তোমাকেই একদিন সংসার ছেড়ে রজবপুরে যেতে হয় বা।

মধুসূদন। বড়োবউ!

[ উভয়ের প্রস্থান

মোতির মা ও কুমুদিনীর প্রবেশ। [কুমুদিনী] দেরাজ খুলে চমকে উঠে মাটিতে বসে পড়ল, পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে বসে রইল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে

মোতির মা। কী হয়েছে বলো দিদি।

কুমু নিরুত্তর

কী হয়েছে, বলো দিদি, লক্ষ্মী আমার।

মুখে কথা বেরোল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল

বলো দিদি, আমাকে বলো কোথায় তোমার বেজেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে

কুমুদিনী। নিয়ে গেছে চুরি করে।

মোতির মা। কী নিয়েছে দিদি?

কুমুদিনী। আমার আংটি, দাদার আংটি!

মোতির মা। কে নিয়ে গেছে?

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে, কারও নাম না করে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত করলে

মোতির মা। শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।

কুমুদিনী। নেব না ফিরিয়ে, দেখব কত অত্যাচার করতে পারে ও।

মোতির মা। আচ্ছা, সে হবে পরে। এখন মুখে কিছু দেবে। সমস্ত দিন তোমার ভালো করে খাওয়াই হয় নি।

কুমুদিনী। না, পারব না, এখানকার খাবার আমার গলা দিয়ে নাববে না।

মোতির মা। লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।

কুমুদিনী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?

মোতির মা। না, রইল না, যা-কিছু রইল সে স্বামীর মর্জির উপরে। জান না চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হয়?

কুমুদিনী। রাজা অজ ইন্দুমতীর পরিচয়ে তাঁকে গৃহিণী বলেছেন, মন্ত্রী বলেছেন, সখী বলেছেন, প্রিয়শিষ্যা বলেছেন, এই ফর্দের মধ্যে কোথাও তো দাসীর উল্লেখ নেই। স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ দাসের জাতের মানুষ?

মোতির মা। ভাই, ওই লোকটিকে এখনো চেনো নি। ও যে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না, এ বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর চাকরানী পর্যন্ত সবাই গোলাম।

একটু চুপ ক'রে

কুমুদিনী। সেই ভালো, আমি সেই গোলামিই করব। আমার প্রতিদিনের খোরপোশ হিসেব করে প্রতিদিন শোধ করে দেব। এ বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী বাঁদি হয়ে থাকব না। চলো আমাকে কাজে ভর্তি করে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো, আমাকে তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রানী বলে কেউ যেন না ঠাট্টা করে।

হেসে কুমুর চিবুক ধরে

মোতির মা। তা হলে শুরু করি আমার প্রভুত্ব। হুকুম করছি চলো এখন খেতে। আর তো দেরি নেই। আজ বাড়ি-ভর্তি লোক। তোমার শরীর ভালো নেই, সবাইকে ঠেকিয়ে রেখেছি। তারা তো আমাকে খেয়ে ফেলবে। তাদের আর ঠেকানো যাবে না। একটুখানি খেয়ে নিয়েই তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

কুমুদিনী। দেখো ভাই, নিজেকে দেব বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।

মোতির মা। কাঠুরে গাছকে কাটতেই জানে, পায় শুধু চ্যালা কাঠ। মালী গাছকে রাখতে জানে, পায় সে ফুল। তুমি পড়েছ কাঠুরের হাতে, ও ব্যাবসাদার।

কুমুদিনী। আমার আর কিছুই চাই নে, আমাকে একটুখানির জন্যে নিয়ে যাও আড়ালে, অন্তত দশ মিনিটের জন্যে একলা থাকতে দাও।

মোতির মা। আচ্ছা ভাই, তুমি এই ঘরটার মধ্যে যাও। আমি দরজার বাইরে রইলুম, কাউকে ঢুকতে দেব না।

কুমুর ঘরে প্রবেশ, দ্বার রোধ

হায় রে, এমন কপালও করেছিলি!

গানের দলের গান

প্রথম দল। আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে—
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি॥
দ্বিতীয় দল। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—
প্রথম দল। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি॥
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।
দ্বিতীয় দল। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
প্রথম দল। চিরদিন হেরিব হে, মনোমোহন মিলনমাধুরী,
যুগলমুরতি॥

দাসীর প্রবেশ

দাসী। রাজাবাহাদুর খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর শরীর ভালো নেই— তিনি সকাল সকাল শোবেন।

মোতির মা। ও মা, সেকি কথা, এখনি!

দাসী। তাঁর হুকুম, আমরা কী করব বলো।

মোতির মা। অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? জামা-গয়নাগুলো খুলতে হবে না? আর-একটুখানি সময় দাও। আচ্ছা, তোমরা আর-একটা গান গাও-না ততক্ষণ।

গীত

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে॥
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে॥

হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে॥

বাইরে থেকে

মোতির মা। দিদি, ওরা ডাকতে এসেছে।

সাড়া না পেয়ে

ওমা, মূর্ছা গেছে। যা যা, তোরা শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয়। ভয় নেই দিদি, এই-যে আমি আছি। তোমরা ভিড় কোরো না, এখনি আমি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি। ভয় করিস নে ভাই, ভয় করিস নে।

কুমুদিনী উঠে বসল

এখনো ভয় করছে দিদি?

কুমুদিনী। না, আমার কিচ্ছু ভয় করছে না। এই আমার অভিসার। বাইরে অন্ধকার, ভিতরে আলো।

মোতির মা। ওমা, বড়োঠাকুর যে এই দিকেই আসছে!

কুমুদিনী। ছোটোবউ, এখনি না, এখনি না— আর-একটুখানি পরে। পর্দাটা ফেলে দাও।

মোতির মা। এই-যে এসে পড়েছেন, এখন পর্দা ফেললে অনর্থপাত হবে। তাই হোক, ফেলেই দিই।

শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের প্রবেশ

কুমুদিনীকে শোনাবার মতো গলা চড়িয়ে

মধুসূদন। কী, হয়েছে কী?

শ্যামাসুন্দরী। তা তো বলতে পারি নে। দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তুমিই জিজ্ঞাসা করো-না, একটু বোসো কাছে।

মধুসূদন। কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।

শ্যামাসুন্দরী। মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো। ওরা বড়ো ঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।

মধুসূদন। রোজ রোজ উনি যাবেন মুর্ছো, আর আমি ওঁর মাথায় কবিরাজি তেল মালিশ করব, এইজন্যে কি ওঁকে বিয়ে করেছিলুম?

শ্যামাসুন্দরী। ঠাকুরপো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন নাহয় মুর্ছো ভাঙাতে হয়।— ঠাকুরপো, অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারি নে। ওই-যে আসছে বউ— কিন্তু ওর সঙ্গে রাগারাগি কোরো না ভাই, ও ছেলেমানুষ।

[ প্রস্থান

কুমুদিনী বাইরে এসে দাঁড়াল

মধুসূদন। বাপের বাড়ি থেকে মুর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি! কিন্তু আমাদের এখানে ওটার চলন নেই। তোমাদের ওই নুরনগরী চাল ছাড়তে হবে।

কুমুদিনী নিরুত্তর

আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্টিরিয়াওয়ালি মেয়ের খিদ্‌মদ্‌গারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই সাফ বলে দিলুম।

কুমুদিনী। তুমি আমাকে অপমান করতে চাও, হার মানতে হবে। নেব না, তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।

মধুসূদন। তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন। তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচতে পারি।

কুমুদিনী। দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোটো হোয়ো না।

মধুসূদন। কী, আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো!

কুমুদিনী। তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার দ্বারে এসেছি।

মধুসূদন। বড়ো জেনেই এসেছ, না বড়োমানুষ জেনেই টাকার লোভে এসেছ?

কুমুদিনীর দ্রুত প্রস্থান

যেয়ো না রানী, ফিরে এসো। আমি বলছি ফিরে এসো।

## তৃতীয় দৃশ্য

পরদিন সকালে

মোতির মা ও কুমুদিনী

মোতির মা। এত ভোর বেলায় আকাশে কার দিকে তাকিয়ে আছ ভাই? শোবে চলো।

কুমুদিনী। আমার নিষ্ঠুর ঠাকুরের দিকে। তাকে আমি বলেছি, আমার বুক নিংড়িয়ে তুমি পুজো চাও, তাই দেব আমি, কিছুতেই হার মানব না, হার মানব না।

মোতির মা। তোমার ঠাকুরই হার মানবেন, নিষ্ঠুরের আসন টলবে।

কুমুদিনী। দুঃখকে আমি ভয় করি নে ভাই, দুঃখ আমার সওয়া আছে শিশুকাল থেকে। কিন্তু ঘৃণা! যা অন্যায় যা অশুচি তার মধ্যে দিয়ে কেমন করে কী সান্ত্বনা পাব, আমার যে তা জানা নেই। দাদার কাছে মানুষ হয়েছি, তাই এই পথটা চেনবার দরকার হয় নি। কিন্তু ঘৃণাও করব জয়, তার পরে আর আমার ভাবনা কিসের!

মোতির মা। তোমার ঠাকুকে যে যত বেশি করে দেয় তার উপর তাঁর দাবি আরো যেন বেড়েই চলে, কিছুতে মেটে না তাঁর পাওনা। এর মানে কিন্তু আমরা বুঝতেই পারি নে।

কুমুদিনী। ভক্তকে যাচাই করে নেন; তাঁর চরণতলে বসবার যোগ্য হতে হবে তো।

মোতির মা। সত্যি করে বলি, রাগ করিস নে ভাই— পায়ের তলায় এমনি ক'রে দলন ক'রে তার পরে পায়ের তলায় বসবার যোগ্য করবেন ঠাকুর, তার মানে বুঝতে পারি নে আমরা।

কুমুদিনী। আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ধ্রুবকে যেমন দেখা দিয়েছিলেন তেমনি করেই এখনি যদি নির্মল মূর্তিতে দেখা দেন, যদি সত্যি করে তাঁর পা ছুঁতে পারি, তবেই এ মলিন দেহ শুদ্ধ হয়, নইলে এই অশুচিকে বহন করে আমি আর পারছি নে, নিজের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

কাগজের মোড়ক হাতে মোতিলালের প্রবেশ

এসো গোপাল, এসো আমার কোলে। দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আস নি কেন?

কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে

মোতিলাল। জ্যাঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেছি বলো দেখি।

কুমুদিনী। সোনা এনেছ, সাত-রাজার-ধন মানিক এনেছ। কই দেখি।

মোতিলাল। আমার পকেটে আছে।

কুমুদিনী। আচ্ছা, তবে বের করো।

মোতিলাল। তুমি বলতে পারলে না!

কুমুদিনী। আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝতে পারি নে, যা না দেখি তা আরো ভুল বুঝি।

পকেট থেকে কাগজের পুঁটুলি কুমুদিনীর কোলে ফেলে রেখেই
মোতিলালের পালাবার উপক্রম

কুমুদিনী। না, তোমাকে পালাতে দেব না।

মোতিলাল। তা হলে এখন দেখো না।

কুমুদিনী। ভয় নেই, তুমি চলে গেলে তখন খুলব।

মোতিলাল। আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাই বুড়িকে দেখেছ?

কুমুদিনী। কী জানি, তোমার বয়সে হয়তো দেখে থাকব, ভুলে গেছি।

মোতিলাল। একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধে হলেই চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে। ইচ্ছে করলেই সে ছোট্ট হয়ে যেতে পারে, চোখে দেখা যায় না।

কুমুদিনী। মন্তরটা শিখে নিতে হবে তো।

মোতিলাল। কেন জ্যাঠাইমা?

কুমুদিনী। অদৃশ্য হয়ে পালাবার দরকার হতে পারে।

মোতিলাল। জটা বুড়ি কয়লার ঘরে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। যে মেয়ে সেই সিঁদুরের টিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।

কুমুদিনী। সর্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েছে নাকি?

মোতিলাল। সেজোপিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ছন্নু বেয়ারার সঙ্গে সে কয়লার ঘরে যায়, ভয় করে না।

কুমুদিনী। ছেলেমানুষ, তাই রাজরানী হতে ও ভয় পায় না। সেই কৌটো কয়লা-চাপাই থাক্‌, তার চেয়ে দামি জিনিস তোমার এই মোড়কের মধ্যে আছে নিশ্চয়। খুলি এইবার।

মোতিলাল। আচ্ছা, খোলো।

কুমুদিনী। এ যে লজঞ্চুস। তোমার ভোগের সামগ্রী আমাকে দিলে গোপাল, মনে থাকবে। তোমার মিষ্টি দিয়ে তুমি তো আমার মন মিষ্টি করে দিলে, আমি তোমাকে দিলুম আমার নিজের তোলা ফুল আমার নিজের সেলাই করা রুমালে বেঁধে। আমার পুজো রইল এই ফুলে, আর এই রুমালে রইল আমার স্নেহ।

মোতির মা। ও কী করলে দিদি? এ ফুল যে তুমি পুজোর জন্যে তুলে এনেছিলে।

কুমুদিনী। ঠিক জায়গাতেই পৌঁছল বোন, দেবতা বঞ্চিত হবেন না।

মোতিলাল। আচ্ছা জ্যাঠাইমা, এই কাঁচের গোলাটা নিয়ে তুমি কী কর?

কুমুদিনী। কিছুই করি নে, তোমাকে খেলতে দেব বলে রেখে দিয়েছি। তুমি হাতে করে নিলেই ও আমার পাওয়া হবে।

মোতিলাল। খেলা হয়ে গেলে আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

কুমুদিনী। সে কি হয়? দিয়ে ফিরিয়ে নিলে যে অপরাধ হয়।

মোতিলাল। তা হলে আমি নিয়ে যাই। [ প্রস্থান

মোতির মা। কী করলে দিদি! হাবলুর হাতে ওই কাগজ-চাপা দেখলে বড়োঠাকুর রক্ষা রাখবেন না। আমার উপর দোষ পড়বে যে আমিই ওকে চুরি করতে শিখিয়েছি।

কুমুদিনী। আমার ঠাকুরেরও তো চুরির অপবাদ আছে— যা তাঁরই ধন তাই চুরির ছল করে নিয়ে তাঁর খেলা।

হাবলুকে ধরে মধুসূদনের প্রবেশ

মোতির মার অন্তরালে পলায়ন

মধুসূদন। এই দেখো বড়োবউ, তোমার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। বদমায়েস ছেলে! তোমরা যদি এরকম অসাবধান থাক তা হলে ওর স্বভাব যে মাটি হয়ে যাবে। এ রুমালটাও তো তোমার বলেই মনে হচ্ছে।

কুমুদিনী। হাঁ, আমার।

মধুসূদন। এটাও বুঝি সরিয়েছে?

কুমুদিনী। ওর 'পরে অন্যায় কোরো না, আমি ওকে দিয়েছি।

মধুসূদন। তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ, ফাঁকি আমারই বেলায়? এ রুমাল রইল আমারই। ওটা দিয়েই যদি ফেলবে ওটা আমিই নিলুম। মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু এই কাগজ-চাপাটা? এটা তো চুরি বটে?

কুমুদিনী। না, ও চুরি করে নি।

মধুসূদন। আচ্ছা বেশ, তা হলে সরিয়ে নিয়েছিল।

কুমুদিনী। না, আমিই ওকে দিয়েছি।

মধুসূদন। এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি। ওর লোভ বাড়িয়ে দিচ্ছ কেবল? একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না। আমি এলোমেলো কিছুই ভালোবাসি নে।

কুমুদিনী। তুমি নাও নি আমার নীলার আংটি?

মধুসূদন। হাঁ, নিয়েছি।

কুমুদিনী। তাতেও তোমার ওই কাঁচের গোলাটার দাম শোধ হল না?

মধুসূদন। কিন্তু আমি তো বলেইছিলুম ওটা তুমি রাখতে পারবে না।

কুমুদিনী। তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে— আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?

মধুসূদন। এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।

কুমুদিনী। কিছু নেই? তবে রইল তোমার এ ঘর পড়ে।

মধুসূদন। শোনো, শোনো। তোমার হাতে ওই কাগজে মোড়া কী আছে?

কুমুদিনী। জানি নে।

মধুসূদন। জান না? তার মানে কী?

কুমুদিনী। তার মানে আমি জানি নে।

মধুসূদন। আমাকে দাও, আমি দেখি।

কুমুদিনী। ও আমার গোপন জিনিস, দেখাতে পারব না।

মধুসূদন। কী! আস্পর্ধা তো কম নয়!

জোর করে কেড়ে নিতে চারি দিকে এলাচদানা ছড়িয়ে পড়ল

হা হা হা! এলাচদানা! তাই বলো! এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এতে লজ্জা কিসের? রোজ আনিয়ে দেব— কত চাও! আমাকে আগে বললে না কেন?

কুমুদিনী। তুমি পারবে না আনিয়ে দিতে।

মধুসূদন। পারব না! অবাক করলে তুমি!

কুমুদিনী। না, পারবে না।

মধুসূদন। অসম্ভব দাম নাকি?

কুমুদিনী। হাঁ, টাকায় মেলে না।

মধুসূদন। তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়েছেন বুঝি! পাড়াগাঁয়ে এই বুঝি ছিল তোমার জলখাবার!

কুমুদিনীর প্রস্থানোদ্যম। হাত ধরে টেনে এনে

মধুসূদন। একটু বোসো।

কুমুদিনী। দাদার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল তাঁর খবর নিয়ে?

মধুসূদন। সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেছি।

কুমুদিনী। দাদা কবে আসবেন?

মধুসূদন। হপ্তাখানেকের মধ্যে।

কুমুদিনী। দাদার শরীর কি আরো খারাপ হয়েছে?

মধুসূদন। কই, তেমন তো কিছু শুনি নি।

কুমুদিনী। দাদার চিঠি কি এসেছে?

মধুসূদন। চিঠির বাক্স তো এখনো খোলা হয় নি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

কুমুদিনী। একবার খোঁজ করবে কি?

মধুসূদন। যদি এসে থাকে খাওয়ার পরে নিজেই নিয়ে আসব। যাচ্ছ কোথায়? আর-একটু বোসোই-না। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এত লজ্জা করলে কেন? ওতে লজ্জার কথা কী ছিল?

কুমুদিনী। ও আমার গোপন কথা।

মধুসূদন। আমার কাছেও বলা চলবে না?

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। এ তোমাদের নুরনগরের চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা। ওই চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি আমার নাম মধুসূদন না।

কুমুদিনী। কী তোমার হুকুম বলো। মধুসূদন। সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিল বলতে হবে।

কুমুদিনী। হাবলু।

মধুসূদন। হাবলু! তা নিয়ে এত ঢাকাঢাকি কেন?

কুমুদিনী। ঠিক বলতে পারি নে।

মধুসূদন। আর কেউ তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে?

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। তবে?

কুমুদিনী। ওই পর্যন্তই, আর কোনো কথা নেই।

মধুসূদন। তবে এত লুকাচুরি কেন?

কুমুদিনী। তুমি বুঝতে পারবে না।

কুমুদিনীর হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে

মধুসূদন। অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি!

কুমুদিনী। কী চাও তুমি বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই, সে কথা আমি মানি।

নেপথ্য থেকে। আপিসের সাহেব এসে বসে আছে।

[ মধুসূদনের দ্রুত প্রস্থান

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরী। কী বউ, যাচ্ছ কোথায়?

কুমুদিনী। কোনো কথা আছে?

শ্যামাসুন্দরী। এমন কিছু নয়। দেখলুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে জিজ্ঞাসা করে জানি নতুন প্রণয়ে খটকা বাধল কোন্‌খানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কিরকম করে বনিয়ে চলতে হয় সে পরামর্শ আমরাই দিতে পারি। বকুল ফুলের ঘরে চলেছ বুঝি? তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।

[ কুমুদিনীর প্রস্থান

## পরের দৃশ্য

স্টেজের নেপথ্যে কুমু। সেই দিকে চেয়ে

মোতির মা। এ কী কাণ্ড দিদি! এখানে তুমি?

বেরিয়ে এসে

কুমুদিনী। এ বাড়িতে আমি সেজবাতি সাফ করব, ওই ফরাসখানায় আমার স্থান।

মোতির মা। ভালো কাজ নিয়েছ ভাই, এ বাড়ি তুমি আলো করতেই তো এসেছ, কিন্তু সেজন্যে তোমাকে সেজবাতির তদারক করতে হবে না। এখন চলো।

[কুমুদিনী নিরুত্তর]

মোতির মা। তবে ওই ঘরে আমার বিছানাও আমি করি, তোমার কাছেই আমি শোব।

কুমুদিনী। না।

মোতির মা। তোমার পণ টলাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে যাই। লোকজনরা দেখলে কী বলবে? আমার কাজ সেরে এখনি আসছি।

[ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মোতির মার প্রস্থান

শ্যামাসুন্দরী প্রবেশ করে দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে
দেখেই দরজা বন্ধ করলে। মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। কী করছ তুমি?

শ্যামাসুন্দরী। কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে, জোগাড় করতে যাচ্ছি। তোমারও নেমন্তন্ন রইল।

মধুসূদন। দক্ষিণের জোগাড় রেখো।

শ্যামাসুন্দরী। তোমার দয়া হলেই জোগাড়ের ত্রুটি হবে না। কিন্তু ঠাকুরপো, অসময়ে তুমি এই বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

মধুসূদন। ঘরে গরম, এখানে হাওয়া খেতে এসেছি।

শ্যামাসুন্দরী। হাওয়া খাচ্ছ, না খাবি খাচ্ছ! পলাতকার সন্ধান করতে করতেই যাবে তোমার দিন।

মধুসূদন। তুমি জান বড়োবউ আছে কোথায়?

শ্যামাসুন্দরী। হারাধনের খোঁজ করে দিই যদি তবে কী বকশিশ দেবে?

মধুসূদন। বিরক্ত কোরো না বলছি, যদি জানা থাকে তো বলো!

শ্যামাসুন্দরী। সাধে বলতে চাই নে, বললে তোমার মাথা আরো গরম হয়ে উঠবে।

রাজরানীর শখ হয়েছে গোলামি করতে। তুমি তার মান ভাঙাতে পারলে না, সে তোমার মান ভাঙবে হাটের মধ্যে।

মধুসূদন। ভালো লাগছে না তোমার এ-সব বানিয়ে কথা বলা।

শ্যামাসুন্দরী। যা ভালো লাগবে তাই তোমাকে দেখিয়ে দিই, তার একটুও বানানো নয়। আজ রাত্রের মতো ঘুমের দফা নিকেশ হবে। এই দেখো—

[ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে শ্যামাসুন্দরীর প্রস্থান

মধুসূদন। একি এ! কুমু, বেরিয়ে এসো বলছি।

বেরিয়ে এসে

কুমুদিনী। কী চাও?

মধুসূদন। এ কিসের পালা শুরু করেছ আমার বাড়িতে?

কুমুদিনী। তোমার বাড়িতে রানীর পালার অপমান ভোলবার জন্যেই আমার এই দাসীর পালা।

মধুসূদন। থিয়েটারি শুরু করলে নাকি?

কুমুদিনী। এখানে সত্যি যদি থাকে কিছু, সে এই দাসীর কাজ, রানীর কাজটাই ছিল থিয়েটারি।

মধুসূদন। কথা কাটাকাটি করায় আমার অভ্যেস নেই— সংক্ষেপে জানতে চাই, এইরকম বরাবরই চলবে নাকি?

কুমুদিনী। সে আমার অদৃষ্টের কথা, কী করে জানব মেয়াদ কত দিনের।

মধুসূদন। আচ্ছা, থাকো এইখানে। সাধ্য-সাধনা করা আমার ধাতে নেই। চৌকিদার এখনি টহল দিয়ে যাবে, দরজাটা বন্ধ রেখো।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

নবীনের প্রবেশ

মধুসূদন। দাঁড়াও এখানে, শোনো আমার কথা। বাড়িতে কী-সব ব্যাপার হচ্ছে চোখ রাখ কি?

নবীন। কেন দাদা, কী হয়েছে?

মধুসূদন। বড়োবউ যে কাণ্ডটা করতে বসেছে তার কারণটা কী সে কি আমি জানি নে মনে কর?

নবীন। তোমার কী মনে হচ্ছে বলো।

মধুসূদন। মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন সন্দেহ নেই।

নবীন। সে কী কথা দাদা! মেজোবউ তো—

মধুসূদন। তর্ক কোরো না। আমি বলে রাখছি, এতে তোমাদের ভালো হবে না।

[প্রস্থান

মোতির মার প্রবেশ

নবীন। শোনো শোনো, কথাটা শুনে যাও, একটা ফ্যাসাদ বেধেছে।

মোতির মা। কেন, কী হয়েছে?

নবীন। সে জানেন অন্তর্যামী আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি। কিন্তু তাড়া আরম্ভ হয়েছে আমার উপরেই।

মোতির মা। কেন বলো দেখি?

নবীন। যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানির।

মোতির মা। তা বেশ, আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা শুরু করে দাও, দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কি না।

নবীন। দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর দামি ডিনর সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল, তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হয়েছিল; কেননা জিনিসটে ছিল আমার জিম্মেয়। কিন্তু এবারে যে দামি জিনিসটি ঘরে এল সেও কি আমারই জিম্মে? একটু কিছু জখম হলেই জরিমানাটা তোমাতে-আমাতেই বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অতএব যা করতে হয়— আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না, মেজোবউ।

মোতির মা। জরিমানা বলতে কী বোঝায় শুনি।

নবীন। রজবপুরে চালান করে দেবেন; মাঝে মাঝে তো সেই রকম ভয় দেখান।

মোতির মা। ভয় পাও বলে ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয় নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না।

নবীন। বুঝলুম, এখন কী করতে হবে বলো-না।

মোতির মা। যাও, তোমার দাদাকে বলো গে যাও, যত বড়ো রাজাই হোন-না, মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না— মানের বোঝা নিজেকেই মাথা হেঁট করে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ কোরো।

নবীন। মেজোবউ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমাকে দরকার হবে না, নিজেরই হুঁশ হবে।

মোতির মা। আচ্ছা, তুমি যাও, দিদির সঙ্গে কথা আছে!

[নবীনের প্রস্থান

দরজা খুলে

মোতির মা। ওকি দিদি, পাথরের মূর্তির মতো ধুলোয় বসে আছ! বদ্ধ ঘরে হাঁপিয়ে উঠবে— এসো, বাইরে এসো।

কুমুদিনী বাইরে এল, আঁচল মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠল।

কুমুদিনীর গলা জড়িয়ে ধরে

মোতির মা। দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কী হয়েছে বলো আমাকে।

কুমুদিনী। আজও দাদার চিঠি পেলুম না, জানি নে কী হল তাঁর।

মোতির মা। চিঠি পাবার কি সময় হয়েছে ভাই?

কুমুদিনী। নিশ্চয় হয়েছে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেছি। তিনি তো জানেন খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কিরকম করছে।

মোতির মা। তুমি ভেবো না, খবর নেবার আমি একটা কিছু উপায় করব।

কুমুদিনী। তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পার তো আমি বাঁচি।

মোতির মা। তাই করব, ভয় কী!

কুমুদিনী। তুমি জান আমার কাছে একটিও টাকা নেই।

মোতির মা। কী বল দিদি! সংসার-খরচের যে টাকা আমার কাছে থাকে সে তো তোমারই টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারই নিমক খাচ্ছি।

কুমুদিনী। না না না, এ বাড়ির কিছুই আমার নয়, সিকি পয়সাও নয়।

মোতির মা। আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে নাহয় আমার নিজের টাকা থেকেই খরচ করব। চুপ করে রইলে যে! তাতে দোষ কী? আমি যদি অহংকার করে দিতুম তুমি অহংকার করে না নিতে পারতে। ভালোবেসে যদি দিই তা হলে ভালোবেসেই নিতে হবে।

কুমুদিনী। নেব।

মোতির মা। দিদি, তোমার শোবার ঘর কি আজও শূন্য থাকবে?
কুমুদিনী। ওখানে আমার জায়গা নেই।
মোতির মা। একটু দুধ এনে দেব তোমার জন্যে?
কুমুদিনী। এখন নয়, আর-একটু পরে। [ প্রস্থান
মোতির মা। ওগো, একবার শুনে যাও তো।

নবীনের প্রবেশ

নবীন। আমাকে একটুখানি না দেখলেই অস্থির হয়ে ওঠ, ডাকাডাকি করতে থাক, লোকে বলবে কী?
মোতির মা। রাখো তোমার রঙ্গ, কাজের কথা আছে।
নবীন। কী শুনি।
মোতির মা। বড়োঠাকুরের ঘরে তাঁর ডেস্কের উপর খোঁজ করে এসো গো, দিদির কোনো চিঠি এসেছে কি না। দেরাজ খুলেও দেখো।
নবীন। সর্বনাশ!
মোতির মা। তুমি যদি না যাও তো আমি যাব।
নবীন। এ যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধরতে পাঠানো।
মোতির মা। তা হোক, তোমাকে যেতে হবে।
নবীন। এখনি?
মোতির মা। হাঁ, এখনি। ওঁর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়। আরো একটা কাজ আছে। নুরনগরে এখনি তার করে জানতে হবে বিপ্রদাসবাবু কেমন আছেন।
নবীন। তা বেশ। তা দাদাকে জানিয়ে করতে হবে তো।
মোতির মা। না।
নবীন। মেজোবউ, তুমি তো দেখি মরিয়া হয়ে উঠেছ! এ বাড়িতে টিকটিকি পোকা ধরতে পারে না কর্তার হুকুম ছাড়া, আর আমি—
মোতির মা। দিদির নামে তার যাবে, তোমার তাতে কী?
নবীন। আমার হাত দিয়ে তো যাবে।
মোতির মা। বড়োঠাকুরের আপিসে ঢের তার তো দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা। দিদি দিয়েছেন।
নবীন। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!
মোতির মা। ওই দিদি আসছেন। ওঁকে একটু হাসাতে হবে। আর কিছু না থাক্‌, তোমার ওই গুণটি আছে, তুমি লোক হাসাতে পার।

কুমুদিনীর প্রবেশ

নবীন। বউদি, তোমার কাছে নালিশ আছে।
কুমুদিনী। কিসের নালিশ?
নবীন। দুঃখের কথা বলি। বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্রমহিলা আমার বই লুকিয়ে রেখেছেন।
কুমুদিনী। এমন শাসন কেন?
নবীন। ঈর্ষা। যেহেতু নিজে ইংরেজি পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে, উনি কিন্তু স্বামীজাতির এডুকেশনের বিরোধী! আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্ছে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হয়ে যাওয়াতেই ওঁর রাগ। এত করে বোঝালাম, অত বড়ো যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের পিছনে পিছনেই চলতেন, বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি তোমার [চেয়ে] অনেক এগিয়ে চলেছি, এতে বাধা দিয়ো না।

মোতির মা। তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না।

কুমুদিনী। কেন ভাই, ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেছ?

মোতির মা। দেখো তো দিদি, শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালা? ঘরে এসে দেখি মহাপণ্ডিত পড়তে বসে গেছেন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁশ নেই।

কুমুদিনী সত্যি ঠাকুরপো?

নবীন। বউরানী, খাবার ভালোবাসি নে এত বড়ো তপস্বী আমি নই। কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেইজন্যেই তো ইচ্ছে করে খেতে দেরি হয়, বই পড়াটা একটা অছিলা!

মোতির মা। ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।

নবীন। আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।

কুমুদিনী। তাও কি কখনো ঘটে নাকি ঠাকুরপো?

নবীন। দুটো একটা তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হলে?

মোতির মা। আচ্ছা, আর তোমার দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেছেন।

নবীন। ঘরের লোকের নামে তো police case করতে পারি না, তাই চোরকে চুরি দিয়েই শাস্তি দিতে হয়। আগে দাও আমার বই!

মোতির মা। তোমাকে দেব না, দিদিকে এনে দিচ্ছি। ওঁকে দিয়ো না। দেখি তোমার সঙ্গে কিরকম রাগারাগি করেন।

[ বই আনতে প্রস্থান

নবীন। বৌদি, শুনে তুমি কী ভাববে জানি নে, আমরা পরস্পরের ধন পরস্পর চুরি করে থাকি। এমনি করে আমাদের স্বভাবটা দুই পক্ষেই সমান বিগড়িয়ে যাচ্ছে।

কুমুদিনী। সেজন্যে অনুতাপের কোনো লক্ষণ তো দেখি নে।

নবীন। কড়া পড়ে গেছে মনটাতে। ত্রাণকর্তা যদি অন্তরে প্রবেশ করতে চান সর্জিকাল অপরেশন দরকার হবে।

মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। এই নাও দিদি, ওঁর বই।

কুমুদিনী। কিন্তু এ তো dictionary, এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর শখ!

মোতির মা। ওঁর শখ নেই এমন বই নেই। সেদিন দেখি কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে পড়তে বসে গেছেন।

নবীন। নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়ি নে, অতএব ওতে লজ্জার কারণ নেই।

মোতির মা। দিদি, তোমার কি কিছু বলবার আছে? চাও তো এই বাচালটিকে এখন বিদায় করি।

কুমুদিনী। না, তার দরকার নেই।

আমার দাদা একজন লোক পাঠিয়েছেন শুনেছি।

নবীন। কিন্তু তিনি বোধ হয় এতক্ষণ চলে গেছেন।

কুমুদিনী। চলে গেছেন? আমার সঙ্গে দেখা না করেই?

মোতির মা। তুমি বড়োঠাকুরকে কিছু বল নি?

কুমুদিনী। বলেছিলুম। কিন্তু— তুমি ঠিক জান ঠাকুরপো, তিনি চলে গেছেন?

নবীন। তাই মনে হয়। আচ্ছা, আমি দেখে আসি!

কুমুদিনী। না, তোমরা বোসো, আমি দেখে আসি।

[ প্রস্থান

মোতির মা। কী করবে বলো দিকি? বিপ্রদাসবাবুর উপর ওঁর রাগটা যেন ক্রমে ক্রমে বেড়েই উঠছে।

নবীন। তুমি তো জান না, এ সেই তিন পুরুষ আগেকার আক্রোশ, ঘোষালদের হেরে-যাওয়া লজ্জার প্রতিশোধ। ভাগ্যের দৌলতে দাদা আজ চাটুজ্জেদের সবটাকেই দেনার জালে জড়িয়ে ধরেছেন, তাদের আর পালাবার পথ নেই। কিন্তু বউরানী এখনো রয়ে গেছেন তাঁর আয়ত্তের বাইরে। দাদা কিছুতেই তাঁকে নিজের কবলে পাচ্ছেন না। বুঝে উঠতেই পাচ্ছেন না তো আয়ত্তে আনবেন কী! তাই বিপ্রদাসের উপরই ওঁর রাগ ফুলে ফুলে উঠছে। ভেবেছেন সেই যেন অন্তরায়, তাই তাকে একেবারে লোপ করে দিতে না পারলে বউরানীকে পাবেন না নিজের মুঠোর মধ্যে সর্বস্ব ক'রে।

মোতির মা। কিন্তু এই কি তার সহজ উপায়? এ তো জবরদস্তি! ও মেয়ে এ পথ মানবে কেন? আর ঐশ্বর্য পেতে বড়োঠাকুরের কতদিন সময় লাগল, মন পেতে দুদিন সবুর সইবে না? ধনলক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে, এ লক্ষ্মীর কাছে হাত পাততে হবে না? এ কি লুঠ করা সম্পত্তি যে গায়ের জোর দেখালেই কেড়ে নেওয়া যাবে? এখন তুমি যাও!

নবীন। যাব কোথায়?

মোতির মা। বড়োঠাকুরের ডেস্কো খোঁজ করতে যাও।

কুমুদিনীর প্রত্যাবর্তন

মোতির মা। দেখা পেলে দিদি?

কুমুদিনী। না, তাঁকে ওঁরা ফিরিয়ে দিয়েছেন! ঠাকুরপো, তোমায় একটি কাজ করতে হবে, বলো করবে?

নবীন। নিজের অনিষ্ট যদি হয় তো এখনি করব; কিন্তু তোমার অনিষ্ট হলে, কখনোই না।

কুমুদিনী। আমার আর কত অনিষ্ট হবে? আমি ভয় করি না। আমার এই বালা বেচে দাদার জন্য স্বস্ত্যেন করাতে হবে। ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই তো করতে পারব না, কেবল যদি পারি দেবতার পায়ে তাঁর জন্যে পুজো পাঠিয়ে দেব।

নবীন। দেবতাকে হাতে করে দিতে হয় না বউরানী, তিনি এমনি নেন। তুমি তাঁকে যে ভক্তি কর তারই পুণ্যে তোমার দাদার জন্যে দিনরাত্রি স্বস্ত্যেন হচ্ছে। তোমার আর কিছু করতে হবে না, কিছু দরকার নেই।

কুমুদিনী। ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কত কাজ করতে পার, আমাদের যে সে জোর খাটাবার জোর নেই! ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে? দিন যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাই না! ঠাকুরপো, কাউকে জান' যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারবেন?

নবীন। কী হবে বউরানী?

কুমুদিনী। নিজের মন নিয়ে যে আর পেরে উঠছি নে!

নবীন। সে তো তোমার মনের দোষ নয়! ভয় কোরো না, তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন।

কুমুদিনী। সেদিন আমার আর আসবে না।

মোতির মা। ও মা! বড়োঠাকুর আপিসে যাবেন না?

[ সকলের প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। বড়োবউ!

## চতুর্থ দৃশ্য

বাউলের গীত

[ লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই?
দেখ্‌ রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই॥
ফিরছে কেঁদে প্রভাতবাতাস, আলোক যে তার ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে শুধায় আজি নীরবে তাই॥
কত গোপন আশা নিয়ে কোন্‌ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।
হল না তার ফুটে ওঠা, কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা—
মর্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী কোথা রে পাই॥ ]

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের প্রাসাদে
সকালবেলা বাড়ির ছাদে

মোতির মা। একি দিদি! একি কাণ্ড? এখনো সেই সেজবাতির ঘরে? এখানে কেন ভাই?

কুমুদিনী। আর কোথায় যাব?

মোতির মা। তোমার শোবার ঘরে।

কুমুদিনী। সেখান থেকে আমার নির্বাসন।

মোতির মা। কেন ভাই? দিদি, তুমি ভালোবাসতে পারছ না, নয়? আমার কাছে লুকিয়ো না। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, কখনো কি ভালোবেসেছ? কাকে ভালোবাসা বলে তুমি জান?

কুমুদিনী। যদি বলি জানি তুমি হাসবে। সূর্য ওঠবার আগে যেমন করে আলো হয়, আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল। তুমি দময়ন্তীর কথা পড়েছ। শুভক্ষণে তাঁর বাঁ চোখ নেচেছিল, কিন্তু আগে তো জানতেন না যে নল রাজাকেই তিনি পাবেন; তবু যাঁকে পাবেন তাঁর জন্যেই সর্বান্তঃকরণের অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখলেন। তার পর যখন নল রাজাকে পেলেন তখন মনে হল এইজন্যেই বুঝি তাঁর বাঁ চোখ নেচেছিল। কিন্তু আমার এ কী হল দিদি?

মোতির মা। কী হল দিদি?

কুমুদিনী। আমার স্বপ্নে বোনা জাল কে যেন কঠিন হাতে ছিঁড়ে দিলে। এখন সব জিনিসই কঠিন হয়ে আমার লাগছে। একদিন হয়তো এ সবই সয়ে যাবে। কিন্তু জীবনে কোনোদিন আনন্দ পাব না তো।

মোতির মা। কিছুই বলা যায় না ভাই।

কুমুদিনী। খুব বলা যায়। আমার জীবনটা নির্লজ্জের মতো ফাঁকা হয়ে গেছে। নিজেকে ভোলাবার মতো আড়াল আর কোথাও বাকি নেই। তাই তো ভাবি যে এখন থেকে কেবল কষ্ট পাব, কষ্ট দেব, আর মনে জানব এ সমস্তই আমার নিজের সৃষ্টি!

মোতির মা। তুমি কি বড়োঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর?

কুমুদিনী। পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সব জিনিসই পছন্দমতো করে নেওয়া সহজ হত। কিন্তু এখন যেন সে উপায় আর রইল না। মনে হয় আমি

যেন পথ ভুলে গেছি! আগে মনে করতুম ভালোবাসাই সহজ। সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে; আজ দেখছি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্মজন্মান্তরের সাধনায় ঘটে। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো ভাই, সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?

মোতির মা। ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়। নইলে সংসার চলবে কী করে?

কুমুদিনী। সেই আশ্বাস দাও আমাকে। আর কিছু না হই, ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি। সেইটাই কঠিন সাধনা! স্বামীকে ভালোবাসি নে এ কথা বলা পাপ, ভাবা পাপ! মন তো আমার কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে রাজি নয়। কিন্তু কই, তবু তো বুকের মাঝে তাঁকে পাচ্ছি নে যেমন করে পেয়েছিলুম আমার ঠাকুরকে। আচ্ছা, দাদাকে টেলিগ্রাফ করতে বলেছিলুম, করেছ?

মোতির মা। হাঁ, তখনি করেছি।

কুমুদিনী। উত্তর আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

মোতির মা। তোমার মনের উদ্‌বেগে দেরি বোধ হচ্ছে।

কুমুদিনী। মন কেন এত ছটফট্ করছে, বলব?

মোতির মা। বলো।

কুমুদিনী। ঠাকুরকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, দাদা ছাড়া ত্রিভুবনে আমার আর কেউ নেই। সেই আমার দাদার জন্যে দিনরাত্রি ভাবনা। যে দেবতা জীবনের সফলতা থেকে আমাকে বিনা দোষে নিঃশেষে বঞ্চিত করতে পারলেন, আমার এই দুঃখে তাঁর কি কোনো দরদ আছে, দাদাকেই আমি এই প্রশ্ন করব।

মোতির মা। তাই কোরো।

কুমুদিনী। আমার টেলিগ্রামের জবাব এলে তখন যেন পাই বোন।

মোতির মা। আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

[নেপথ্যে গান]

[ আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত,
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত॥
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্মমাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষ-পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত॥
আজ কিসের পিপাসা মিটিল না ওগো
পরম পরানবল্লভ!
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব
সকরুণ করপল্লব!
নাথ, যার যাহা আছে তার তা থাক্,
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত॥ ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘর। সেদিনই মধ্যাহ্ন

মধুসূদন। বড়োবউয়ের কানে মন্ত্র ফোসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করি নে। আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছেমতো চলবে, আর-কারও পরামর্শ নিয়ে চলবে না, এই হল নিয়ম।

নবীন। সে তো ঠিক কথা।

মধুসূদন। তাই আমার ইচ্ছে মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।

নবীন। ভালো হল দাদা। আমি আরো ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।

মধুসূদন তার মানে?

নবীন। কদিন থেকে দেশে যাবার জন্যে মেজোবউ অস্থির করে তুলেছে। জিনিসপত্র সব গোছানোই আছে, এবার একটা ভালো দিন দেখলেই যাত্রা করবে।

মধুসূদন। তার মানে! এ-সব কি তাঁর নিজের ইচ্ছেতেই হবে নাকি! আর, আমি বুঝি বাড়ির কেউ নই! কেন, যাবার জন্যে এত তাড়া কিসের শুনি।

নবীন। বাড়ির গিন্নি এখন এ বাড়িতে এসেছেন। এখন এ বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। তাই মেজোবউ বললে, আমি মাঝে থাকলে কী জানি কখন কী কথা ওঠে, তার চেয়ে মানে মানে সরে যাওয়াই ভালো।

মধুসূদন। এ-সব কথার বিচারভার কি তাঁরই উপর নাকি!

নবীন। কী করব বলো দাদা, মেয়েমানুষের বুঝ।

মধুসূদন। দেখো নবীন, মেজোবউকে আদর দিয়ে তুমিই বিগড়ে দিয়েছ। তাকে একটু কড়া করেই বলো, এখন তার যাওয়া চলবে না। তুমি পুরুষমানুষ, নিজের ঘরে তোমার শাসন চলবে না, এ আমি দেখতে পারি নে।

নবীন। চেষ্টা করে দেখব দাদা। কিন্তু—

মধুসূদন। আচ্ছা, আমার নাম করেই বলো, এখন তার যাওয়া চলবে না। যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমিই ঠিক করে দেব।

নবীন। না, তুমিই বললে কিনা, মেজেবউকে দেশে পাঠাতে হবে। তাই ভাবছি—

মধুসূদন। আমি কি বলেছি এই মুহূর্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে? যাও যাও, ও-সব চালাকি চলবে না আমার কাছে। আমার আপিসের গাড়ি বলে দাও।

[ প্রস্থান

কুমুদিনীকে নিয়ে মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। এই ওঁর আপিস-ঘর।

কুমুদিনী। কোথা ওঁর ডেস্ক, কোথায় উনি চিঠি রাখেন?

মোতির মা। মাফ করো, সে আমি বলতে পারব না।

কুমুদিনী। কেন পারবে না?

মোতির মা। তোমাকে দুঃখে ফেলা হবে।

কুমুদিনী। দাদার চিঠি আমাকে দিল না তার চেয়ে দুঃখ আমাকে আর কী দেবে?

মোতির মা। আচ্ছা, তুমি তবে যাও, তোমার চিঠি আমিই নিয়ে গিয়ে দেব।

কুমুদিনী। সে হবে না, আমার দায় আমিই নেব। আমার চিঠি যদি কেউ চুরি করে রাখে তবে আমিই সেটা উদ্ধার করব।

মোতির মা। আমি জানি ওঁকে, ক্ষমা করবেন না।

কুমুদিনী। নিজের চিঠি নিজে চুরি করে পড়তে হল এর চেয়ে শাস্তি কী হতে পারে?

মোতির মা। কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয় সে বিচার এ বাড়ির কর্তা করে দেন।

কুমুদিনী। আমি বিচারের অপেক্ষা করতে পারব না। দেখিয়ে দাও— ওই চিঠিখানির জন্যে বুকের পাঁজরগুলোর উপর মনটা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরছে। কী দুঃখ বুঝতে পারছ না কি?

দেরাজ খুলে

মোতির মা। ওই তোমার চিঠি সক্কলের উপরে।

চিঠি তুলে নিয়ে

কুমুদিনী। এ তো আজকের তারিখের ছাপ নয়। আচ্ছা, তুমি যাও।

মোতির মা। থাকি-না তোমার কাছে?

কুমুদিনী। না, যাও।

মোতির মা। তা, চিঠিটা নিয়ে চলে এসো।

কুমুদিনী। এই ডেস্কেই রেখে যাব।

[মোতির মার প্রস্থান

আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই বলে চুরি করে চুরির শোধ দিতে চাই নে।

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। এ ঘরে তুমি যে!

কুমুদিনী। আমার নামে দাদার চিঠি এসেছে কি না দেখতে এসেছিলেম।

মধুসূদন। চিঠি তো আমিই তোমার কাছে নিয়ে যেতুম, সেজন্যে তোমার তো আসবার দরকার ছিল না।

কুমুদিনী। তোমারও নিয়ে যাবার দরকার নেই। এ চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে চাও নি— পড়ব না। এই ছিঁড়ে ফেললুম। কিন্তু এমন কষ্ট তুমি আমাকে আর কখনো দিয়ো না।

[মুখে আঁচল চেপে ধরে দ্রুত প্রস্থান

সগর্জনে

মধুসূদন। নবীন!

নবীনের প্রবেশ

নবীন। আজ্ঞে।

মধুসূদন। ডেস্কের চিঠির কথা বড়োবউকে কে বললে?

নবীন। আমিই বলেছি।

মধুসূদন। হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠল কোথা থেকে?

নবীন। বউরানী আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাই বলেছিলুম।

মধুসূদন। আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুর সয় নি?

নবীন। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই।

মধুসূদন। তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে?

নবীন। উনি তো এ বাড়ির কর্ত্রী, কেমন করে জানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না? তিনি যা বলবেন আমি তা অমান্য করব এত বড়ো আস্পর্ধা আমার নেই। এই আমি তোমার কাছে বলছি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন, তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মানব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।

মধুসূদন। নবীন, তোমাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি। এ-সব বুদ্ধি তোমার নিজের

নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে জোগায়। যাই হোক, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেনেই তোমাদের দেশে যেতে হবে।

নবীন। যে আজ্ঞা। বেশ, তাই যাব।

প্রস্থানোদ্যম

মধুসূদন। শোনো। তোমার মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও। এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র জোগাতে পারব না।

নবীন। তা জানি। দেশে আমার অংশে যে জমি আছে তাই আমি চায করে খাব।

মধুসূদন। হাঁ, ওই চাষাগিরিই তোমার কপালে আছে।

[প্রস্থান

মোতির মার প্রবেশ

নবীন। দেখো মেজোবউ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেক বার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার আমার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়ে কী করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয়, দাদা তো বুঝলে না। সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।

মোতির মা। সে কথা তোমার দাদার বুঝতে বাকি থাকবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না।

নবীন। লক্ষ্মণ দেওর হবার ভাগ্য আমার সইল না এইটাই মনে লাগছে। যা হোক, তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলো, এ বাড়িতে যখন সময় আসে তখন তার আর তর সয় না।

মোতির মা। হুকুম হয়েছে তবে, এবার বিদায় নিতে হবে?

নবীন। হাঁ, আমাদের আর সহ্য করতে পারছেন না। ভেবেছেন তাঁর অংশে অন্যায় ভাগ বসাচ্ছি আমরা।

মোতির মা। তাঁর ন্যায্য অংশ যে কী, কেমন করে তা পেতে হয়, তাই কি তোমার দাদা জানেন? অথচ লোভটুকু আছে যোলো আনা। কিন্তু পাচ্ছেন না বলে পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের উপর রেগে উঠছেন। অথচ হুঁশ নেই যে লক্ষ্মী-বিদেয় নিজেই করে বসে আছেন।

কুমুদিনীর প্রবেশ

[নবীন]। বৌদি, বিদায় নেব, পায়ের ধুলো দাও।

কুমুদিনী। কেন ভাই!

নবীন। তোমাকে সেবা করতে পারব এই খুশিতে বুক ভরে উঠেছিল। কিন্তু নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন? ক'টা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েছি, কিছুই করতে পারি নি, এই আফসোসটাই মনে রয়ে গেল।

কুমুদিনী। কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

নবীন। দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এখানে আর আমাদের সইল না।

কুমুদিনী। তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।

মোতির মা। তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কী দিদি?

কুমুদিনী। কেন?

মোতির মা। বড়োঠাকুর তা হলে আমাদের মুখ দেখবেন না।

কুমুদিনী। তা হলে আমারও দেখবেন না।

মোতির মা। কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে এ শাস্তি নয়, এ যে আমাদের নিজেদের পাপের জন্যে।

কুমুদিনী। কিসের পাপ তোমাদের?

মোতির মা। আমরাই তো খবর দিয়েছি তোমাকে।

কুমুদিনী। আমি যদি খবর জানতে চাই তা হলে খবর দেওয়াটা অপরাধ?

নবীন। কর্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।

কুমুদিনী। তাই ভালো। অপরাধ তোমরাও করেছ, আমিও করেছি। একসঙ্গেই ফলভোগ করব। ঠাকুরপো, দ্বিধা কোরো না, আমারও যাবার আয়োজন করো।

নবীন। আচ্ছা, দেখি ব'লে, দাদা কী বলেন।

[প্রস্থান

মোতির মা। দিদি, এটা একটা ভুল হবে না তো?

কুমুদিনী। কোন্‌টা?

মোতির মা। এই ছেড়ে চলে যাওয়া?

কুমুদিনী। তাড়িয়েই যদি দেয় তো কী করব?

মোতির মা। কিন্তু দিদি—

কুমুদিনী। না ভাই, এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। এ শাস্তি আমাকেই দেওয়া হয়েছে। আমি যাদের স্নেহ করি একে একে তাদের সরিয়ে দিয়ে ভেবেছেন আমাকে পাবেন সম্পূর্ণ করে। কিন্তু তাই কি কখনো হয়? একটা জিনিসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললে পাবার মতো তাতে বাকি থাকে কী? আমার দুর্ভাগ্য! দেবার মতো করে যখনি থালা সাজিয়ে নৈবেদ্য গড়ে তুলেছি তখনি কে যেন ধাক্কা দিয়ে আমার নৈবেদ্য ছারখার করে দিচ্ছে!

মোতির মা। কিন্তু আমরা যে গরিব দিদি!

কুমুদিনী। আমিও কম গরিব না। আমারও বেশ চলে যাবে। আজ আমার কী মনে হচ্ছে জান? এই-যে আমার হঠাৎ বিয়ে হল, এ তো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুললুম। কিন্তু কী অদ্ভুত মোহে, কী ছেলেমানুষি ক'রে! যা-কিছুতে সেদিন আমাকে ভুলিয়েছিল তার মধ্যে সমস্তই ছিল ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিষম জেদ, যে, সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পারত না। দাদা বাধা দেন নি বটে, কিন্তু কত ভয় পেয়েছেন, কত উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন, তা কি আমি বুঝতে পারি নি! বুঝতে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও দমন করি নি।

মোতির মা। আচ্ছা দিদি, তুমি যে বিয়ে করতে মনস্থির করলে, কী ভেবে?

কুমুদিনী। তখন মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের শ্লোকের সঙ্গে নিজের জীবনকে গেঁথে দেওয়া খুব সহজ।

মোতির মা। দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয় নি।

কুমুদিনী। আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসার-সমুদ্রে ভাসতে হয়। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।

মধুসূদনের প্রবেশ। মোতির মার প্রস্থান

মধুসূদন। বড়োবউ, তুমি যেতে পারবে না।

কুমুদিনী। কেন?

মধুসূদন। আমি বলছি বলে।

কুমুদিনী। তোমার হুকুম?

মধুসূদন। হাঁ, আমার হুকুম।

কুমুদিনী। বেশ, তা হলে যাব না। তার পরে, আর কী হুকুম আছে বলো।

মধুসূদন। না, আর কিছু নেই। শোনো, শোনো, তোমার জন্যে আংটি এনেছি।

কুমুদিনী। আমার যে আংটির দরকার ছিল সে তুমি পরতে বারণ করেছ, আর আমার আংটির দরকার নেই।

এক বাক্স আংটি খুলে

মধুসূদন। একবার দেখোই-না চেয়ে। এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটাই তুমি পরতে পার।

কুমুদিনী। তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটাই পরব।

মধুসূদন। আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।

কুমুদিনী। হুকুম করো তিনটেই পরি।

মধুসূদন। আমি পরিয়ে দিই?

কুমুদিনী। দাও পরিয়ে—

মধুসূদন আংটি তিনটি পরালে

আর কিছু হুকুম আছে?

মধুসূদন। বড়োবউ, রাগ করছ কেন?

কুমুদিনী। আমি একটুও রাগ করছি নে।

মধুসূদন। আহা, যাও কোথা? শোনো, শোনো।

কুমুদিনী। কী বলো।

মধুসূদন। আচ্ছা, যাও। দাও, আংটিগুলো ফিরিয়ে দাও।

কুমুদিনী তাই করিল

যাও চলে।—

[কুমুদিনীর প্রস্থান

নবীন!

নবীনের প্রবেশ

মধুসূদন। বড়োবউকে তোরা খেপিয়েছিস?

নবীন। দাদা, কালই তো আমরা যাচ্ছি। তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে আর কথা কব না। আমি আজ এই স্পষ্ট বলে যাচ্ছি— বউরানীকে খেপাবার জন্যে সংসারে আর কারও দরকার হবে না, তুমি একাই তা পারবে। আমরা থাকলে তবু যদি-বা কিছু ঠাণ্ডা রাখতে পারতুম, কিন্তু সে তো তোমার সইবে না!

মধুসূদন। জ্যাটামি করিস নে। রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েছিস।

নবীন। এ কথা ভাবতেই পারি নে তো শেখাব কী?

মধুসূদন। দেখ্, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস, তোদের ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

নবীন। দাদা, এ-সব কথা বলছ কাকে? যেখানে বললে কাজে লাগে সেখানে বলো গে।

মধুসূদন। তোরা কিছু বলিস নি?

নবীন। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কল্পনাও করি নি।

মধুসূদন। বড়োবউ যদি এখন জেদ ধ'রে বসে, কী করবি তোরা?

নবীন। তোমাকে ডেকে আনব। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে পারবে। তার পরে যুদ্ধের সংবাদ কাগজে রটলে মেজোবউকে সন্দেহ কোরো না।

মধুসূদন। চুপ কর্। বড়োবউ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক। আমি কিছু বলব না।

নবীন। আমরা তাঁকে খাওয়াব কী করে?

মধুসূদন। তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে। যা, যা বলছি, বেরো ঘর থেকে।

[প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্যের আরম্ভে

নবীন ও মোতির মা

নবীন। মেজোবউ, আমি একটা পাপকর্মের ভূমিকা রচনা করেছি।

মোতির মা। সে শক্তি তোমার আছে। তার ফল হবে কী?

নবীন। পাপের ফল হবে পুণ্য। অন্তত সেই আশা।

মাতির মা। কী কুকীর্তি করেছ শুনি!

নবীন। ব্যাঙ্কটস্বামী নাম দিয়ে এক গ্রহাচার্য খাড়া করেছি। মাদ্রাজি। মস্ত ঝুঁটি, কপালে তিলক। মোটা লালপেড়ে ধুতি, চটিজোড়া আধখানা নৌকোর গড়নে।

মোতির মা। জ্যোতিষি নাকি?

নবীন। সাতপুরুষে না। ম্যাকিনন কোম্পানির আপিসে হিসেবের খাতা লেখে। চলনসই বাংলা জানে।

মোতির মা। কী করবে সে?

নবীন। তাকে দিয়ে যেটা বলাতে চাই বলিয়ে নেব।

মোতির মা। উলটো বলবে না তো?

নবীন। খুব কষে তাকে তালিম দিয়ে নিয়েছি।

মোতির মা। তোমার দাদা এ-সব মানে না যে।

নবীন। ব্যাবসা যখন ভালো চলে তখন মানবার দরকার করে না। সম্প্রতি ওঁর লোকসানের কপাল পড়েছে, এইবার লাভের কপাল খুলবে দৈবজ্ঞের।

মোতির মা। কথাটা তুললেই বড়োঠাকুর তোমাকে কষে বকুনি দেবেন।

নবীন। সেটা বকুনির ভান, বুদ্ধির গুমর দেখাবার জন্যে। সেই গুমর ভাঙে ভয়ের তাড়া খেলেই। বোকামি বেরিয়ে পড়ে নির্লজ্জ হয়ে ভিতর থেকে, যখন বিপদ ঘাড়ে দেয় চাপ।

মোতির মা। আমরা তো চলে যাচ্ছি, বুদ্ধির লঙ্কাকাণ্ড করবে কখন?

নবীন। এখনি। এই রাত্রেই।

মোতির মা। এখনি? কী বলো!

নবীন। সময় কই! লোকটাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছি। শেষ চেষ্টা করে যাব। সত্যি গ্রহ যদি আমাদের তাড়া করে তবে মিথ্যে গ্রহ লাগিয়ে তাকেই লাগাব তাড়া।

মোতির মা। দিবেরাত্রি অনেক ভুল করে থাক, তার উপরে নাহয় আরো একটা হবে, বোঝার উপর শাকের আঁটি। ওই আসছেন বড়োঠাকুর, যাই আমি।

[প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

নবীন। দাদা, একটু দরকার আছে।

মধুসূদন। কিসের দরকার? বিপ্রদাসবাবুর মোক্তারি করতে চাও?

নবীন। এত বড়ো শক্তি আমার নেই। দরকার আমার নিজের।

মধুসূদন। কী শুনি।

নবীন। শুনলে তুমি রাগ করবে।

মধুসূদন। না শুনলে আরো রাগ করব।

নবীন। কুম্ভকোনাম থেকে এক জ্যোতিষী এসেছে, তাকে দিয়ে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করাতে চাই।

মধুসূদন। কোথাকার মূর্খ! এ-সব বিশ্বাস কর নাকি?

নবীন। সহজ অবস্থায় করি নে, ভয় লাগলেই করি।

মধুসূদন। ভয়টা কিসের শুনি।

নবীন মাথা চুলকোতে লাগল

মধুসূদন। ভয়টা কাকে বলোই-না।

নবীন। এ সংসারে তোমাকে ছাড়া ভয় কাউকেই করি নে। দেখছি তোমার ভাবগতিক ভালো নয়, তাই স্পষ্ট করে জানতে চাই গ্রহ কী করতে চান আমাকে নিয়ে, আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন্ নাগাত।

মধুসূদন। তোমার মতো নাস্তিক, কিচ্ছু বিশ্বাস কর না, শেষকালে—

নবীন। দেবতার 'পরে বিশ্বাস থাকলে গ্রহকে বিশ্বাস করতুম না, দাদা। ডাক্তারকে যে মানে না, হাতুড়েকে মানতে তার বাধে না।

মধুসূদন। লেখাপড়া শিখে, বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে!

নবীন। লোকটার কাছে যে ভৃগুসংহিতা রয়েছে। যেখানে যে-কেউ যে-কোনোখানেই জন্মাবে সকলেরই কুষ্ঠি একেবারে তৈরি— খাস সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এর উপরে তো আর কথা চলে না। হাতে হাতে পরীক্ষা করে নাও।

মধুসূদন। বোকা ভুলিয়ে যারা খায় ভগবান তাদের পেট ভরাবার জন্যে তোমাদের মতো বোকা জুগিয়ে থাকেন।

নবীন। আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মতো বুদ্ধিমান। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার বুদ্ধি খাটিয়ে দেখোই-না। তোমার কাছে বড়ো বড়ো ঋষিমুনিদের ফাঁকিও ধরা পড়বে।

মধুসূদন। আচ্ছা, দেখব তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।

নবীন। তোমার যে-রকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় ভুল হয়ে যায়। মানুষকে বিশ্বাস করলে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, গ্রহদেরও সেই দশা। এই দেখো-না, সাহেবগুলো গ্রহ মানে না, তাই তারা তেরস্পর্শে যাত্রা করলেও লড়াই জেতে। সেদিন ছিল দিক্‌শূল, আরো কত কী, বেরিয়ে পড়ল তোমাদের ছোটোসাহেব, ঘোড়দৌড়ে জিতে এল বাজি— আমি হলে বাজি জেতা দুরস্তাং, ঘোড়াটা ছুটে এসে লাথি বসিয়ে দিত আমার পেটে। দাদা, এই-সব পাজি গ্রহনক্ষত্রের উপর তোমার বুদ্ধি খাটিয়ো না— একটু বিশ্বাস মনে রেখো।

মধুসূদন। আচ্ছা, কালকে তাকে দেখা যাবে।

নবীন। আমি তাকে আনিয়েছি। তোমাকে নির্জনে পাব বলে এই দশটা রাত্রেই তাকে নিয়ে এলুম।

মধুসূদন। কোথায় সে?

নবীন। চলো-না সেখানে গিয়ে একবার—

মধুসূদন। না না, বাইরে নয়, লোকজন এসে পড়বে।

নবীন। তা হলে কি—

মধুসূদন। হাঁ, তাকে এইখানেই ডেকে আনো, শোবার ঘরেই।

[ নবীনের প্রস্থান

চঞ্চলভাবে মধুসূদন পায়চারি করে বেড়াতে লাগল

কেদার!

কেদারের প্রবেশ

কেদার। মহারাজ!

মধুসূদন। এই কার্পেটটা সরিয়ে নিয়ে যা। বেটা কোন্ বড়োবাজারের ধুলো পায়ে করে আনবে!

কেদারের তথাকরণ। বেঙ্কটকে নিয়ে নবীনের প্রবেশ।

কেদারের প্রতি

মধুসূদন। এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? যা তুই!

[ কেদারের প্রস্থান

দেখো, আমার কিন্তু সময় নেই, জরুরি কাজ। আজ রাত্রেই খাতা নিয়ে পড়তে হবে।

নবীন। কিছু ভয় নেই দাদা, দেরি হবে না। আসল কাজটা দশ হাজার বছর আগেই সারা হয়ে আছে। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই গ্রহচক্রান্তের খোঁজ পাওয়া যাবে।

মধুসূদন। আচ্ছা, তা হলে চট্‌পট্‌ শুরু করে দাও স্বামীজি।

সামনে ঘড়ি খুলে রেখে দিল

মাটিতে খড়ি দিয়ে বেঙ্কটের আঁক কষা

নবীন। দাদার ঠিকুজি এই আমি এনেছি। দেখতে চান?

উল্‌টে পালটে দেখে, মাথা নেড়ে

বেঙ্কট। প্রমাদবহুলমেতৎ।

চমকে উঠে

মধুসূদন। কী বলছ স্বামী, প্রমাদ? প্রমাদ ঘটেছে!

নবীন। ভাষায় বলো প্রভু।

বেঙ্কট। ভুলানি প্রভূতানি।

নবীন। বুঝেছি। ভুল থাকে তো ওটা ফেলেই দাও-না।

আঁক কষে

বেঙ্কট। পঞ্চম বর্গঃ।

আঙুলের পর্ব গুনতে গুনতে

ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ। পঞ্চম বর্ণ, প ফ ব ভ ম।

মধুসূদন। বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় আওড়াতে শুরু করলে যে, একেবারে গোড়া থেকেই। তা হলে তো রাত পুইয়ে যাবে!

বেঙ্কট। পঞ্চাক্ষরকং।

হাঁটু চাপড়ে

নবীন। পঞ্চাক্ষর! বুঝেছি দাদা। কী আশ্চর্য!

মধুসূদন। কী বুঝলে?

নবীন। পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তাকে নিয়ে পাঁচটা অক্ষর। ম-ধু-সূ-দ-ন! জন্মগ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় এসে ঠেকেছে। এ'কে বলে পাঁচের ত্রিবেণীসংগম। কী বলো স্বামী?

গম্ভীরভাবে

বেঙ্কট। ইত্যেব।

নস্যগ্রহণ

নবীন। দাদা, দেখলে কাণ্ড? নামকরণ হয়েই গেছে ভৃগুমুনির খাতায়— সত্যযুগে— বাপ-মা তো উপলক্ষ। তপস্যার কী জোর! বাস্‌ রে! মনে করলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

বেঙ্কট। সংহর্ঘেঘঃ।

নস্যগ্রহণ

ব্যস্ত হয়ে

মধুসূদন। কী মানে?

নবীন। স্বামীজি, অর্থটা কী বলে দিন।

বেঙ্কট। লিখনমিদং।

একখানা কাগজ দিল।

নবীনকে

মধুসূদন। তুমি পড়ে দাও।

নবীন। অল্প যে একটু সংস্কৃত জানি তাতে দেখছি ভৃগুমুনি বলছেন, জাতকের ঘরে সম্প্রতি নববধূ-সমাগম, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! মনে আছে তো দাদা, বউরানী আমাদের ঘরে আসতে-না-আসতেই একদিনে মুনফা ফেঁপে উঠল।

বেঙ্কট। সাম্প্রতম কুপিতা লক্ষ্মীঃ।

নবীন। কী বল স্বামী? কুপিতা? সেই রকমটাই তো দেখা যাচ্ছে। লোকসান তো শুরু হয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে

মধুসূদন। এখন কী করতে হবে বলে দাও।

বেঙ্কট। প্রপরাপসংনির্‌দুর্‌ অভি অধি উপ আং।

ঝুঁকে পড়ে

মধুসূদন। কী হল, কী হল, কী বলছে?

বেঙ্কট। মনস্তুষ্টিঃ নাতিবিলম্বেন।

নবীন। ভৃগুমুনি লিখে দিয়েছেন বুঝি?

বেঙ্কট। এবমেব।

নবীন। দাদা, লক্ষ্মীর মন অবিলম্বে প্রসন্ন করতে হবে। ভাবনা কী! আমরা সকলে মিলে উঠেপড়ে লাগব। দাদা, আর দেরি নয়।

মধুসূদন। দেখো নবীন, তোমরা রজবপুরে যাওয়া বন্ধ করে দাও।

নবীন। যাব না? কিন্তু মালপত্র রওনা করব বলে গোরুর গাড়ি ডাকতে বলেছি।

মধুসূদন। থাক্‌ তোমার গোরুর গাড়ি। কেদার!

[ কেদারের প্রবেশ ]

কেদার। হুজুর!

মধুসূদন। দেওয়ানজিকে বলে দে— নবীন, স্বামীজিকে বকশিশ কত দেওয়া যায়?

নবীন। আপাতত পঁচিশ দিলেই চলবে।

মধুসূদন। কেদার, স্বামীজিকে দেওয়ানজির আপিসে নিয়ে যা, বল্‌ পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দিতে হবে। স্বামীজি, আবার কিন্তু আসছে রবিবারে অবশ্য অবশ্য আসা চাই, অনেক কথা শোনবার বাকি রইল।

[ বেঙ্কটকে নিয়ে কেদারের প্রস্থান

নবীন। ওই বেঙ্কটশাস্ত্রীর কথা একটুও বিশ্বাস করি নে দাদা। নিশ্চয় কারও কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে।

মধুসূদন। ভারি বুদ্ধি তোমার! যেখানে যত মানুষ আছে সক্কলের খবর আগেভাগে জুটিয়ে রাখা! সহজ কথা কিনা!

নবীন। এটাই তো সহজ। মানুষ জন্মাবার আগে কুষ্ঠি লেখা সহজ নয়। ভৃগুমুনি কি কুষ্ঠির

হিমালয় পর্বত বানিয়েছেন? বেঙ্কটের ঘরে সেটা ধরলই বা কোথায়!

মধুসূদন। এক আঁচড়ে লক্ষ লক্ষ কথা লিখতে পারতেন তাঁরা।

নবীন। অসম্ভব।

রেগে

মধুসূদন। অসম্ভব! যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়ান্স! যা যা, আর বকিস নে। [ নবীনের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

ছাদের এক কোণে শ্যামাসুন্দরী দাঁড়িয়ে দেখছিল

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। তুমি কী করছ এত রাত্রে এখানে?

শ্যামাসুন্দরী। শুয়ে ছিলুম। তোমার পায়ের শব্দ শুনে ভয় হল। ভাবলুম বুঝি—

মধুসূদন। আস্পর্ধা বাড়ছে দেখছি। আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়ো না। সাবধান করে দিচ্ছি!

শ্যামাসুন্দরী। চালাকি করব না ঠাকুরপো। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসি নি, কতকালের সম্বন্ধ। আমরা সইব কী করে?

মধুসূদন। আচ্ছা, থামো। বড়োবউকে পাঠিয়ে দাও আমার শোবার ঘরে।

[শ্যামাসুন্দরীর প্রস্থান

কুমুদিনীর প্রবেশ

মধুসূদন। এসো, বোসো।

কুমুদিনী সোফায় বসল, মধুসূদন বসল মেঝের উপর পায়ের কাছে। কুমুদিনী উঠতে যাচ্ছিল। মধুসূদন হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদন। উঠো না, শোনো আমার কথা। আমি এখনি আসছি। বলো তুমি চলে যাবে না।

কুমুদিনী। না, যাব না।

মধুসূদনের প্রস্থান। কুমুদিনীর মৃদুস্বরে গান।

নবীন ও মোতির মাকে নিয়ে মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। শোনো বলি, কাল তোমাদের রজবপুরে যেতে বলেছিলুম, কিন্তু তার দরকার নেই। কাল থেকে বিশেষ করে বড়োবউয়ের সেবায় তোমাকে নিযুক্ত করে দিলুম। এই বলে দিলুম, এখন যাও। [উভয়ের প্রস্থান

কাছে এসে

বড়োবউ— তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেছে!

কুমুদিনী চমকে উঠল

আশীর্বাদ জানিয়েছেন, লিখেছেন উদ্‌বেগের কারণ নেই। বড়োবউ, তুমি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছ?

কুমুদিনী। না, আমার রাগ নেই, একটুও না।

মধুসূদন। তোমার জন্যে কী এনেছি দেখো। তোমার দাদার দেওয়া সেই নীলার আংটি, আমাকে তুমি এই আংটি পরিয়ে দিতে দেবে? ভুল করেছিলুম তোমার হাতের আংটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে দোষ নেই।

মুক্তোমালা বের করে

তোমার জন্যে মুক্তার মালা এনেছি। কেমন, পছন্দ হয়েছে? খুশি হয়েছ? আমি পরিয়ে দেব?

কুমুদিনী নিরুত্তর

বুঝেছি, দরখাস্ত নামঞ্জুর। বড়োবউ, তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আগেই ডিস্‌মিস্‌। আচ্ছা, আর- একটি জিনিস যদি দিই তো কী দেবে বলো! যেমন জিনিসটি তার উপযুক্ত দাম নেব কিন্তু!

এস্রাজ এনে দিলে

কুমুদিনী। কোথায় পেলে?

মধুসূদন। তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেমন, এবার খুশি হয়েছ তো? তবে দাম দাও।

কুমুদিনী। কী?

মধুসূদন। বাজিয়ে শোনাও আমাকে। আমার সামনে লজ্জা কোরো না।

কুমুদিনী। সুর বাঁধা নেই।

মধুসূদন। তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বলো-না কেন!

কুমুদিনী। যন্ত্রটা ঠিক করে রাখি, তোমাকে আর-এক দিন শোনাব।

মধুসূদন। কবে, ঠিক করে বলো, কাল?

কুমুদিনী। বেশ, কাল।

মধুসূদন। সন্ধেবেলায় আফিস থেকে ফিরে এলে?

কুমুদিনী। তাই হবে।

মধুসূদন। এস্রাজটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছ?

কুমুদিনী। হয়েছি।—

মধুসূদন। বড়োবউ, আজ তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।

কুমুদিনী। মুরলীকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।

মধুসূদন। লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত করেছে?

কুমুদিনী। না, আমি নিজেই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিলে না। তুমি যদি হুকুম কর তবেই সাহস করে নেবে।

মধুসূদন। ভিক্ষে দিতে চাও? আচ্ছা, কই দেখি তোমার আলোয়ান!

কুমুদিনীর আলোয়ান নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলে

মুরলী!

মুরলীর প্রবেশ

মুরলী। হুজুর!

একশো টাকার নোট দিয়া

মধুসূদন। তোমার মা'জি তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন।

মুরলী। হুজুর—

মধুসূদন। হুজুর কী রে ব্যাটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যত

খুশি গরম কাপড় কিনে নিস। যা!—

মুরলীর প্রস্থান [ও পুনঃপ্রবেশ]

মুরলী। হুজুর, বড়োসাহেবের কাছ থেকে কানু দালাল এসেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে

মধুসূদন। আমি যত শীগগির পারি আসছি। ডেকে দিয়ে যাচ্ছি মেজোবউকে।

[প্রস্থান

মোতির মায়ের প্রবেশ

মোতির মা। দিদি!

কুমুদিনী। এসো ভাই, এসো। আমার দাদার টেলিগ্রাম পেয়েছি।

মোতির মা। কেমন আছেন? বড়োঠাকুর এনে দিলেন বুঝি?

কুমুদিনী। ভালোই আছেন।

মোতির মা। আজ মনে হল বড়োঠাকুরের মনটা যেন প্রসন্ন।

কুমুদিনী। এ প্রসন্নতা যে কেন ঠিক বুঝতে পারি নে। তাই ভয় হয়। কী করতে হবে কিছুই ভেবে পাই নে।

মোতির মা। কিছুই ভাবতে হবে না। এটুকু বুঝতে পারছ না, এতদিন উনি কেবল কারবার করে এসেছেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। এখন একটু একটু করে যতই তোমায় চিনছেন, ততই তোমার আদর বাড়ছে।

কুমুদিনী। বেশি দেখলে বেশি চিনবেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই ভাই। আমি নিজেই যেন দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা একেবারে শূন্য! সেইজন্যে হঠাৎ যখন দেখি উনি খুশি হয়েছেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠকেছেন; যেই সেটা ফাঁস হবে অমনি আরো রেগে উঠবেন!

মোতির মা। এ তোমার ভুল ধারণা। বড়োঠাকুর সত্যিই তোমাকে ভালোবাসেন, এ কথা মনে রেখো!

কুমুদিনী। সেইটেই তো আমার আরো আশ্চর্য ঠেকে!

মোতির মা। বলো কী দিদি! তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য! কেন, উনি কি পাথরের?

কুমুদিনী। আমি ওঁর যোগ্য নই।

মোতির মা। তুমি যার যোগ্য নও সে পুরুষ পৃথিবীতে আছে?

কুমুদিনী। ওঁর কত বড়ো শক্তি, কত সম্মান, কত মস্ত মানুষ উনি। আমার মধ্যে উনি কতটুকু পেতে পারেন?

মোতির মা। দিদি, তুমি হাসালে! বড়োঠাকুরের মস্ত বড়ো কারবার, কারবারি বুদ্ধিতে ওঁর জুড়ি নেই— সব মানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর আপিসের ম্যানেজারি করতে এসেছ যে যোগ্য নই বলে ভয় পাবে? বড়োঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা করে বলেন তো দেখবে, তিনিও স্বীকার করবেন যে তিনি তোমার যোগ্য নন। আর, তোমার নিজের দাম তুমি কী জান দিদি? যে দিন এদের বাড়িতে এসেছ সেই দিনই তোমার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হল, এরা সবাই মিলে তা শুধতে পারলে না। আমার কর্তাটি একেবারে মরিয়া। তোমার জন্য সাগর লঙ্ঘন করতে না পারলে স্থির থাকতে পারছেন না। আমি যদি তোমায় ভালো না বাসতুম তো এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যেত।

কুমুদিনী। কত ভাগ্যে এমন দেওর পেয়েছি।

মোতির মা। আর, তোমার এই জা'টি? বুঝি ভাগ্যস্থানে রাহু, না কেতু?

কুমুদিনী। তোমাদের একজনের নাম করলে আর-একজনের নাম করবার দরকার হয় না।

মোতির মা। ওই-যে আসছেন তোমার দেওর লক্ষ্মণটি।

নবীনের প্রবেশ

কুমুদিনী। এসো এসো ঠাকুরপো। কী খুঁজছ?

নবীন। ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখতে [না] পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছি।

মোতির মা। হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে!

নবীন। কে মণি আর কে ফণী তা চক্র নাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কী বলো বউরানী?

কুমুদিনী। আমাকে সাক্ষী মেনো না ঠাকুরপো।

নবীন। ও-সব কথা এখন থাক্। তোমার দাদার চিঠি এনেছি।

কুমুদিনী। দেখি দেখি।

দাদা আজ বিকেলে তিনটের সময় কলকাতায় এসেছেন।

নবীন। আজই এসেছেন! তাঁর তো—

কুমুদিনী। লিখেছেন, বিশেষ কারণে আজই আসতে হল।

নবীন। বউরানী, তাঁর কাছে তো কালই যাওয়া চাই।

কুমুদিনী। না, আমি যাব না।

মুখে আঁচল চেপে কান্না

মোতির মা। কেন, কী হল দিদি?

কুমুদিনী। দাদা আমাকে যেতে বারণ করেছেন।

নবীন। বউরানী, তুমি নিশ্চয় ভুল করেছ।

কুমুদিনী। না, এই তো লিখেছেন।

নবীন। কোথায় ভুল করেছ বলব? তোমার দাদা নিশ্চিত ঠিক করেছেন যে, আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দেবেন না। সেই অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি তোমার রাস্তা সোজা করে দিয়েছেন। বুঝতে পেরেছ?

কুমুদিনী। পেরেছি।

কুমুদিনীর চিবুক ধরে

মোতির মা। বাস্ রে! দাদার কথার একটু আড় হাওয়াতেই অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠে।

নবীন। বউরানী, কাল তা হলে তোমার যাবার আয়োজন করি।

কুমুদিনী। না, তার দরকার নেই।

নবীন। দরকার আমাদের পক্ষেই যে আছে। তোমার দাদাকে দেখতে যাবার বাধা ঘটলে সে নিন্দে আমাদের সইবে কেন? চুপ করে রইলে কেন বউরানী? তোমার যাওয়া ঘটবেই, আর কালই ঘটবে এ আমি বলে দিচ্ছি।

নবীন। কী উপায়টা ভেবেছ একটু খোলসা করে বলো দেখি বুদ্ধিমান।

নবীন। দাদাকে গিয়ে বলব, বউরানীকে ওদের ওখানে যেতে দেওয়া চলবেই না। তুমি হয়তো রাজি হতে পার, কিন্তু এ অপমান আমরা সইব না। শুনলেই দাদা আমার উপরে আগুন হয়ে উঠবে। তখনি পালকির হুকুম হবে। ওই-যে আসছেন দাদা।

[উভয়ের প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। শুতে আসবে না বড়োবউ? এখানে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে যে। চলো, তোমার আপন ঘরে। যেতে ইচ্ছে করছে না? বড়োবউ, দোষ করে থাকি তো মাপ করো! আমি তোমার অযোগ্য— আমাকে দয়া করবে না?

কুমুদিনী। ছি ছি, অমন করে বোলো না। আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমার দাসী। আমাকে আদেশ করো।

মধুসূদন। না, আর তোমাকে আদেশ করব না। তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এসো। নিজে থেকে কি তুমি আমার কাছে আসবে না, বড়োবউ?

কুমুদিনী। তুমি আদেশ করলে আমার কর্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু করতে পারি নে।

মধুসূদন। বেশ! তবে তুমি তোমার গায়ের ওই চাদরখানা খুলে ফেলো।

কুমুদিনী গায়ের চাদর নামিয়ে রাখল

আশ্চর্য সুন্দর তুমি!

কুমুদিনী। আমাকে তুমি মাপ করো, দয়া করো।

মধুসূদন। কী দোষ করেছ যে তোমায় মাপ করতে হবে?

কুমুদিনী। এখনো আমার মন তৈরি হয় নি। আমায় একটুখানি সময় দাও।

মধুসূদন। কিসের জন্য সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো!

কুমুদিনী। ঠিক বলতে পাচ্ছি না। কাউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত!

মধুসূদন। কিছুই শক্ত না! তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগছে না।

কুমুদিনী। তোমাকে ফাঁকি দিতে চাই না বলেই বলছি— আমাকে একটু সময় দাও।

মধুসূদন। সময় দিলে কী সুবিধে হবে শুনি? তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও? তোমার দাদা তোমার গুরু? সে যেমন চালাবে তুমি তেমনি চলবে?

কুমুদিনী। হাঁ! আমার দাদা আমার গুরু!

মধুসূদন। তাঁর হুকুম না হলে বিছানায় শুতে আসবে না, কেমন? তা হলে টেলিগ্রাম করে হুকুম আনাই, রাত অনেক হল!

কুমু যেতে উদ্যত

যেয়ো না বলছি!

কুমুদিনী। কী চাও বলো।

মধুসূদন। এখনি কাপড় ছেড়ে এসো, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

কুমুদিনী। দরকার নেই, এই আমার আটপৌরে কাপড়। এখন কী করতে চাও আমাকে বলো।

মধুসূদন। বড়োবউ, তোমার মন কি পাথরে গড়া?

হাত ধরে সবলে নাড়া দিয়ে

তুমি কি কিছুতে আমাকে সইতে পাচ্ছ না? কিছুতে আমার কাছে ধরা দেবে না? আমাকে কোনোমতেই সইতে পারছ [না]? আচ্ছা, যাও, যাও, তোমার দাদার কাছে যাও! কালই যেয়ো। কী, চুপ করে রইলে যে! যেতে চাও না?

কুমুদিনী। না, আমি চাই নে।

মধুসূদন। কেন?

কুমুদিনী। তা আমি বলতে পারি নে।

মধুসূদন। বলতে পার না? আবার তোমার সেই নুরনগরী চাল!

কুমুদিনী। আমি নুরনগরেরই মেয়ে।

মধুসূদন। যাও, তাদেরই কাছে যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে। কাঠ হয়ে বসে রইলে যে!

ঝাঁকানি দিয়ে

মাপ চাইতেও জান না?

কুমুদিনী। কিসের জন্যে?

মধুসূদন। তুমি যে আমার এই বিছানা[য়] শুতে পেরেছ সেই অযোগ্যতার জন্যে? রোসো, একটু দাঁড়াও। আমি বলে দিচ্ছি, কালই তোমাকে যেতেই হবে তোমার দাদার ওখানে, কিংবা যেখানে খুশি। ভেবে রেখেছ তোমাকে নইলে আমার চলবে না। এতদিন চলেছিল, আজও চলবে, ভালোই চলবে। যাও তবে, তোমার ওই ফরাসখানার ঘর পড়ে আছে, যাও ওখানে শুতে।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

যাক গে।

শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাব

কে, শ্যামা? কী করছ শ্যামা? কী চাই তোমার? আমায় কিছু বলবে? চলো, যাচ্ছি।

শ্যামাসুন্দরী। ঠাকুরপো, আমায় মেরে ফেলো তুমি। আর সইছে না—

মধুসূদন। ঈস্! তোমার গা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। চলো, চলো, হিমে নয়। চলো আমার ঘরে।

নিজের শালের এক অংশে শ্যামাকে আবৃত করে চলে গেল। সেই মুহূর্তে মোতির মা এবং নবীনের প্রবেশ

মোতির মা। না, এ আমি কিছুতেই সইব না। আমি বাধা দেব।

নবীন। তাতে আরো অনর্থ বাড়বে মেজোবউ। বাধা দিতে পারবে না।

মোতির মা। ভগবান কি তবে এও চোখ মেলে দেখবেন? এমন নীচের হাতে অপমান দিদির কপালে ছিল?

নবীন। আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। যে ঘুমন্ত ক্ষুধাকে বউরানী জাগিয়েছেন তার অন্ন জোগাতে পারেন নি। তাই সে অনর্থপাত করতে বসেছে।

মোতির মা। তবে কি এটা এমনি ভাবেই চলবে?

নবীন। যে আগুন নেভাবার কোনো উপায় নেই সেটাকে আপনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। আজ তোমার ঘরে আমাকে জায়গা দিতে হবে বোন।

মোতির মা। সে কী কথা!

কুমুদিনী। আজ রাত্তির থেকেই আমার শুভ নির্বাসন মঞ্জুর হয়েছে। কাল যাব দাদার ওখানে। ঠাকুরপো, রাগ কোরো না।

নবীন। বউরানী, ফিরে আসতে দেরি কোরো না এই কথাটা সব মন দিয়ে বলতে পারলে বেঁচে যেতুম— কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেইখানেই থাকো গিয়ে। অভাগা নবীনকে যদি কোনো কারণে কোনো কালে দরকার হয় স্মরণ কোরো।

কুমুদিনী। আপাতত দরকার তোমার ঘরে আশ্রয় নেওয়া। রাগ করবে না তো?

নবীন। রাগ করব আমি! দ্বারের বাইরে দরোয়ানি করবার এমন সুযোগ আর আমি পাব না।

কুমুদিনী। আনন্দে ঘুম তো হবে না সারা রাত— তোমাকেও যদি জাগিয়ে রাখি ঠাকুরপো!

নবীন। তা হলে তো আমার ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা হবে।

কুমুদিনী। তোমাদের ভাগ্নী ওই ফুট্‌কিকে ডেকে আনো তো ভাই।

নবীন। কেন, তাকে কিসের দরকার?

কুমুদিনী। সীতার অগ্নিপ্রবেশে সেই তো সীতা সেজেছিল। আবার শুনব তার মুখে তার পালার শেষ কথা ক'টি।

[নবীনের প্রস্থান

মোতির মা। ইতিহাসটা খুলে বলো দিদি।

কুমুদিনী। সেই একই কথা। হরিণী পিছু হটছিল, ব্যাধ তার গলায় ফাঁসটা ধরে জোরে দিয়েছিল টান। ফাঁস গেল ছিঁড়ে। ব্যাধ অহংকার করে বললে, বালোই হল; হরিণ নম্র হয়ে বললে, ভালোই হয়েছে।

মোতির মা। এইখানেই কি শেষ হবে বোন? অদৃষ্টের মৃগয়া যে এখনো চলবে।

কুমুদিনী। তা জানি, ওই ব্যাধের হাতে ধনুক আছে, বল্লম আছে, খাঁড়া আছে, আর হরিণীর আছে কেবল তার শেষ পরিত্রাণ মরণ।

ফুট্‌কিকে লইয়া নবীনের প্রবেশ

কুমুদিনী। ফুট্‌কি!

ফুট্‌কি। কী রানীমা!

কুমুদিনী। আগুন থেকে বেরিয়ে এসে সীতা কী বললেন গান গেয়ে বল্‌।

ফুট্‌কির গান

ফুরালো পরীক্ষার এই পালা,
পার হয়েছি আমি অগ্নিদহনজ্বালা॥
মা গো মা, মা গো মা,
এবার তুমিই জাগো মা,
তোমার কোলে উজাড় করে দেব অপমানের ডালা॥
তোমার শ্যামল আঁচলখানি
আমার অঙ্গে দাও মা, টানি[১],
আমার বুকের থেকে লও খসিয়ে নিঠুর কাঁটার মালা।
মা গো মা॥

কুমুদিনী। তার পরে যখন রাম বললেন, এসো আমার সিংহাসনে এসো, বোসো আমার বামে—

ফুট্‌কির গান

ফিরে আমায় মিছে ডাক', স্বামী।
সময় হল, বিদায় লব আমি॥
অপমানে যার সাজায় চিতা
সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা,
রাজাসনের কঠিন অসম্মানে
ধরা দিবে না সে যে মুক্তিকামী॥
আমায় মাটি নেবে আঁচল পেতে
বিশ্বজনের চোখের আড়ালেতে,
তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী।
ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাক' [ স্বামী ]॥

## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

ঘরে এসেই দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে
কুমুদিনী কাঁদতে লাগল

বিপ্রদাস। কুমু যে, এসেছিস? আয়, এইখানে আয়!

দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল
একটু পরিপাটি করতে করতে

কুমুদিনী। দাদা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে?

বিপ্রদাস। আমার চেহারা ভালো হবার মতো ইদানীং তো কোনো ঘটনা ঘটে নি— কিন্তু তোর এ কী রকম শ্রী! ফেকাশে হয়ে গেছিস যে!

ক্ষেমাপিসির প্রবেশ

কুমুদিনী। (প্রণাম করিল) পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।

পিসি। সাধে হয়েছে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ যে কিছুতেই ভালো হতে চায় না। কতদিনের অভ্যেস।

বিপ্রদাস। পিসি, কুমুকে খেতে বলবে না?

পিসি। খাবে না তো কী? সেও কি বলতে হবে? ওদের পাল্কির বেহারা দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেছি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসি গে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চললুম।

বিপ্রদাস ক্ষেমাপিসিকে ইশারা করে কাছে ডেকে
কানে কানে কিছু বলে দিলে

বিপ্রদাস। আজ তোকে কখন যেতে হবে?

কুমুদিনী। আজ যেতে হবে না।

বিস্মিত হয়ে

বিপ্রদাস। এতে তোর শ্বশুরবাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?

কুমুদিনী। না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ পরে

বিপ্রদাস। তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?

কুমুদিনী। না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।

খানিক বাদে

দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হয়েছে, এনে দিই।

বিপ্রদাস। না, সময় হয় নি। তুই বোস্।— কুমু, আমার কাছে খুলে বল্, কী রকম চলছে তোদের।

কুমুদিনী। দাদা, আমি সবই ভুল বুঝেছি, আমি কিছুই জানতুম না।

কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে

বিপ্রদাস। আমি তোকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারি নি। মা থাকলে তোকে তোর

শ্বশুরবাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।

কুমুদিনী। আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।

আচ্ছা, দাদা, স্বামীর 'পরে কোনোমতে মন প্রসন্ন করতে পারছি নে, এটা কি আমার পাপ?

বিপ্রদাস। কুমু, তুই তো জানিস, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হতে পারে যে ভালোমন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম হয় না।

কুমুদিনী। যেমন মীরাবাইয়ের জীবন। মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?

বিপ্রদাস। কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েছিস।

কুমুদিনী। এক সময়ে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন সংকটে পড়লুম তখন দেখি, প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য করে তুলতে পারছি নে। আমার সবচেয়ে দুঃখ সেই।

বিপ্রদাস। কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিস নে, রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা বলে তো মরে না। যা পেয়েছিস, তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হয়ে গেছে।

কুমুদিনী। সেই আশীর্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন বলেই।

দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তামাকে ক্লান্ত করছি।

বিপ্রদাস। কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা যে আমার অভ্যেস! আজ যদি তোর কথা জানা বন্ধ হয়ে যায়, তোর জন্যে ভাবতে না পাই, তা হলে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাতড়াতে গিয়েই তো মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে

কুমুদিনী। আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না, দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।

বিপ্রদাস। আচ্ছা, থাক্ ও-সব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে করছে তেমনি করে আজ তোকে শেখাই।

কুমুদিনী। ভাগ্যি শিখিয়েছিলে দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও।

দাদা, কিছুদিন আগে মনে মনে গুরু খুঁজছিলুম,— আমার দরকার কী? তুমি যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েছ।

বিপ্রদাস। কুমু, আমাকে লজ্জা দিস নে। আমার মতো গুরু রাস্তায়-ঘাটে মেলে, তারা অন্যকে যে মন্ত্র দেয় নিজে তার মানেই জানে না। কুমু, কতদিন এখানে থাকতে পারবি ঠিক করে বল্ দেখি।

কুমুদিনী। যতদিন না ডাক পড়ে।

বিপ্রদাস। তুই এখানে আসতে চেয়েছিলি?

কুমুদিনী। না, আমি চাই নি।

বিপ্রদাস। এর মানে কী?

কুমুদিনী। মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। তোমার কাছে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট। যতদিন থাকতে পারি সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হচ্ছে না, খেয়ে নাও।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। মুখুজ্জেমশায় এসেছেন।

একটু ব্যস্ত হয়ে উঠে

বিপ্রদাস। ডেকে দাও।

[চাকরের প্রস্থান

কালুর প্রবেশ। কুমুদিনী প্রণাম করল

কালু। ছোটোখুকি, এসেছ? এইবার দাদার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

কুমুদিনী। দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না?

বিপ্রদাস হাত ওলটালে

কুমুদিনী। বার্লি ভালো করে তৈরি করে আনি, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

[প্রস্থান

উদ্‌বিগ্নমুখে

বিপ্রদাস। কালুদা, খবর কী বলো।

কালু। তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজি খেলার মতো করে— অত্যন্ত বেশি সুদ চায়, সে আমাদের পোষাবে না।

বিপ্রদাস। কালুদা, সুবোধকে তার করতে হবে আসবার জন্যে। আর দেরি করলে তো চলবে না।

কালু। আমারও ভালো ঠেকছে না। সেবারে তোমার সেই আংটি-বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ করতে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হল না; তখনি বুঝলুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জি-মতো একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এঁটে ধরবে।

বিপ্রদাস চুপ করে ভাবতে লাগল

কালু। দাদা, ছোটোখুকি যে হঠাৎ আজ সকালে চলে এল, রাগারাগি করে আসে নি তো? মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখতে হবে।

বিপ্রদাস। কুমু বলছে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েছে।

কালু। সম্মতিটার চেহারা কীরকম না জানলে মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। কত সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কী বলব দাদা। রাগে সর্ব অঙ্গ যখন জ্বলছে তখনো ঠাণ্ডা হয়ে সব সয়েছি। গৌরীশঙ্করের পাহাড়টার মতো, দুপুর রোদ্দুরেও তার বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, এ'কে সামলে চলা কি সোজা কথা!

কুমু এল বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধরে

কুমুদিনী। দাদা, খেয়ে নাও।

কালুদা, আমাকে সব কথা বলতে হবে।

কালু। কী কথা বলতে হবে দিদি।

কুমুদিনী। তোমাদের কী একটা নিয়ে ভাবনা চলছে।

কালু। বিষয় আছে ভাবনা নেই, সংসারে এও কি কখনো সম্ভব হয় খুকি? ও-যে কাঁটাগাছের

ফল, ক্ষিদের চোটে পেড়ে খেতে হয়, পাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়েও যায়।

কুমুদিনী। সে-সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কী হয়েছে।

বিপ্রদাস। বিষয়কর্মের কথা মেয়েদের বলতে নিষেধ।

কুমুদিনী। আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কী নিয়ে কথা হচ্ছে। বলব?

কালু। আচ্ছা বলো।

কুমুদিনী। আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।

কালু সবিস্ময়ে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল

আমাকে বলতেই হবে, ঠিক বলেছি কি না।

কালু। দাদারই বোন তো, কথা না বলতেই কথা বুঝে নেয়।

কুমুদিনী। কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার করতে এসেছে।

কালু। তা ধার করেই তো ধার শুধতে হবে; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হয়ে থাকাটা তো ভালো নয়।

কুমুদিনী। সে তো ঠিক কথা, তা টাকার জোগাড় করতে পেরেছ?

কালু। ঘুরে-ঘেরে দেখছি, হয়ে যাবে, ভয় কী?

কুমুদিনী। না, আমি জানি, সুবিধে করতে পার নি।

কালু। আচ্ছা ছোটোখুকি, সবই যদি জান, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলেবেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলে, গোঁফ হল কেমন করে? বলেছিলুম, সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম বলে। তাতেই প্রশ্নটার তখনি নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এখন হলে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হত। সব কথাই যে তোমাকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।

কুমুদিনী। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানতে হবে।

কালু। কী করে দাদার গোঁফ উঠল, তাও?

কুমুদিনী। দেখো, অমন করে কথা চাপা দিতে পারবে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেছি, টাকার সুবিধে করতে পার নি।

কালু। ও-সব কথা থাক্ খুকি, এখানে যে তুমি আজ চলে এলে, তার মধ্যে তো কোনো কাঁটাখোঁচা নেই? ঠিক সত্যি করে বলো।

কুমুদিনী। আছে কি না তা আমি খুব স্পষ্ট করে জানি নে।

কালু। স্বামীর সম্মতি পেয়েছ?

কুমুদিনী। না চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েছেন।

কালু। রাগ করে?

কুমুদিনী। তাও আমি ঠিক জানি নে; বলেছেন, ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।

কালু। সে কোনো কাজের কথা নয়; তার আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।

কুমুদিনী। গেলে হুকুম মানা হবে না।

কালু। আচ্ছা, সে আমি দেখব।

কুমুদিনী। চললুম, কাজ আছে।

[ কুমুদিনীর ও কালুর প্রস্থান

চাকরের প্রবেশ

চাকর। ও বাড়ির নবীনবাবু এসেছেন।

বিপ্রদাস। ডেকে আনো।

[চাকরের প্রস্থান]। নবীনের প্রবেশ

আসুন নবীনবাবু, এইখানে বসুন।

নবীন। আমার পরিচয়টা পান নি বোধ হচ্ছে। মনে করেছেন আমি রাজবাড়ির কোন্ আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোটো বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান করে আমায় আশীর্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু করেছেন কী? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেছেন?

বিপ্রদাস। শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। ঠাকুরপো, চলো, কিছু খাবে।

নবীন। খাব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। যতক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে পড়ে থাকবে।

কুমুদিনী। শর্তটা কী শুনি?

নবীন। আমাদের বাড়িতে থাকতেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাই নি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ওই তো সামনেই ঝুলছে।

বুঝতে পারছেন, বিপ্রদাসবাবু। বউরানীর দয়া হয়েছে। দেখুন-না ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য বলেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।

হেসে

বিপ্রদাস। কুমু, আমার ওই চামড়ার বাক্সয় আরো খান-কয়েক ছবি আছে, তোর ভক্তকে বরদান করতে চাস যদি তো অভাব হবে না।

আর-একটি কাজ কর্— ও ঘরে আমার বইগুলো একটু গুছিয়ে দে।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

কুমু তোমাকে স্নেহ করে।

নবীন। তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য বলেই ওঁর স্নেহ এত বেশি।

বিপ্রদাস। তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই, তুমি আমাকে কোনো কথা লুকিয়ো না।

নবীন। কোনো কথা আমার নেই যা আপনাকে বলতে আমার বাধবে।

বিপ্রদাস। কুমু যে এখানে এসেছে, আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।

নবীন। আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না, সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।

বিপ্রদাস। অনাদর ঘটেছে তবে?

নবীন। সেই লজ্জায় এসেছি। আর তো কিছুই পারি নে, পায়ের ধুলো নিয়ে মনে মনে মাপ চাই।

বিপ্রদাস। কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি?

নবীন। সত্যি কথা বলি, যেতে বলতে সাহস করি নে।

বিপ্রদাস। একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছিলুম। বেনামী বলে শ্রদ্ধা করে পড়ি নি। এই সেই চিঠি। এখন বোধ হচ্ছে সব কথা সত্যি।

নবীন। হাঁ, সত্যি।

বিপ্রদাস। এর প্রতিকার কিছু নেই?

নবীন। দৈবের হাতে হয়তো আছে।

বিপ্রদাস। এই নোংরামির মধ্যে কুমুকে পাঠিয়ে কি তার অপমান ঘটাব?

নবীন। আমাদেরও তা সইবে না। যে পর্যন্ত না হাওয়া শুধরে যায়, বউদিকে এখানে রাখা চাই। আমার মুখ দিয়ে আপনার সামনে-যে এমন কথা বুক না ফাটলে বেরোত না! নিজের বংশের লজ্জা স্বীকার করতেই এসেছি, বউরানীকে বাঁচাবার জন্যে।

বিপ্রদাস। আচ্ছা, আমাকে একটু ভাবতে দাও— জানি নে কী করা উচিত।

[নবীনের প্রস্থান

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। বই পরে গোছাব। কী তুমি ভাবছ আমাকে বলো।

বিপ্রদাস। ভাবছি দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মানতে হবে।

কুমুদিনী। তুমি উপদেশ দাও, আমি মানতে পারব দাদা।

বিপ্রদাস। আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়। ব্যথাটাকে আমারই আপনার মনে করে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝতে পারছি এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সকলের হয়ে।

বিপ্রদাস বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওয়ালা চৌকির
উপর বসতে যাচ্ছিল, কুমু ওর হাত চেপে ধরে

কুমুদিনী। শান্ত হও দাদা, উঠো না, তোমার অসুখ বাড়বে।

বিপ্রদাস। সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারেই নেই ব'লেই তাদের ওপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে, সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি? ও বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।

কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে· দিক।

কুমুদিনী। দাদা, তুমি কোন্ অপমানের কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে।

বিপ্রদাস। তুই কি তবে সব কথা জানিস নে?

কুমুদিনী। না, কতকটা আন্দাজে বুঝতে পারছি। কুৎসিতের আভাস দেখে এসেছি। তখন বিশ্বাস করতেও লজ্জা হয়েছিল, তাতেও নিজেকে ছোটো করতে হয়।

বিপ্রদাস। মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে।

কুমুদিনী। আমার ভয় হচ্ছে আজকেকার এই-সব কথাবার্তায় তোমার শরীর আরো দুর্বল হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস। না কুমু, ঠিক তার উল্‌টো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।

কুমুদিনী। কিসের লড়াই দাদা!

বিপ্রদাস। যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।

কুমুদিনী। তুমি তার কী করতে পার দাদা?

বিপ্রদাস। আমি তাকে না মানতে পারি। তা ছাড়া আরো আরো কী করতে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে, আজ থেকেই শুরু হল কুমু! এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর-কারো সঙ্গে আপস করে নয়। এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।

কুমুদিনী। আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা কোয়ো না। তুমি একটুখানি মাথায় জল দিয়ে এসো গে। [বিপ্রদাসের প্রস্থান

[ নূতন দৃশ্য ]

[ কুমুদিনী ]

মোতির মার প্রবেশ

কুমুদিনী। একি? তুমি যে!

কানে কানে কী বলবার পর

মোতির মা। বাড়িকে ভূতে পেয়েছে বউরানী। ওখানে টিকে থাকা দায়। তুমি কি যাবে না?

কুমুদিনী। আমার কি ডাক পড়েছে?

মোতির মা। না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চলবেই না।

কুমুদিনী। আমার কী করবার আছে? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কী করব?

মোতির মা। বল কী বউরানী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হলে চলবে না।

কুমুদিনী। সংসার বলতে কী বোঝ ভাই? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন? লজ্জা করে এ কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। অধিকার অন্তরে খুইয়েছি, এখন কি ওই-সব বাইরের জিনিস নিয়ে লোভ করা চলে?

মোতির মা। কী বলছ ভাই বউরানী? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না?

কুমুদিনী। সব কথা ভালো করে বুঝতে পারছি নে। আর কিছুদিন আগে হলে ঠাকুরের কাছে সংকেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে-সব ভরসা ধুয়ে মুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাটল না। আজ কতবার বসে বসে ভেবেছি, দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও, মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেছে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারি নে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।

মোতির মা। তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না?

কুমুদিনী। কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে কথাও সহজ নয়।

মোতির মা। আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা বলে দেখব। দেখি তিনি কী বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো?

কুমুদিনী। তিনি এলেন বলে।

বিপ্রদাসের প্রবেশ

মোতির মা প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

ব্যস্ত হয়ে

বিপ্রদাস। উঠে বোসো। এইখানে।

মোতির মা। না, এখানে বেশ আছি।

কুমুদিনী। দাদা, ইনি বিশেষ করে এসেছেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।

মোতির মা। না না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেছি ওঁর চরণ দর্শন করতে।

কুমুদিনী। উনি জানতে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কি না।

বিপ্রদাস। সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কী করে?

মোতির মা ফিস ফিস করে কী বলল। তার অভিপ্রায় ছিল, পাশে বসে কুমুদিনী তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে।

সম্মত না হয়ে

কুমুদিনী। তুমিই গলা ছেড়ে বলো।

আর-একটু স্পষ্ট করে

মোতির মা। যা ওঁর আপনারই, কেউ তাকে পরের করে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক-না।

বিপ্রদাস। সে কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

মোতির মা। কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না। পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।

বিপ্রদাস। স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্তী সম্রাটেরও না।

মোতির মা। একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।

বিপ্রদাস। যেতে হবেই এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।

মোতির মা। মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হল সেদিন সে যে দেহে-মনে বাঁধা পড়ল, তার তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।

কুমুর মাথায় হাত দিয়ে

বিপ্রদাস। একটা কথা তোকে বলি, কুমু, বোঝবার চেষ্টা করিস। ক্ষমতা জিনিসটা যেখানে পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলই হীনতার সৃষ্টি করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেছি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস।

অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিস, বুঝতে পারছিস নে, এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে! যত-সব ইচ্ছাকৃত দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।

মাথা নিচু করেই

কুমুদিনী। দাদা, তুমি কি বল স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?

বিপ্রদাস। অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না— এই আমার মত।

কুমুদিনী। যদি করে, স্ত্রী কি তাই ব'লে—

বিপ্রদাস। স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।

অধৈর্যের স্বরে

মোতির মা। আমাদের বউরানী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ করতেও পারে না।

উত্তেজিত কণ্ঠে

বিপ্রদাস। তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবছ। আর, যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান করবার অধিকার পেয়ে, সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্ছে, তার দুর্গতির কথা ভাবছ না কেন?

উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে

কুমুদিনী। দাদা, তুমি আর কথা কোয়ো না। তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমোদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে। যতই ঘা খাই, ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জান, তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায় ; আমরা অনেক মানি, তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি, হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব-কিছুকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক— তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারি নে।

বিপ্রদাস। সেইজন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিনীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র বলেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো করেই মানে।

কুমুদিনী। কী করব দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে, ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে? সেইজন্যেই ভাবি, দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাই তো মেয়েরা এত করে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে।

নেপথ্য থেকে

চাটুজ্জে। দাদা, এ ঘরে একবার এসো, একটি কথা বলবার আছে। দেরি হবে না।

বিপ্রদাস। এই যাই।

[প্রস্থান

মোতির মা। কী ঠিক করলে বউরানী?

কুমুদিনী। যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।

মোতির মা। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক, সংসারটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হলে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমুদিনী। নাহয় তাই হল। মরণের অপরাধ কী?

মোতির মা। অমন কথা বোলো না।

নবীনের প্রবেশ

কুমুদিনী। জানতুম ঠাকুরপোর আসতে বেশি দেরি হবে না।

নবীন। ন্যায়শাস্ত্রে বউরানীর দখল আছে। আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে

শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকে নি।

মোতির মা। বউরানী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছ। ও বুঝে নিয়েছে ওকে দেখলে তুমি খুশি হও, সেই দেমাকে—

নবীন। আমাকে দেখলেও খুশি হতে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

কুমুদিনী। ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা-কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চললুম।

মোতির মা। সে কী কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়ি ভাড়া করে ও কি আমাকে দেখতে এসেছে ভেবেছ?

কুমুদিনী। না, ওঁর জন্যে খাবার বলে দিই গে।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

মোতির মা। কিছু খবর আছে বুঝি?

নবীন। আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চলে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্টি-করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যাঁর অধিকারে সেটা এসেছে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে শোনা বলেই ঠাউরেছেন, নইলে পরকাল খোওয়াতে যাবেন কোন্ সাধে? জান তো, তুচ্ছ একটা জিনিস নড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিতটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা এক দমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। বললেন, এখনকার মতো থাক্। যেই ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, আমার ডেস্কের উপর বউরানীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থম্‌কে গেলেন। বুঝলুম আড় চাহনিটাকে সিধে করে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে দাদার লজ্জা বোধ হচ্ছে। বললুম, দাদা, একটু বোসো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোটো ভাজের সাধ, তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হতে পারে।

মোতির মা। ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোটো ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বলতে তোমার আজকাল দেখছি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?

নবীন। যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েছেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।

মোতির মা। বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।

নবীন। পণ করেছি স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন করে যাব, বউরানীর চরণে এই আমার দান।

মোতির মা। ঢাকাই কাপড় তখনি তখনি তোমার জুটল কোথায়?

নবীন। কোথাও না। কুরি মিনিট পরে ফিরে এসে বললুম, গণেশরাম সে কাপড় আমাকে না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেছে। কী জানি কেন, পৃথিবীতে আমারই কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারো হলে ছবিটা ধাঁ করে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।

মোতির মা। তুমিও তো লোভী কম নও। দাদাকে নাহয় সেটা দিতেই।

নবীন। তা দিয়েছি, কিন্তু সহজ মনে দিই নি। বললেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েল পেন্টিঙ করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীনভাবে বললে, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' বলেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। তার পরে কী হল ঠিক জানি নে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয় নি, আর ওই ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখি নে।

মোতির মা। তোমার বউরানীর জন্যে স্বর্গটাই খোওয়াতে যখন রাজি আছ, তখন নাহয় একখানা ছবিই বা খোওয়ালে।

নবীন। স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল, ঠিক সেই শুভযোগটি ওই ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ওই ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি করে দেখা যায়।

মোতির মা। দেখো, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই?

নবীন। ভয় যদি থাকত তা হলেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হল কী করে? আমি যে ওঁকে বউরানী বলতে পারছি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসিমুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হল কী করে? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।

মোতির মা। বাস্ রে, বউরানীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।

নবীন। মেজোবউ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।

মোতির মা। না, কখ্খনো না।

নবীন। হাঁ, অল্প একটু! কিন্তু এই উপলক্ষে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নুরনগরে স্টেশনে প্রথম বউরানীর দাদাকে দেখে যে-সব কথা বলেছিলে, চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।

মোতির মা। আচ্ছা, আচ্ছা, ও-সব তর্ক থাক্, এখন কী বলতে চাচ্ছিলে বলো।

নবীন। আমার বিশ্বাস, আজকালের মধ্যেই দাদা বউরানীকে ডেকে পাঠাবেন। বউরানী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চলে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখির কেন লোভ নেই। নির্বোধ পাখি! অকৃতজ্ঞ পাখি!

মোতির মা। তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান-না। সেই কথাই তো ছিল।

নবীন। আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বউরানী যদি যান ভালো হয়, দাদার ওইটুকু অভিমানের নাহয় জিত রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাসবাবু তো চান বউরানী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ করেছিলুম।

দরজার বাইরে থেকে

কুমুদিনী। ঘরে ঢুকব কি?

মোতির মা। তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।

কুমুদিনীর প্রবেশ

নবীন। জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।

কুমুদিনী। আঃ ঠাকুরপো, এত কথা তুমি বানিয়ে বলতে পার কী করে?

নবীন। নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, বুঝতে পারি নে।

কুমুদিনী। আচ্ছা, চলো এখন খেতে যাবে।

নবীন। খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কয়ে আসি গে।

কুমুদিনী। না, সে হবে না।

নবীন। কেন?

কুমুদিনী। আজ দাদা অনেক কথা বলেছেন, আজ আর নয়।

নবীন। ভালো খবর আছে।

কুমুদিনী। তা হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।

নবীন। কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুশি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।

কুমুদিনী। আচ্ছা, আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।

কুমুদিনী বিপ্রদাসকে ডেকে আনল। তিনি বিছানায়
আধশোওয়া হয়ে শুলেন। পায়ের ধুলো নিয়ে

নবীন। বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাই নে। একটি কথা বলে যাব। সময় হয়েছে, এইবার বউরানী ঘরে ফিরে আসবেন বলে আমরা চেয়ে আছি।

খানিক পরে

আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।

কুমুদিনীর প্রতি

বিপ্রদাস। মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েছে তা হলে যা, কুমু।

কুমুদিনী। না দাদা, যাব না।

এই বলে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ল—
একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনের প্রতি

চলো, আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।

জনান্তিকে

মোতির মা। এতটা কিন্তু ভালো না।

জনান্তিকে

নবীন। অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেম্‌নি হোক-না, চোখটা রাঙা হয়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।

মোতির মা। না গো, না, ওটা ওঁদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।

নবীন। মেজোবউ, এত বড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।

মোতির মা। তাই বলে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে?

নবীন। আত্মীয়স্বজন বললেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধরে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সংকোচ হয়।

মোতির মা। যিনি যত বড়ো লোকই হোন-না-কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।

নবীন। আর কিছুদিন দেখাই যাক-না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।

## পরের দৃশ্য

শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের ডেস্কের উপর থেকে কুমুদিনীর ছবি তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছিল— মধুসূদনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললে। শ্যামাসুন্দরী নিয়মমতো পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তার পরে পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

একটা রুপোর ফোটোগ্রাফের ফ্রেম নিয়ে

মধুসূদন। এই নাও, তোমার জন্যে কিনে এনেছি।

ব্রাউন কাগজে জিনিসটা মোড়া ছিল, আস্তে আস্তে
কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে

শ্যামাসুন্দরী। কী হবে এটা?
মধুসূদন। জান না? এতে ফোটোগ্রাফ রাখতে হয়।
শ্যামাসুন্দরী। কার ফোটোগ্রাফ রাখবে?
মধুসূদন। তোমার নিজের। সেদিন সেই-যে ছবিটা তোলানো হয়েছে।
শ্যামাসুন্দরী। আমার এত সোহাগে কাজ নেই।

সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন। এর মানে কী হল?
শ্যামাসুন্দরী। এর মানে কিছুই নেই।

বলে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠল, তার পরে বিছানা থেকে
মেজের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

মধুসূদন। পছন্দ হল না? ভাবছ কম দাম! তুমি এর দাম কী বুঝবে? ওঠো বলছি, এখনি ওঠো!

শ্যামাসুন্দরী উঠে, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল

মধুসূদন। এ কিছুতেই চলবে না। কেদার!

ভৃত্যের প্রবেশ

তোর শ্যামাদিদিকে শিগ্‌গির ডেকে দে!

[ভৃত্যের প্রস্থান

মধুসূদন খানিকক্ষণ খবরের কাগজ নিয়ে পড়লে। টেবিলে রুপোর ফুলদানিটা রুমাল দিয়ে ঘষে দেখলে ময়লা আছে কি না। ঝরা ফুলের পাপড়িগুলো টেবিলের উপর থেকে ঝেড়ে ফেললে। সোফার উপর কুশনগুলো গুছিয়ে ফেললে। হঠাৎ চোখে পড়ল ফোটোগ্রাফটা নেই।

মধুসূদন। কেদার!

ভৃত্যের প্রবেশ

কেদার। মহারাজ!
মধুসূদন। এখানে মহারানীর ছবি ছিল, কী হল?
কেদার। তাই তো, দেখছি নে।
মধুসূদন। ডেকে আন্ তোর শ্যামাদিদিকে।
কেদার। তাঁর মাথা ধরেছে।
মধুসূদন। ধরুক মাথা। আস্পর্ধা তো কম নয়, হুকুম করলে আসে না। নিয়ে আয় তাকে।

[ভৃত্যের প্রস্থান

শ্যামাসুন্দরী এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।
গর্জন করে

মধুসূদন। এসো বলছি, শিগ্‌গির চলে এসো। ন্যাকামি কোরো না।

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

টেবিলের উপর ছবি ছিল, কী হল?

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান ক'রে

শ্যামাসুন্দরী। ছবি! কার ছবি!

ক্রুদ্ধ স্বরে

মধুসূদন। ছবিটা দেখ নি!

ভালোমানুষের মতো মুখ ক'রে

শ্যামাসুন্দরী। না, দেখি নি তো!

গর্জন ক'রে

মধুসূদন। মিথ্যে কথা বলছ!
শ্যামাসুন্দরী। মিথ্যে কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কী?
মধুসূদন। কোথায় রেখেছ বের করে নিয়ে এসো বলছি! নইলে ভালো হবে না!
শ্যামাসুন্দরী। ওমা, কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের করে আনব?
মধুসূদন। কেদার!

[ভৃত্যের প্রবেশ]

কেদার। মহারাজ!
মধুসূদন। মেজোবাবুকে ডেকে আন্‌।

[ভৃত্যের প্রস্থান

নবীনের প্রবেশ

বড়োবউকে আনিয়ে নাও।

শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে রইল।
খানিকক্ষণ পরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে

নবীন। দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বল তা হলে বউরানী খুশি হবেন।

গুড়্‌গুড়ি টেনে

মধুসূদন। আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাব।

[শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের প্রস্থান

মোতির মা'র প্রবেশ

মোতির মা। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।
নবীন। পলকে পলকে হারাচ্ছ! প্রয়োজনটা কী?
মোতির মা। আমার প্রয়োজন নয়, তোমারই প্রয়োজন। তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে এল।
নবীন। আমার মনটাও সেইরকম।
মোতির মা। কেন বলো তো?
নবীন। দৈবাৎ একটা ভালো কাজ করে ফেলেছি।

মোতির মা। আমার পরামর্শ না নিয়েই?

নবীন। পরামর্শ নেবার সময় ছিল না।

মোতির মা। তা হলে তো দেখছি তোমাকে পস্তাতে হবে।

নবীন। অসম্ভব নয়। কুষ্ঠিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এইজন্যে সর্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই— দাদা আজ হুকুম করলেন, বউরানীকে আনানো চাই। আমি ফস্ করে বলে বসলেম, তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোল' ভালো হয়। দাদা কী মেজাজে ছিলেন, রাজি হয়ে গেলেন। তার পর থেকেই ভাবছি, এর ফলটা কী হবে।

মোতির মা। ভালো হবে না। বিপ্রদাসবাবুর যেরকম ভাবখানা দেখলুম, কী বলতে কী বলবেন, শেষকালে কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ করলে কেন?

নবীন। প্রথম কারণ, বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, সেদিন বউরানী যখন বললেন 'আমি যাব না', তার ভিতরকার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্ণ শরীর নিয়ে কলকাতায় এলেন, তবু এক দিনের জন্যে মহারাজ দেখতে গেলেন না— এই অনাদরটা তাঁর মনে সব চেয়ে বেজেছিল।

নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আসত না— তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।

মোতির মা। কীরকম শুনি?

নবীন। ওই-যে সেদিন বললে, কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্মমর্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো। তাই মনে করতে সাহস হল যে, মহারাজার মতো অত বড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখতে যাওয়া উচিত।

মোতির মা। কাজের সময় এত বাজে কথাও বলতে পার! কী করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাবো দেখি।

নবীন। গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্যন্ত ভাবতে গেলে ঠকতে হয়। আশু ভাবা উচিত, প্রথম কর্তব্যটা কী। সেটা হচ্ছে, বিপ্রদাসবাবুকে দাদার দেখতে যাওয়া। দেখতে গিয়ে তার ফলে যা হতে পারে তার উপায় এখনি চিন্তা করতে বসলে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা হবে অতি-চিন্তাশীলতা।

মোতির মা। কি জানি! আমার বোধ হচ্ছে মুশকিল বাধবে।

## পরের দৃশ্য

কুমুদিনী বিপ্রদাসের পায়ের কাছে বসে
তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।

বিপ্রদাস। কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।

[কুমুদিনীর ও ভৃত্যের প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের
পাশের একটা কেদারায় বসে

মধুসূদন। কেমন আছেন বিপ্রদাসবাবু? শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।

বিপ্রদাস। তোমার শরীর ভালোই আছে দেখছি—

মধুসূদন। বিশেষ ভালো যে তা বলতে পারি নে— সন্ধের দিকটা মাথা ধরে, আর ক্ষিদেও ভালো হয় না। খাওয়া-দাওয়ার অল্প একটু অযত্ন হলেই সইতে পারি নে। আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ওইটেতে সব চেয়ে দুঃখ দেয়।

বিপ্রদাস। বোধ করি আপিসের কাজ নিয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

মধুসূদন। এমনিই কী! আপিসের কাজকর্ম আপনিই চলে যাচ্ছে, আমাকে বড়ো কিছু দেখতে হয় না। ম্যাক্‌নটন্ সাহেবের উপরেই বেশির ভাগ কাজের ভার, সার আর্থর পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। জলখাবার প্রস্তুত।

ব্যস্ত হয়ে

মধুসূদন। ওইটি তো পারব না। আগেই তো বলেছি, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব ধরকাট করেই চলতে হয়।

বিপ্রদাস। পিসিমাকে বলো গে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পারবেন না।

[ভৃত্যের প্রস্থান

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলো। বলো কী বলবার আছে।

মধুসূদন। যাবে না বাড়িতে?

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। সেকি কথা!

কুমুদিনী। আমাকে তোমার তো দরকার নেই।

মধুসূদন। কী-যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে?

কুমুদিনী। আমি যাব না।

মধুসূদন। মানে কী? বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না—

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। কী! যাবে না! যেতেই হবে। জান পুলিস ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধরে! 'না' বললেই হল!

গর্জন করে

দাদার স্কুলে নুরনগরী কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হয়েছে?

কুমুদিনী। চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না।

মধুসূদন। কেন? তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি? জান এই মুহূর্তে ওকে পথে বার করতে পারি।

উঠে দাঁড়িয়ে

বিপ্রদাস। আর নয়, তুমি চলে যাও।

মধুসূদন। মনে থাকবে তোমার এই আস্পর্ধা! তোমার নুরনগরের নুর মুড়িয়ে দেব, তবে আমার নাম মধুসূদন।

[প্রস্থান

ক্ষেমাপিসির প্রবেশ

ক্ষেমাপিসি। আজ কি খেতে হবে না কুমু? বেলা যে অনেক হল।

বিপ্রদাস। কুমু, যা, খেতে যা।— তোর কালুদাদাকে পাঠিয়ে দে।

কুমুদিনী। দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, এখন কালুদাকে না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

[প্রস্থান

কালুর প্রবেশ

কালু। কী হল বলো তো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি?

বিপ্রদাস। হাঁ বলেছিল। কুমু তার জবাব দিয়েছে, সে যাবে না।

কালু। বল কী দাদা! এ যে সর্বনেশে কথা!

বিপ্রদাস। সর্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।

কালু। তা হলে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্তে আছে, যাবে কোথায়? জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে তুচ্ছ করতে গিয়ে অন্তত দু-লাখ টাকা লোকসান করেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো, ও তোমাদের পৈতৃক শখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ করে সইতে পারি নে। কিন্তু বাঁচব কী করে?

বিপ্রদাস। দলিলের শর্ত অনুসারে মধুসূদন ছ মাস নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে— তখন একটা উপায় হতে পারবে।

কালু। উপায় হবে বৈকি। বাতিগুলো এক দমকায় নিবত, সেইগুলো একে একে ভদ্র রকম করে নিববে।

বিপ্রদাস। বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জ্বলছে, এখন যে ফরাস এসে তাকে যেরকম ফুঁ দিয়েই নেবাক-না— তাতে বেশি হাহুতাশ করবার কিছু নেই। ওই তলানির আলোটার তদ্‌বির করতে আর ভালো লাগে না ; ওর চেয়ে পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।

কালু। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা করবার আমিই করব। যাই, একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসি গে।

[কালুর প্রস্থান

কুমুদিনীর প্রবেশ

বিপ্রদাস। কুমু, ভালো করে সব ভেবে দেখেছিস?

কুমুদিনী। ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হচ্ছে যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি— মাঝে যা-কিছু ঘটেছে সমস্ত স্বপ্ন।

বিপ্রদাস। যদি তোকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই জোর করে সামলাতে পারবি?

কুমুদিনী। তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পারব।

বিপ্রদাস। এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা হলে যত দেরি করে যাবি ততই সেটা বিশ্রী হয়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েছে কি?

কুমুদিনী। কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মেতির মা'কে, হাবলুকে ভালোবাসি।

বিপ্রদাস। দেখ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা সংকোচ ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে। ঘরে বাইরে চারি দিকে নিন্দের তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।

কুমুদিনী। দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না?

বিপ্রদাস। অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস, তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে? যদি জানি যে, যে ঘরে তুই আছিস সে তোর ঘর হয়ে উঠল না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারি নে। বাবা তোকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনোর দরকার আছে তা তিনি মনেই করতেন না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মানুষ করে তুলেছি। তোর বাপ-মার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে কী, আজ তা বুঝতে পারছি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হতিস তা হলে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করে থাকব? যদি আমার ছোটো ভাই হতিস তা হলে যেমন করে থাকতিস, তেমনি করেই চিরদিন থাক্-না আমার কাছে।

কুমুদিনী। কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হয়ে থাকব না? ঠিক বলছ?

বিপ্রদাস। ভার কেন হবি বোন? তোকে খুব খাটিয়ে নেব। আমার সব কাজ দেব তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন করে কাজ করতে পারবে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে; আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাকবে। তা ছাড়া জানিস আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাব কোথায় বল্? এক কাজ করা যাবে— অনেক দিন থেকে পার্শি পড়বার শখ আমার আছে, একলা পড়তে ভালো লাগে না, তোকে নিয়ে পড়ব। তুই নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে করব না দেখিস।

আরো একটা কথা তোকে বলে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল-বদল হবে, আমাদের চালও বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে গরিবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরিবের ঐশ্বর্য হয়ে।

চোখের জল মুছে

কুমুদিনী। আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।

## পরের দৃশ্য

### কুমুদিনী

মোতির মা ও হাবলুকে নিয়ে নবীনের প্রবেশ। কুমুদিনীর বুকে মাথা দিয়ে অভিমানে হাবলুর কান্না।

হাবলুকে জড়িয়ে ধরে

কুমুদিনী। কঠিন সংসার, গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি, যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে। কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই। যে ভালোবাসা আপনাকে দেয়, তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিস। জ্যাঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস, মনে রাখিস, মনে রাখিস।

নবীন। বউরানী, এবার রজবপুরে পৈতৃক ঘরে চলেছি। এখানকার পালা সাঙ্গ হল।

ব্যাকুল হয়ে

কুমুদিনী। আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।

নবীন। ঠিক তার উল্‌টো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই-যাই করছিল, বেঁধে-সেধে তৈরি

হয়ে ছিলুম, এমন সময় তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব করেই মিটেছিল, কিন্তু বিধাতার সইল না।

তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক করেছ?

কুমুদিনী। না, যাব না।

মোতির মা। তা হলে তোমার গতি কোথায়?

কুমুদিনী। মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আমারও একটুখানি ঠাঁই হতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকি থাকে।

ঠাকুরপো, তা হলে কী করবে এখন?

নবীন। নদীর ধারে কিছু জমি আছে, তার থেকে মোটা ভাত জুটবে, হাওয়া খাওয়াও চলবে।

উত্থার সঙ্গে

মোতির মা। ওগো মশায়, না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওই মির্জাপুরের অন্নজলে দাবি রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিবাগী হয়ে চলে যাব! তিনিই আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসব, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই বলে রাখলুম।

নবীন। সে কথা জানি মেজোবউ, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করি নে। পুনর্জন্ম যদি থাকে তবে সম্মানী হয়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।

[ মোতির মা ও নবীনের প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কুমুদিনী। ডেকে দাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। নাড়ি আরো খারাপ, রাত্তিরে ঘুম কমেছে। বোধ হয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্ছে না। সাবধানে রেখো। আমি চললুম।

[প্রস্থান

কালুর প্রবেশ

কালু। একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে— জাল বড়ো জটিল হয়ে এসেছে, তুমি যদি এই সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরো ঘনিয়ে ধরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছি নে।

তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেছে, সেটা অগ্রাহ্য করবার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা যে একেবারে তার মুঠোর মধ্যে।

কুমুদিনী। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় মরণ ছাড়া কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।

কালু। না দিদি, শান্ত হও, কিছু ভেবো না, একটা কিছু উপায় হবেই। চললুম আমি।

[প্রস্থান

মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। দিদি, একটা কথা তোমাকে বলে যাই। পোয়াতি হয়েছ সে খবর কি এখনো তুমি নিজে জানতে পার নি? এই মাত্র তোমার পিসিমাকে বলে এসেছি জানাতে তোমার দাদাকে।

হাত মুঠো করে

কুমুদিনী। না, না, এ কখনোই হতে পারে না, কিছুতেই না।

বিরক্ত হয়ে

মোতির মা। কেন হতে পারবে না ভাই? তুমি যত বড়ো ঘরেরই মেয়ে হও-না-কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উল্‌টে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল বংশের ইষ্টিদেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

উদ্‌বিগ্নমুখে

কুমুদিনী। কী করে তুমি নিশ্চয় জানলে?

মোতির মা। ছেলের মা আমি, আমি জানব না? কিছুদিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, আর সন্দেহ নেই।

কুমুদিনী। খবরটা কি সবাই জানে?

মোতির মা। এই খানিক আগেই তোমার দেওরকে বলেছি। সে লাফিয়ে গেল বড়োঠাকুরকে খবর দিতে।

কুমুদিনী। দাদা জেনেছেন?

মোতির মা। ক্ষ্যামাপিসি তাঁকে নিশ্চয় খবর দিয়েছে। এখন যাই বোন, তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার আয়োজন করতে হবে।

[প্রস্থান

## পরের দৃশ্য

### বিপ্রদাস

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদা, আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে।

বিপ্রদাস। ভুল বলছিস কুমু। তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।

কুমুদিনী। কিন্তু তা হলে—

বিপ্রদাস। তা জানি— এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?

কুমুদিনী। তবে কি যেতে হবে দাদা?

বিপ্রদাস। তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘর-ছাড়া করব কোন্‌ স্পর্ধায়?

কুমুদিনী। তা হলে কবে যেতে হবে?

বিপ্রদাস। কালই, আর দেরি সইবে না।

কুমুদিনী। দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারছ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আসতে দেবে না।

বিপ্রদাস। তা আমি খুবই জানি।

কুমুদিনী। আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।

বিপ্রদাস। না, কুমু, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

কুমুদিনী। ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

বিপ্রদাস। ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনি আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?

কুমুদিনী। দাদা, সেই দিন তুমিও আমাকে স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।

বিপ্রদাস। আচ্ছা— আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস।

কুমুদিনী। তুমি বিশ্বাস করছ না, মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন বাঁধন কাটব, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।

বিপ্রদাস। বাঁধন তোর ভিতরে কেটেছে। বাইরের বাঁধন তো মায়া।

কুমুদিনী। আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না, আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটানা একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা! সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব, চলে আসবই— এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?

বিপ্রদাস। ওদের বড়োবউ হওয়ার হীনতাও তোকে স্পর্শ করতে পারবে না। সোনায় কি কখনো মরচে ধরে?

কুমুদিনী। আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারি দিকে এত এলোমেলো, এত উলটো-পালটা, তবু এ সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে— কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে, এই কথাটা বুঝতে পেরেছি ; সেই আমার অফুরান, সেই আমার দেবতা। এ যদি না বুঝতুম তা হলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ, এ কথাটাকে তো কোনো কিছুতেই মিথ্যে করতে পারবে না— তা আমি তোমার কাছেই থাকি আর দূরেই থাকি।

## পরের দৃশ্য

### বিপ্রদাস ও কুমুদিনী

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। এলুম তোমাকে নিতে। তোমার আপন ঘরে যাবে না মহারানী? ভয় কিসের?

কুমুদিনী। ভয়? আমার ভয় গেছে ভেঙে। আপন ঘরে আসছি মনে করেই বেরিয়েছিলুম, এসে দেখলুম আমার আপন ঘর নেই ওখানে। তাই ভয় পেয়েছিলুম।

মধুসূদন। কিসের ভয়?

কুমুদিনী। তখন মনে বিশ্বাস ছিল, সমাজে মেয়েদের জন্যে খাঁচাকল তৈরি করেছে, সেখানে একবার ঢুকলে জীবনান্তকাল পর্যন্ত আর বেরোবার জো নেই।

মধুসূদন। আজ ভয় ভাঙল কিসে?

কুমুদিনী। আজ আমি জেনেছি, আমি শুধু মেয়েমানুষ নই, আমি মানুষ। জোর করে আমাকে

বাঁধবে কী করে? আমার মনকে শ্রদ্ধা করে যদি না পাও তবে অপমান করে কিছুতেই পাবে না। কারাগারের দরজা বানিয়েছিল আমার আপন মনের অন্ধবিশ্বাস, আজ ভেঙেছে আমার সেই বিশ্বাস। আজ আমি মুক্ত।

মধুসূদন। তা হলে তুমি কী করবে?

কুমুদিনী। যাব তোমার ঘরে। যদি আমাকে বরণ করে নিতে পার তো নিয়ো ; যদি না পার তো জেনো, আমার মন ছুটি পেয়েছে, আমাকে পারবে না ধরে রাখতে। আর কোথাও আশ্রয় যদি না থাকে, যম তো আমাকে ঠেলতে পারবে না।

মধুসূদন। তা হলে আসবে তুমি, এখনি আসবে?

কুমুদিনী। হাঁ, আসব।

বিপ্রদাস। কুমু, যাবি তুই?

কুমুদিনী। হাঁ, যাব দাদা। বন্দিনী হয়ে নয়, আপন সম্মান নিয়ে যাব— যাব সেইখানে যেখানে যাবার আসবার দরজা সমান খোলা রয়েছে। একদিন ভেবেছিলুম, আমার অদৃষ্টের বিধান, খাঁচার মধ্যেই পুজোর ঘর বানাতে হবে। আজ জেনেছি, পুজো খাঁচার বাইরে। আর কারো দাসীকে আমার দেবতা তাঁর আপন দাসীর সম্মান দেবেন না।

বিপ্রদাস। তা হলে তোর যাওয়া স্থির হল?

কুমুদিনী। হাঁ দাদা, মনের মধ্যে বেড়ি খসেছে, তাই যাচ্ছি, নইলে যেতেম না। দাদা, আশীর্বাদ করে বলো, আমাকে কেউ বন্দী করতে পারবে না, বন্দীশালার মধ্যেও নয়।

বিপ্রদাস। কেউ পারবে না, কেউ না, কারো অধিকার নেই।

মধুসূদনের হাত ধরে

কুমুদিনী। চলো, তবে যাই আমাদের ঘরে।

মধুসূদনের প্রতি

বিপ্রদাস। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, একে নিয়ে যেতে পারবে সাহস করে?

মধুসূদন। পারব। আমি মহারানীকেই খুঁজেছিলুম, পেয়েছি মহারানীকে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি আমি জেলখানার দারোগা নই।

বিপ্রদাসকে প্রণাম করে

দাদা, এবার আমাকেও আশীর্বাদ দিয়ো।

যবনিকা

১৯৩৬

# ব্যঙ্গকৌতুক

## স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক

ব্রহ্মা। পুরন্দর, তোমাদের অত্যন্ত কৃশ দেখাচ্ছে, যেন অনাবৃষ্টিদিনের পাতা-ঝরা বনস্পতির মতো। স্বর্গে কি অমৃত-সঞ্চয়ে দৈন্য ঘটেছে?

ইন্দ্র। পিতামহ, অনাবৃষ্টিই তো বটে। স্বর্গীয় বনস্পতির শিকড় আছে মর্ত্যের মাটিতে— দিনে দিনে সেখানে শ্রদ্ধার রস শুকিয়ে এসেছে। নরলোকে কানাকানি চলছে, যে, সৃষ্টিব্যাপারটা আকস্মিক মহামারীর মতো, বসন্তের গুটি যেন, আপনা হতেই আপনাকে হঠাৎ ফুটিয়ে তোলে; এটা দেবতার হাতের কারুকার্য নয়। অর্থাৎ এটা এমন একটা রোগ, যা চলছে মৃত্যুর অনিবার্য পরিণামে। এমন-কি, ওখানকার পণ্ডিতরা চরম চিতানলের দিনক্ষণ পর্যন্ত অঙ্ক কষে স্থির করে দিয়েছে।

ব্রহ্মা। সর্বনাশ। এ যে অনাদিকালের ভূতভাবনের বেকার-সমস্যা।

ইন্দ্র। তাই তো বটে। ওরা বলছে, দেবতারা কোনোদিন কোনো কাজই করে নি অতএব ওদের মজুরি বন্ধ।

ব্রহ্মা। বলো কী, হোমানলের ঘৃতটুকুও মিলবে না?

ইন্দ্র। না পিতামহ। সেটা ভালোই হয়েছে—যে ঘৃতের এখন চলতি সেটাতে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য হবার আশঙ্কা।

বৃহস্পতি। আদিদেব, এতদিন ছিলুম মানুষের অসংশয় বিশ্বাসে— অত্যন্তই নিশ্চিন্ত ছিলুম। এখন পণ্ডিতের দল মনোবিজ্ঞানের এক্কাগাড়িতে চাপিয়ে মানুষের মাথার খুলির একটা অকিঞ্চিৎকর কোটরে আমাদের ঠেলে দিয়েছে; সেখানে মগজের গন্ধ আছে, অমৃতের স্বাদ নেই; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বেড়ার মধ্যে আমাদের ঘের দিয়ে দিয়ে রেখেছে— যাকে ম্লেচ্ছভাষায় বলে কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প— কড়া পাহারা! অবতারের যে পুরতত্ত্ব বের করেছে, তাতে নৃসিংহের কোনো চিহ্ন নেই, আছে নৃবানরের মাথার খুলি।

মরুৎ। আমার পুত্র মারুতিকে ওরা অগ্রজ ব'লে স্বীকার করেছে এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লজ্জার বিষয় এই যে, দেবতারা ভুক্ত হয়েছে অ্যান্থ্রপলজি নামক অর্বাচীন ম্লেচ্ছশাস্ত্রের বাল্যলীলা পর্বে। দেব, আশা দিয়েছিলে আমরা অমর, আজ দেখছি ওদের পরীক্ষাগারে ব্যাঙের একটা কাটা পাও ইন্দ্রপদের চেয়ে বেশি সজীব। সেদিন সুরবালকেরা সুরগুরুকে ধরে পড়েছিল, 'প্রমাণ ক'রে দিন আমরা আছি।' গুরুর সন্দেহে দোলা লাগল— আছি কি নেই এই তালে তাঁর মাথা নড়তে লাগল, মুখ দিয়ে কথা বেরল না। পিতামহ যদি সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দেন তা হলে দেবলোক সুস্থ হতে পারে।

ব্রহ্মা। পিতামহের চার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে যদি জন্মাতে পারি তা হলে অন্তত কোনো এক চৌমাথার ট্রাম লাইনের ধারে একটা পাথরের মূর্তি দাবি করতে পারব। আজ আমার মূর্তির ভাঙা টুকরো নিয়ে প্রফেসর তারিখ হিসাব করছে অথচ এতদিন এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমি সকল তারিখের অতীত।

প্রজাপতি। ভগবান্, সকলেই জানেন ধরাধামে আমি আর কন্দর্পদেব অবতীর্ণ হয়েছিলুম শুভ এবং অশুভ বিবাহের ঘটকালিতে। সেজন্যে আমাদের কোনো রকমের নিয়মিত বা অনিয়মিত পাওনা ছিল না, কেবল নিমন্ত্রণপত্রের মাথার উপরে ছাপার অক্ষরে আমার উদ্দেশে একটা নমস্কার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কৌতুক ছিল ভূরি-পরিমাণে। বাসর-ঘরে অনেকে কানমলা

দেখেছি পরিহাস-রসিকাদের হাতে, আর দেখেছি অদৃশ্য পরিহাস-রসিকের হাতে চিরজীবনের কান-মলা। আমি প্রজাপতি আজ লজ্জিত, কন্দর্প আজ নির্জীব— তিনি পঞ্চশর নিয়ে যখন আস্ফালন করতে যান তখন তীরগুলো ঠিকরে যায় কোম্পানির কাগজ-নির্মিত বর্মের 'পরে। অতএব উক্ত বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে নিয়ে টঙ্কেশ্বরী দেবীর নাম বহাল হোক।

সকলে। তথাস্তু।

বায়ু। পৃথিবীতে আজকাল পাগলা হাওয়া পলিটিক্সের ঈশান কোণ থেকে সৃষ্টি ছারখার করতে প্রবৃত্ত। আমি আজ চন্দ্রলোকে সমস্ত বিরহিণীদের দীর্ঘনিশ্বাস বহন ক'রে ফিরে যেতে ইচ্ছা করি।

অশ্বিনীকুমার। সুবিধা হবে না দেব। মর্ত্যের পণ্ডিতেরা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, চন্দ্র বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি করেন বটে, কিন্তু স্বয়ং তিনি বায়ুহারা।

বায়ু। নাহয় সেখানে গিয়ে আত্মহত্যা করব।

ভোলানাথ। (অর্ধনিমীলিত নেত্রে) আমার চেয়ে গাঁজার মৌতাত অনেক প্রবল, পৃথিবীতে এমন সর্বনেশে ওস্তাদের অভাব নেই— সেই-সব সংস্কারকদের উপর প্রলয়কার্যের ভার দিয়ে আমি গঙ্গাধারাভিষেকে মাথা ঠাণ্ডা করতে পারি। আমার ভূতগুলোর ভার তাঁরাই নিতে পারবেন।

চিত্রগুপ্ত। মনঃক্ষোভে দেবগণের অভিযোগে অত্যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যথাযথ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করি। সুরগুরু কোনোদিন সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি। সেইজন্যে দেবতাদের গণিত স্বেচ্ছাগণিত। মর্ত্যে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নির্ভুল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণ-বিশারদের মাথায়; এ কাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি অত্যাবশ্যক।

বায়ু। এ প্রস্তাবের সমর্থন করি। দেবতাদের হতাশ হবার কারণ নেই। মানুষের বুদ্ধিতে অকস্মাৎ হাওয়াবদল বার বারই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত দুর্দিনে। দেউলে হবার দিনে মানতের খরচ বেড়ে ওঠে। মানুষের বুদ্ধিতে সব সময় জোয়ার আসে না— একদা তলার পাঁক বেরিয়ে পড়ে। তখন পাণ্ডার পদপঙ্কের দাম চড়ে যায়, দেবতারাও তার অংশ পান।

বৃহস্পতি। আশ্বস্ত হলুম। (সরস্বতীর প্রতি) মুখ ম্লান করবেন না, দেবী, মানুষের আত্মবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা কমবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়তে থাকে। বুদ্ধিতে ভাঁটার টান প্রবল, ভূমণ্ডলে এমন দেশ আছে। শীতলা ঠাকরুনও সেই ভরসাতেই মন্দির-ত্যাগের আশঙ্কা ছেড়ে দিয়েছেন।

আশ্বিন, ১৩৪৫

# সুন্দর

[ নাট্যগীতি ]

'সুন্দর'-এর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

# সুন্দর

## [নাট্যগীতি]

নুটু। রানী, এখনো তো দোলপূর্ণিমার দেরি আছে।

অমিতা। বসন্তিকা, তাতে ক্ষতি কী?

নুটু। এখনো শীত রয়েছে যে। বসন্তের গান কি এখন—

অমিতা। এই তো সময়। শীতের হৃদয়ের মধ্যেই বসন্তের ধ্যানমূর্তি।

নুটু। হৃদয়ের ভিতর কী আছে তা তোমার কবিই জানে। কিন্তু বাইরের দিকে চেয়ে দেখো সমস্ত পাতা যে ঝরিয়ে দিলে।

অমিতা। নবীনের জন্যে নূতন করে আসন পাতবার ভার নিয়েছে শীত।

নুটু। কিন্তু বনের মধ্যে যেন ডাকাত পড়েছে—নিষ্ঠুর তার কাজ।

অমিতা। বসন্তিকা, সুন্দরকে যদি চাস তো তার সাধনা কঠোর সে-কথা মনে রাখিস। শীতের কাজ বড়ো কঠোর, সমস্ত উজাড় করে দিয়ে তবে সে সুন্দরকে পায়।

নুটু। তা ভালো, কিন্তু এই তো তোমার পুঁথি। সুন্দরের পালা এতে তো সমস্তটা নেই, ছাড়া ছাড়া কতকগুলো গান। এ কি ভালা হবে?

অমিতা। কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কবি বললেন, এ কি যুদ্ধ পেয়েছ রানী, যে সৈন্য একেবারে দলেবলে এসে দুর্গ দখল করবে? সুন্দরের দূত এখানে-ওখানে একটি-দুটি করে আসে, উঁকি মেরে যায়। দেখিস নি আমাদের বাগানে কোথাও বা দুটো-একটা অশোকের কুঁড়ি ধরেছে, কোথাও বা একটি-দুটি মাধবী ফোটে-ফোটে করছে— সবই খাপছাড়া। কিন্তু সেই অল্পটুকুতেই অনেকখানির ভূমিকা।

নুটু। এটা কবির কুঁড়েমি। সমস্তটা লিখতে মন যাচ্ছে না— কোনোমতে গোটাকতক গান বানিয়ে দিয়ে কাজ সারতে চান।

অমিতা। কবি বলেছেন, পালা অভিনয় হতে হতে দিনে দিনে সমস্ত গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন দোলপূর্ণিমা এসে পড়বে। অশোকবনেরও সেই নিয়ম, পলাশবনেরও সেই রীতি; তাদের উৎসব জমে উঠতে সময় লাগে। কিন্তু আর তোকে ব্যাখ্যা করতে পারি নে। এইবার আরম্ভ হোক। সবাইকে ডাক-না।

নুটু। সবাই প্রস্তুত আছে। আচার্য সুরেশ্বর, ধরো তোমার যন্ত্র। মঞ্জুলা গান আরম্ভ করো।

অমিতা। ও কি? শুধু গান, সে হবে না।

নুটু। আর কি চাই রানী?

> বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
> স্থল জলে নভতলে বনে উপবনে
> নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
> নিত্য জাগে সরস সংগীতমধুরিমা,
> নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।
> নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।

অমিতা। নৃত্য দিয়ে শুরু করতে হবে। সুন্দরের পালা যে বসন্তের।

নুটু। তা হোক-না— কিন্তু তাই বলে অসংযম—

অমিতা। অসংযম? একে বলে উল্লাস। বসন্তের শুরুতেই দক্ষিণে-হাওয়া আসে বনে-বনান্তরে

নৃত্য প্রচার করে বেড়ায়। ফুল ফোটে, পাখি গায়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন নৃত্যাবেগে দুলতে থাকে। সুন্দর আর নটরাজ যে একই। কবির কাছে সেদিন শুনলি নে নাচেতেই নিখিল জগতের প্রকাশ— নাচ বন্ধ হলেই প্রলয়। যমুনাকে জাহ্নবীকে বলে দে তাদের দুজনের নৃত্যতরঙ্গের লীলা এক জায়গায় মিলিয়ে দিক— আজ আমার এই আঙিনায় নৃত্যের পবিত্র প্রয়াগতীর্থ রচনা হোক— এইখানে নটরাজের পূজা।

নুটু। আচার্য সুরেশ্বর তাদের আগে থাকতেই প্রস্তুত করে রেখেছেন দেখছি— ওই যে তারা আসছে।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণপবনপরশে সরস্বতীর মানসসরসে
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।
নৃত্যের বসে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর হে ভয়ংকর
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নুটু। নাচ তো হল রানী। এবার পুঁথিতে কী লিখছে?

অমিতা। এবারে দ্বিধার গান। সুন্দর তো আসছেন, কিন্তু মনে ভয় হয় তিনি কি আমাকে আপন বলে চিনে নেবেন?

নুটু। চিনতে দেরি হবে কেন, রানী?

অমিতা। এখনো আমার মধ্যে যে রঙ লাগে নি।

নুটু। কবে লাগবে?

অমিতা। যখন তিনি আপন রঙে রাঙিয়ে দেবেন। মঞ্জরী এসো, ধরো গান।

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে— জানি নে, জানি নে।
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে
জানি নে, জানি নে॥
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার,
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে॥

অমিতা। কিন্তু সময় যে যায়। সুন্দর আসবেন কখন? এখনো তো শূন্য রয়েছে আসন। ওলো কলিকা— ভৈরবীতে বেদনার সুর লাগিয়ে দে।

নুটু। রানী, আজ আবার বেদনা কেন? আজ ভৈরবী থাক্— আজ সাহানা।

অমিতা। প্রতীক্ষার চোখের জলে মন যখন খুব করে ভিজে যায় তখনি মিলনের ফুল সম্পূর্ণ করে ফুটে ওঠে। কালিকা, এইবার ওই গানটা—

'তোমায় চেয়ে আছি' বসে পথের ধারে সুন্দর হে।
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে! কান্নার গান বীণায় এনেছি যে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে।
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী-যে করি— রঙিন পালে কবে আসবে তরী,
পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে॥

অমিতা। না, শুধু অমন করে পথ চেয়ে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে চলবে না। শীতের অরণ্য যেমন তার সমস্ত উৎসুক শাখা আকাশে তুলে ডাক দেয় তেমনি করে ডাকতে হবে।

নুটু। রানী, অত বেশি ডাকাডাকি করে আনতে গেলে মান থাকে না।

অমিতা। কী যে বলিস বসন্তিকা, তার মানে নেই। নিজের মান নিয়ে করব কী! মান আমার ভেসে যাক্-না, মান যেন তারি থাকে।

নুটু। কিন্তু ডাকতে হয় কেন রানী বুঝতে পারি নে। যার দেবার সে অমনি দিয়ে যায় না কেন!

অমিতা। সে যত বড়ো দাতাই হোক-না-কেন, সে তার সাধ্য নেই। ডাকতে পারি বলেই সে দিতে পারে। বন বৃষ্টিকে চায় বলেই মেঘ বৃষ্টি দিয়ে সার্থক হয়, মরুভূমিকে দিতে পারে এমন উপায় তার হাতে নেই। সে-কথা পরে হবে। এখন এসো তো তোমরা, শুধু গানের ডাক নয় নাচের ডাক ডাকো— কণ্ঠ দিয়ে অঙ্গ দিয়ে— দেহের সমস্ত রক্তে ডাকের ঢেউ উঠতে থাক্— ধরো—

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥

দিব হৃদয় দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
এসো ঘনপল্লবকুঞ্জে এসো হে, এসো হে এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।

অমিতা। এবার এসো তো নন্দিনী। তোমার দুটি চক্ষু আকাশের আলোতে দুটি অপরাজিতার মতো ফুটে উঠেছে। তোমার তো ভয় নেই, দ্বিধা নেই। তুমি সহজ বিশ্বাসেই মনে নিশ্চিত ঠিক করেছ সুন্দর তোমাকে বর দেবেনই। যাকে তিনি নিজে বেছে নেন তার আর ভাবনা কী। দখিন হাওয়ার ছোঁওয়া বুঝি লাগল তোমার উপবনে। সুন্দর তোমার বনের শাখায়-শাখায় নাচের ছন্দ নিজে এনে দিয়েছেন।

নুটু। রানী, ওর মনে ভয় নেই বলেই বুঝি ভুল আছে। নিজের সৌভাগ্য ও কি জানে? কোথায় বসে বুঝি খেলছে।

অমিতা। ওগো নন্দিনী, ওই যে গান উঠেছে।

ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন-পাতার-পুলক-ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে॥
আমি পথের ধারে ব্যাকুল বেণু হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু গো—
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে॥
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে একটুকুতেই কাঁপন ধরে গো—
আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথা নেয় ভুলিয়ে॥

এবার আনো তোমার নব কিশলয়ের নাচ।

নুটু। রানী, সুন্দর যাকে আপনি এসে বর দেন আমরা তো সে দলের লোক নই।

অমিতা। এমন কথা বলিস নে বসন্তিকা। আমাদেরও ক্ষণে ক্ষণে ছোঁওয়া লাগে। আমরা পাই আবার হারাই। দানের ধর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে যায়। সমস্ত জীবন ধরে সেইগুলিকেই কুড়িয়ে কুড়িয়ে গেঁথে রাখি, সেই কি কম ভাগ্য? তুই যা তো, বল্লরীকে ওই গানটা ধরিয়ে দে—

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী॥
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি॥

অমিতা। বসন্ত এসেছেন।

নুট। কই রানী, এখনো তো দেখতে পাচ্ছি নে।

অমিতা। কোথায় দেখছিস তুই? অন্তরের ভিতরে চেয়ে দেখ-না।

নুটু। সেখানে কী যে আছে সে আরো চোখে পড়ে না। কবি আমাকে গান দিয়েছেন গাইতে পারি কিন্তু দৃষ্টি তো দেন নি।

অমিতা। নিজের কথাটা একটু কম করে বলাই তোর অভ্যাস। আমি জানি তোর অন্তরের মধ্যে চেতনার জোয়ার এসেছে। নন্দনপথযাত্রার আহ্বান জেগেছে। যা, আর দেরি না— সবাইকে ডাক, আবাহন-গান হোক— দেখতে দেখতে সময় যে চলে যায়।

এস এস বসন্ত ধরাতলে।
আন মুহু মুহু নব তান, আন নব প্রাণ নব গান।
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন নব উল্লাসহিল্লোল।
আন আন আনন্দ ছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।
ভাঙ ভাঙ বন্ধন শৃঙ্খল।
আন আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে
এস থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লবপুলকিত
ফুল- আকুল মালতীবল্লিবিতানে— সুখছায়ে মধুবায়ে।
এস বিকশিত উন্মুখ, এস চির-উৎসুক নন্দনপথচিরযাত্রী।
এস স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে, প্রাণে প্রাণে।
এস অরুণচরণ কমলবরণ তরুন উষার কোলে।
এস জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে, কলকল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখ সুপ্ত সরসী-নীরে। এস এস।
এস তড়িৎ-শিখা-সম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এস জাগর মুখর প্রভাতে।
এস নগরে প্রান্তরে বনে।
এস কর্মে বচনে মনে। এস এস।
এস মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে।
এস গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে।
এস কোমল কিশলয়বসনে।
এস সুন্দর, যৌবনবেগে।
এস দৃপ্ত বীর, নবতেজে।
ওহে দুর্মদ, কর জয়যাত্রা,
চল জরাপরাভব সমরে
পবনে কেশ রেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে॥

নুটু। রানী, তুমি যাই বলো, এখনো দেরি আছে।

অমিতা। তুই বড়ো ভীরু! একান্ত মনে বিশ্বাস করে যদি বলি, এসেছেন, এসেছেন, এসেছেন, তাহলে তিনি আসেন। তাঁর আসবার পথ আমাদের এই বিশ্বাস।

নুটু। বিশ্বাস জোর করে তো হয় না।

অমিতা। জোর চাই, জোর চাই। যে দুর্বল সে হাতে পেয়েও পায় না। এসো তো লতিকা, তোমার সেই সাহসের গান গাও। বলো, তোমার যদি আসতে দেরি থাকে, আমি এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসব।— বলো,

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতা গুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে।
বাতাস দিল দোল, দিল দোল;
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্।
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে॥
আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী
ওই স্বপ্নপারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই—
ও তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই—
সবার সাথে চলবি রাতে সামনে চাহি রে।

নুটু। কিন্তু রানী এখনো তো সাড়া পাচ্ছি নে।

অমিতা। নিশ্চয় পাচ্ছি। বুঝতে সময় লাগে— ভুল বুঝেই কত দিন কেটে যায়।

নুটু। যদি ভুল বুঝি সে কি আমার দোষ? ভোলান কেন?

অমিতা। ভুল ভাঙাবার সুখ দেবেন বলে। ওই যে শুকনো পাতা ছড়িয়ে চলেছেন তুই শুধু কি তাই দেখবি।

নুটু। যা চোখের সামনে দেখান তাই দেখি।

অমিতা। যা চোখের সামনে দেখান না, তাই আরো বেশি করে দেখবার। মন দিয়ে একবার চেয়ে দেখ— ঐ শুকনো পাতার আবরণ এখনি খসবে— চিরনবীন ওরই আঁড়াল থেকে দেখা দেন। ওগো কিশোরের দল ধরো তো—

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে উদাস করা কোন্ সুরে॥
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে॥
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেলো, জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে॥

নুটু। রানী, ছদ্মবেশ ঘোচে, মায়া কাটে, দেখাও দেন। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ যে সম্পূর্ণ করে ধরা দেন না।

অমিতা। এই তো প্রেমের খেলা। পাওয়া আর না পাওয়ার দোল— এই হল দোলপূর্ণিমার দোল। সত্য আর মায়ার একসঙ্গে লীলা।

নুটু। এমন লীলায় ফল কী!

অমিতা। যেদিন দিয়ে তিনি চলে চলে যান সেই ব্যথার পথেই আমাদের এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান। সুমনা, সুন্দরের বিদায়ের পালা এবার শুরু হোক।

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে॥

চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল—
কোথা সে পথের শেষ কোন্ সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে॥
বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা।
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
'এসো এসো এসো' আঁখি কয় কেঁদে। তৃষিত বক্ষ বলে 'রাখি বেঁধে'।
যেতে যেতে ওগো প্রিয়, কিছু ফেলে রেখে দিয়ো
ধরা দিতে যদি নাই রুচে॥

ও কি এল ও কি এল না, বোঝা গেল না—
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে—
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরম কামনা॥

অমিতা। এই প্রেমের খেলার রস তো এই। তীব্র সে, মধুর সে। যখন পেয়েছি তখনো ভয় থাকে, কখন হারাই কখন হারাই। দান যখন পূর্ণ করে নিয়ে আসেন তখনো মনের মধ্যে আশঙ্কা বাজে—

কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দেশান্তরে॥
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা—
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মালা মাথায় প'রে।
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে—
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভরে॥

তখন সিন্ধু ভৈরবীতে কান্না দুলে দুলে উঠতে থাকে—

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো॥
মিলনপিয়াসী মোরা— কথা রাখো কথা রাখো॥
আজো বকুল আপনহারা হায় রে, ফুল-ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি—
পথিক ওগো থাকো থাকো॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায় হায় রে মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী
পথিক, তাকে ডাকো ডাকো।

এই কান্নার দোল এও সেই দোলপূর্ণিমার দোল। জীবনের পরম সম্পদ চরম আশা দেখা দিয়ে যে চলে যায়। কিন্তু গেলেও সে যেতে পারে না। তার বিচ্ছেদের আলো জলে স্থলে আকাশে জ্বলে ওঠে। মন বলতে থাকে আমার বিরহের বীণা তোমাকেই নিবেদন করে দিলুম। এই বীণায় তোমার নন্দনের সুর এনে দাও। সেই নন্দনের সুর যা মর্ত্যের ওপার থেকে আসে— যেখান থেকে অরুণের আলো আসে— যেখান থেকে হঠাৎ নবজীবনের দূত দেখা দেয় মৃত্যুর তোরণ পার হয়ে।

এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে॥
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা—
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মালা মাথায় পরে॥
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে—
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভরে॥

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল, ও চুপি চুপি কী বলে গেল।
যেতে যেতে গো, কাননেতে গো ও কত যে ফুল দলে গেল॥
মনে মনে কী ভাবে কে জানে, মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ পানে— চাঁদের হিয়া গলে গেল।
ও পায়ে পায়ে যে বাজায়ে চলে বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।
কে জানে কারে ভালো কি বাসে, বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে— জানি নে ও কি ছলে গেল।

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে।
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥
পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে,
'পরশ দিয়ে সরস করো ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।'
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥

[১৩৩৫]

রবীন্দ্রবীক্ষা
দ্বাদশ সংকলন
৭ই পৌষ ১৩৯১

# উপন্যাস ও গল্প

# ললাটের লিখন

## (বাঁশরী)

ছেলেবেলায় পৃথ্বীশের ডান দিকের কপালে চোট লেগেছিল ভুরুর মাঝখান থেকে উপর পর্যন্ত। সেই আঘাতে ডান চোখটাও সংকুচিত। পৃথ্বীশকে ভালো দেখতে কি না সেই প্রশ্নের উত্তরটা কাটা দাগের অবিচারে সম্পূর্ণ হতে পারল না। অদৃষ্টের এই লাঞ্ছনাকে এত দিন থেকে প্রকাশ্যে পৃথ্বীশ বহন করে আসছে তবুও দাগও যেমন মেলায় নি তেমনি ঘোচে নি তার সংকোচ। নতুন কারো সঙ্গে পরিচয় হবার উপলক্ষে প্রত্যেকবার ধিক্কারটা জেগে ওঠে মনে। কিন্তু বিধাতাকে গাল দেবার অধিকার তার নেই। তার রচনার ঐশ্বর্যকে বন্ধুরা স্বীকার করছে প্রচুর প্রশংসায়, শত্রুরা নিন্দাবাক্যের নিরন্তর কটূক্তিতে। লেখার চারি দিকে ভিড় জমছে। দু টাকা আড়াই টাকা দামের বইগুলো ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে-ঘরে। সম্পাদকরা তার কলমের প্রসাদ ছুটোছাঁটা যা-ই পায় কিছুই ছাড়ে না। পাঠিকারা বলে, পৃথ্বীশবাবু মেয়েদের মন ও চরিত্র যেমন আশ্চর্য বোঝেন ও বর্ণনা করেন এমন সাধ্য নেই আর কোনো লেখকের। পুরুষ-বন্ধুরা বলে, ওর লেখায় মেয়েদের এত-যে স্তুতিবাদ সে কেবল হতভাগার ভাঙা কপালের দোষে। মুখশ্রী যদি অক্ষুণ্ণ হত তা হলে মেয়েদের সম্বন্ধে সত্য কথা বাধত না মুখে। মুখের চেহারা বিপক্ষতা করায় মুখের অত্যুক্তিকে সহায় করেছে মনোহরণের অধ্যবসায়।

শ্রীমতী বাঁশরি সরকার ব্যারিস্টারি চক্রের মেয়ে— বাপ ব্যারিস্টার, ভাইরা ব্যারিস্টার। দু বার গেছে য়ুরোপে ছুটি উপলক্ষে। সাজে সজ্জায় ভাষায় ভঙ্গিতে আছে আধুনিক যুগের সুনিপুণ উদ্দামতা। রূপসী বলতে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু আকৃতিটা আগাগোড়া যেন ফ্রেঞ্চ পালিশ দিয়ে ঝকঝকে করা।

পৃথ্বীশকে বাঁশরি ঘিরে নিয়েছিল আপন দলের মধ্যে। পরিচয়ের আরম্ভকালে মানুষের বাক্যালংকারের সীমা যখন অনির্দিষ্ট থাকে সেইরকম একদা পৃথ্বীশ ওকে বলেছিল, পুরুষের প্রতিভা যদি হয় গাছের ফুল, মেয়েদের প্রভাব আকাশের আলো। কম পড়লে ফুলের রঙ খেলে না। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে প্রমাণ অনেক সংগ্রহ করেছে। সংগ্রহ করবার প্রেরণা আপন অন্তরের বেদনায়। তার প্রতিভা শতদলের উপর কোনো-না-কোনো বীণাপাণিকে সে অনেকবার মনে মনে আসন দিতে চেয়েছে, বীণা না থাকলেও চলে যদি বিলিতি জ্যাজনাচের ব্যাঞ্জোও থাকে তার হাতে। ওর যে বাক্‌লীলা মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে পড়ে তাকে আন্দোলিত করবার প্রবাহ সে চায় কোনো মধুর রসের উৎস থেকে। খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, কখনো মনে করে এ, কখনো মনে করে সে।

একটা গল্প লিখেছিল জয়দেবের নামটা নিয়ে তাকে বদনাম দিয়ে। যে কাহিনী গেঁথেছিল তার জন্যে পুরাবৃত্তের কাছে লেখক ঋণী নয়। তাতে আছে কবি জয়দেব শাক্ত; আর কাঞ্চনপ্রস্থের রাজমহিষী পদ্মাবতী বৈষ্ণব। মহিষীর হুকুমে কবি গান করতেন রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে। মহিষী শুনতেন পর্দার আড়ালে। সেই অন্তরালবর্তিনী কল্পমূর্তি জয়দেবের মনকে নিয়ে গিয়েছিল বৃন্দাবনের কুঞ্জছায়ায়। শক্তির মন্ত্র যিনি পেয়েছিলেন গুরুর কাছে তাঁর মনের রসের মন্ত্র ভেসে এল কেশধূপসুগন্ধীবেণীচুম্বিত বসন্ত-বাতাসে। লেখক জয়দেবের স্ত্রী মন্দাকিনীকে বানিয়েছিল মোটা মালমসলায় ধুলোকাদা মাখা হাতে। এই অংশে লেখকের অনৈতিহাসিক নিঃসংকোচ প্রগল্‌ভতার প্রশংসা করেছে একদল। মাটি খোঁড়ার কোদালকে সে খনিত্র নামে শুদ্ধি করে নেয় নি বলে ভক্তেরা তাকে খেতাব দিয়েছে নব্যসাহিত্যের পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ কলঙ্কগর্বিত। ছাপা হবার পূর্বেই বাঁশরি গল্পটা শুনেছে আপন চায়ের টেবিলে, নিভৃতে। অন্য নিমন্ত্রিতেরা উঠে গিয়েছিল,

ওদের সেই আলাপের আদি পর্বে যশস্বী লেখককে তৃপ্ত করবার জন্যে চাটুবাক্যের অমিতব্যয়কে বাঁশরি আতিথ্যের অঙ্গ বলেই গণ্য করত। পড়া শেষ হতেই বাঁশরি চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে "মাস্টারপীস, শেলির জীবনী নিয়ে ফরাসি লেখক এরিয়েল নাম দিয়ে যে গল্প লিখেছে তারই সঙ্গে এর কতকটা তুলনা মেলে; কিন্তু ওঃ।" পৃথ্বীশের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। চায়ের পেয়ালা দ্বিতীয়বার ভরতি করে নিয়ে তার মধ্যে চামচ সঞ্চালন করতে করতে বললে, "দেখুন শ্রীমতী বাঁশরি, আমার একটা থিয়োরি আছে, দেখে নেবেন একদিন, ল্যাবরেটরিতে তার প্রমাণ হবে। যে বিশেষ এনার্জি আছে মেয়েদের জৈবকণায়, যাতে দেহে মনে তাদের মেয়ে করেছে, সেইটেই কোনো সূক্ষ্ম আকারে ব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীতে। আচ্ছা, শ্রীমতী বাঁশরি, এটা আপনি কখনো কি নিজের মধ্যে অনুভব করেন না?"

বাঁশরি একটু ইতস্তত করছিল। পৃথ্বীশ বলে উঠল, "নিশ্চয়ই করেন এ আমি হলপ করে বলতে পারি। কীরকম সময়ে জানেন—

"At that sweet time when winds are wooing
all vital things that wake to bring
News of birds and blossomings."

বাঁশরি হাততালি দিয়ে উঠে বললে, "এতক্ষণে বুঝেছি আপনি কী বলছেন। মনে হয় যেন—"

পৃথ্বীশ কথাটাকে সম্পূর্ণ করে বললে, "যেন গোলাপ গাছের মজ্জার ভিতরে যে শক্তি বিনা ভাষায় অন্ধকারে কেঁদে উঠছে, বলছে ফুল হয়ে ফুটব সে আপনারই ভিতরকার প্রাণৌৎসুক্য। বার্গসঁ জানেন না, তিনি যাকে বলেন Elan Vital সেটা স্ত্রী-শক্তি।"

বাঁশরি পৃথ্বীশের কথাটা একটু বদলিয়ে দিয়ে বললে, "দেখুন পৃথ্বীশবাবু, নিজেকে ওই-যে ছড়িয়ে জানবার তত্ত্বটা বললেন ওটা মাটিতে তেমন মনে হয় না যেমন হয় জলে। জলের ঘাটে মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে, দেখেন নি কি?"

পৃথ্বীশ চমকে উঠে বলে উঠল, "আপনি আমাকে ভাবালেন। কথাটা এতদিন মনে আসে নি। স্ত্রী-পুরুষে দ্বৈততত্ত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হল একমুহূর্তে। আর কিছু নয়, জল ও স্থল। মাটি ও বাতাসে যে অংশ জলীয় সেই অংশেই নারী ওই জলেই তো ধরণীর অনুপ্রাণনা।"

সেই দিন পৃথ্বীশ চঞ্চল হয়ে উঠে প্রথম বাঁশরির হাত চেপে ধরেছিল, বলেছিল, "ক্ষমা করবেন আমাকে, স্পষ্ট বুঝেছি পুরুষ তেমনি করেই নারীকে চায়, মরুভূমি যেমন করে চায় জলকে অন্তর্গূঢ় সৃষ্টিশক্তিকে মুক্তি দেবার জন্যে।" কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বাঁশরি হাত ছাড়িয়ে নিলে। পৃথ্বীশ বললে, "দোহাই আপনার, আমাকে ব্যর্থতার হাত হতে বাঁচাবেন। এ আমার কেবল ব্যক্তিগত আবেদন নয়, আমি বলছি সমস্ত বাংলার সাহিত্যের হয়ে। আমি ইঁদারার মতো, জল দানের গভীর সঞ্চয় আছে আমার চিত্তে, কিন্তু তুমি নারী, জলের ঘট তোমার মাথায়।" সেই দিন ওর সম্ভাষণ 'আপনি' হতে হঠাৎ 'তুমি'তে এসে পৌঁছল, ইঙ্গিতেও আপত্তি উঠল না কোথাও।

বাঁশরিকে চিনত না বলেই সেদিন পৃথ্বীশ এতবড়ো প্রহসনের অবতারণা করতে পেরেছিল। বাঁশরি মখমলের খাপের থেকে নিজের ধারা[লো] হাসি তখনো বের করে নি, হতভাগ্য তাই এমন নিঃশঙ্ক ছিল। ও ঠিক করে রেখেছিল আধুনিক কালচার্ড্ মেয়েরা চকোলেট ভালোবাসে আর ভালোবাসে কড়িমধ্যমে ভাবুকতা।

এর পর থেকে এই বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের প্রতিভায় প্রাণ সঞ্চার করবার একমাত্র দায়িত্ব নিলে বাঁশরি। হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে পুরুষ-বন্ধুরা, মেয়ে-বন্ধুরা ওর সজীব সম্পত্তিটিকে নিয়ে ঠিক লোভ করে নি ঈর্ষা করেছিল। ইংরেজ অ্যাটর্নি আপিসের শিক্ষানবিশ সুধাংশু একদিন পৃথ্বীশের রিফু-করা মুখ নিয়ে কিছু বিদ্রূপ করেছিল, বাঁশরি বললে, "দেখো

মল্লিক ওর মুখ দেখতে আমার পজিটিভলি ভালো লাগে।"

"ভালো লাগে", সুধাংশু হো হো করে হেসে উঠল। বললে, "মডার্‌ন আর্ট বুঝতে আমাদের সময় লাগবে।"

বাঁশরি বললে, "বিধাতার তুলিতে সাহস আছে, যাকে তিনি ভালো-দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর করা দরকার মনে করেন না। তাঁর মিষ্টান্ন তিনি ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।"

সুধাংশু বললে, "গাল খেলুম তোমার কাছে, এটা সইতে চেষ্টা করব। কিন্তু ভাগ্যে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং দেন নি গাল।" ব'লে সে ঘোড়দৌড় দেখতে চলে গেল। বাঁশরিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে প্ল্যান ছিল মনে, সেটা ত্যাগ করলে।

পার্টি জমেছে বাগানে, সুষমার বাপ গিরিশ সেনের বাড়িতে। বাগানের দক্ষিণ দিকে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে, তার তলায় কাঠের আসন, সেই আসনে বসে আছে পৃথ্বীশ।

এই দলের এরকম পার্টিতে পৃথ্বীশের এই প্রথম প্রবেশ। অনেক ভেবেছিল নিজের সাজ নিয়ে। যে এণ্ডির চাদরটা পরেছে এখানে এসে হঠাৎ দেখতে পেলে তার এক কোণে মস্ত একটা কালির দাগ। চারি দিকে ফিটফাটের ফ্যাশন, তারি মাঝখানে কালীটা যেন চেঁচিয়ে উঠছে। অভ্যাগত শৌখিনদের মধ্যে ধুতিপরা মানুষও আছে কিন্তু চাদর কারো গায়েই নেই। পৃথ্বীশ নিজেকে বেখাপ বলে অনুভব করলে, স্বস্তি পেলে না মনে। কোণে বসে বসে দেখলে কেউ বা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউ বা খেলছে টেনিস, কেউ বা টেবিলে সাজানো আহার্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। উঠে দাঁড়ানো বা চলে বেড়ানো ওর পক্ষে অসাধ্য হল। রাগ হচ্ছে বাঁশরির 'পরে। চক্রান্ত করে সেই ওকে এখানে এনে হাজির করেছে। আনবার একটা কারণও ঘটেছিল। সেটি বলি। 'বেমানান' নাম দিয়ে কিছুদিন আগেই পৃথ্বীশ একটা ছোটোগল্প লিখেছিল। বিষয়টা এই—

দেওঘরে নলিনাক্ষের মস্ত দো-মহলাবাড়ি। পুজোর ছুটিতে এক মহলে আশ্রয় নিয়েছে নবকান্ত মুখুজ্জেরা। তাদের মেয়েরা নিষ্ঠাবতী, মুখ্যভাবে দেবদর্শনে পুণ্য এবং গৌণভাবে ইঁদারার জলে ক্ষুধাবৃদ্ধি এই দুটোই তাদের মনে প্রবল। বৈঠকখানা ঘর থেকে কার্পেট উঠিয়ে দিয়েছে, সেখানেও শুচিতা বিস্তারের জন্যে চলছে জল-ঢালাঢালি। এ দিকে অন্য মহলে মোরগ মাংস - লোলুপ নলিনাক্ষের দলবল। এই দলের একজন এম. এস্‌সি. পরীক্ষার্থী অপর দলের কোনো পূজাপরায়ণা কুমারীকে হৃদয় সমর্পণ করেছিল, তারই ট্র্যাজেডি এবং কমেডি খুব জোরালো রসালো ভাষায় বর্ণনা করেছে পৃথ্বীশ। এক পক্ষের পাঠক বাহবা দিয়েছিল প্রচণ্ড জোরে, বলা বাহুল্য বাঁশরি সে পক্ষের নয়।

বাঁশরি বললে, "দেখো পৃথ্বীশবাবু, তুমি যে ছুরি চালিয়েছ ওটা যাত্রার দলের ছুরি, কাঠের উপরে রাঙতা মাখানো, ওতে যারা ভোলে তারা পাড়াগেঁয়ে অজবুগ তাদের জন্য সাহিত্য নয়।"

পৃথ্বীশ হেসে উড়িয়ে দেবার জন্য বললে, "কাজ হয়েছে দেখছি, বিঁধছে বুকে।"

"আমাকে বেঁধে নি, বিঁধেছে তোমার খ্যাতির ভাগ্যকে। বানিয়ে গাল দেয় পাঁচালির দল, হাটের-আসরে লোক হাসাবার জন্যে, তুমি কি সেই দলের লিখিয়ে নাকি? তা হলে দণ্ডবৎ।"

পৃথ্বীশ গালটাকে অগ্রসর হয়ে মেনে নেবার জন্যে বললে, "ভাষায় বলে খুরে দণ্ডবৎ। এত দিনে খুর ধরা পড়ল বুঝি।"

"ধরা পড়ত না, যদি-না সিংহের থাবা চালাবার ভান করতে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মশায়, যাকে নলিনাক্ষের দল বলে এত ইনিয়ে বিনিয়ে কলম চালিয়েছ তাকে তুমি সত্য করে জান কি?"

পৃথ্বীশ বললে, "লেখার জন্যে জানবার দরকার করে না, বানিয়ে বলবার বিধিদত্ত অধিকার আছে লেখকের, আদালতের সাক্ষীর নেই।"

"ওটা তো খাঁটি লেখকের লেখা নয়। ভিস্তির জলকে ঝরনার জল বলে না। সমাজের আবর্জনা ঝাঁটাবার জন্যে কোমর বেঁধেছিলে। আন্দাজে চলে না ও কাজ। আবর্জনাও সত্য হওয়া চাই আর ঝাঁটা-গাছটাও, সঙ্গে চাই ব্যবসায়ীর হাতটা।"

পৃথ্বীশ যখন একটা ঝকঝকে জবাবের জন্যে মনের মধ্যে হাতড়াচ্ছে এমন সময় বাঁশরি বললে, "শোনো পৃথ্বীশবাবু, যাদের চেন না, তাদের চিনতে কতক্ষণ। আমরা তোমার ওই নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ ঢের আছে, যেমন তোমাদেরও আছে বিস্তর। ভালো করে জানা হলে মানুষকে ভালো লাগতে পারে মন্দ লাগতেও পারে, কিন্তু অদ্ভুত লাগে না।"

"তোমাকে তো জেনেছি বাঁশি, কী রকম লাগছে তার প্রমাণ কিছু কিছু পেয়েছ বোধ করি।"

"আমাকে কিছু জান না তুমি। আগে চেষ্টা করো আমার চারি দিককে জানতে।"

"কী উপায়?"

"উপায় আমিই ঠিক করে দেব।"

সেই উপায়ের প্রথম আরম্ভ আজকের এই পার্টিতে। সুষমার ছোটো বোন সুষীমা, মাথায় বেণী দোলানো, বয়েস হবে তেরো, কাঁচা মুখ, চোখে চশমা, চটপট করে চলে— পৃথ্বীশকে এসে বললে, "চলুন খেতে।"

পৃথ্বীশ একবার উঠি-উঠি করলে, পর মুহূর্তে চেপে বসল শক্ত হয়ে। হিসেব করে দেখলে বিশ-পঁচিশ হাত তফাতে আছে টেবিলটা, এণ্ডির চাদর দুলিয়ে যেতে হবে অনেক নরনারীর চোখের সামনে দিয়ে। ফস ক'রে মিথ্যে কথা বললে, "আমি তো এখন চা খাই নে।"

সুষীমা ছেলেমানুষের মতো বললে, "কেন, এই সময়েই তো সবাই চা খায়।"

পৃথ্বীশ এই ছেলেমানুষের কাছেও সাহিত্যিকের চাল ছাড়তে পারলে না, মুখ টিপে বললে, "এক-এক মানুষ থাকে যে সবাইয়ের মতো নয়।"

সুষীমা কোনো তর্ক না করে আবার বেণী দুলিয়ে চটপট করে ফিরে চলে গেল।

সুষীমার মাসি অর্চনা দূর থেকে দেখলে। বুঝলে, যত বড়ো খ্যাতি থাক্, লোকটির সেই লজ্জা প্রবল যেটা অহংকারের যমজ ভাই। ছোটো একটি প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিজের হাতে করে নিয়ে এল। সামনে ধরে বললে, "খাবেন না, সেকি কথা পৃথ্বীশবাবু, কিছু খেতেই হবে।"

অন্তর্যামী জানেন খাওয়ার প্রয়োজন জরুর হয়ে উঠেছিল। প্লেটটা পৃথ্বীশ কোলে তুলে নিলে। নিতান্ত অপর সাধারণের মতোই খাওয়া শুরু করলে। বেঞ্চির এক ধারে বসল অর্চনা। দোহারা গড়নের দেহ, হাসিখুশি ঢলঢলে মুখ। বললে, "সেদিন আপনার 'বেমানান' গল্পটা পড়লুম পৃথ্বীশবাবু। পড়ে এত হেসেছি কী আর বলব।" যদি কোনোমতে সম্ভবপর [ হত ] তা হলে রাঙা হয়ে উঠত পৃথ্বীশের মুখ। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। একখানা কেকের উপর অত্যন্ত মনোযোগ দিলে মাথা নীচু করে।

"আপনি নিশ্চয়ই কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। অমন অদ্ভুত জীবের নমুনা স্বচক্ষে না-দেখলে সাহস করে লেখা যায় না। ওই যে-জায়গায় মিস্টার কিষেণ গাপটা বি. এ. ক্যান্টাব পিছন থেকে মিস লোটিকার জামার ফাঁকে নিজের আঙটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাশির দাবি করে হোহা বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, সাহিত্যে এ জায়গাটা একেবারে অতুলনীয়। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়ালিস্টিক, পৃথ্বীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।"

সিঙাড়ার গ্রাসটা কোনোমতে গলাধঃকরণ করে পৃথ্বীশ বললে, "আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি ভয়ংকর তার বিচার করুন বিধাতা পুরুষ।"

"না, ঠাট্টা করবেন না। আপনি ওস্তাদমানুষ, আপনার সঙ্গে ঠাট্টায় পারব না। সত্যি করে বলুন, এরা কি আপনার বন্ধু, নিশ্চয়ই এদের খুব আত্মীয়ের মতোই জানেন। ওই যে মেয়েটা, কী তার নাম, কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, মাই আইজ্ ও গড্, যে মেয়েটা লাজুক

স্যাণ্ডেলের সংকোচ ভাঙাবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়ি খাদের মধ্যে ফেলেছিল। প্ল্যান করেছিল মিস্টার স্যাণ্ডেলকে দু হাতে তুলে ধরে পতিতোদ্ধার করবে— হবি তো হ, স্যাণ্ডেলের হাতে হল কম্পাউন্ড ফ্র্যাক্‌চার— কী ড্র্যামাটিক্‌! রিয়ালিজমের একেবারে চূড়ান্ত। ভালোবাসার এত বড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না— ভেবে দেখুন সুভদ্রার কত বড়ো চান্স মারা গেল, আর অর্জুনেরও কবজি গেল বেঁচে।"

"আপনিও তো কম মডার্ন নন— আমার মতো নির্লজ্জকেও লজ্জা দিতে পারেন।"

"কী কথা বলেন পৃথ্বীশবাবু, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লজ্জ? লজ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ চলবে না। কলমটার কথা স্বতন্ত্র।"

পৃথ্বীশ মনে মনে বললে, "বাস রে দেখতে এমন নিটোল কোমল, মনটা কী চমৎকার নিষ্ঠুর। বেমানানের ষোলো আনা শোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।"

এখনো বাঁশরির দেখা নেই। হঠাৎ পৃথ্বীশের মনে হল, হয়তো সবটাই তাকে শাস্তি দেবার ষড়যন্ত্র। রাগ হল বাঁশরির 'পরে, মনে মনে বললে, আমারও পালা আসবে।

এমন সময় কাছে এসে উপস্থিত রাঘুবংশিক চেহারা শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ সোমশংকর। গৌরবর্ণ, রোদেপুড়ে কিছু ছায়াচ্ছন্ন, ভারী মুখ, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান, মাথায় সাদা মসলিনের পাঞ্জাবি-কায়দায় পাগড়ি, পায়ে শুঁড়তোলা দিল্লির নগরাজুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি। পৃথ্বীশের বুঝতে বাকি নেই, এই লোকটাই আজকের দিনের প্রধান নায়ক। অর্চনা পরস্পরের পরিচয় উপলক্ষে বললে, "রাজা বাহাদুর সোমশংকর রায়।"

পৃথ্বীশের মনটা পুলকিত হয়ে উঠল। শৌখিন পার্টিতেও সাহিত্যিকের সম্মান ছাড়িয়ে উঠেছে আভিজাত্যের খেতাবকে। যেচে আসছে আলাপ করতে। এতক্ষণ সংকোচে পীড়িত পৃথ্বীশ উৎকণ্ঠিত হয়ে আগমন প্রতীক্ষা করছিল বাঁশরির, ও-যে "সর্বত্র পূজ্যতে"র দলে সেইটে প্রমাণ করবার জন্যে। আর প্রয়োজন রইল না— এমন-কি, ভুলে গেল এণ্ডির চাদরের কালির চিহ্ন।

অর্চনা চলে গেল অন্য অতিথিদের সেবায়।

সোমশংকর জিজ্ঞাসা করলে, "বসতে পারি?"

পৃথ্বীশ ব্যস্ত হয়ে বললে, "নিশ্চয়।"

রাজা বাহাদুর বললে, "আপনার কথা প্রায়ই শুনতে পাই মিস বাঁশরির কাছ থেকে। তিনি আপনার ভক্ত।"

"ঈর্ষা করবার মতো নয়। ওঁর ভক্তিকে অবিমিশ্র বলা যায় না। তাতে ফুল যা পাই সেটা ঝরে পড়ে, কাঁটাগুলো বরাবর থাকে বিঁধে।"

"আপনার একখানা বই পড়েছিলুম, মনে হচ্ছে তার নাম রক্তজবা। চমৎকার, হিরোয়িন যার নাম রাগিণী সে দেখলে স্বামীর মন আর-একজনের 'পরে, তখন স্বামীকে মুক্তি দেবে বলে মিথ্যে চিঠি বানালে, প্রমাণ করতে চাইলে ও নিজেই ভালোবাসে প্রতিবেশী বামন দাসকে— সে জায়গাটায় লেখার কী জোর আর কী ওরিজিনাল আইডিয়া।"

পৃথ্বীশ চমকে উঠল। এও কি শাস্তির উদ্দেশে তার প্রতি ইচ্ছাকৃত ব্যঙ্গ, না দৈবকৃত গলদ। রক্তজবা বইখানা যতীন ঘটকের। যতীন পৃথ্বীশের প্রতিযোগী, সকলেই জানে। উভয়ের উৎকর্ষ বিচার নিয়ে রুচির সংঘাত মাঝে মাঝে শোকাবহ হয়ে ওঠে এটা কি ওই সম্মুখবর্তী অতিকায় জীবের স্থূল বুদ্ধির অগোচর। রক্তজবায় স্বামীপ্রেমে বঙ্গনারীর কলঙ্ক স্বীকারের অসামান্য বিবরণে বাঙালি পাঠকের বিগলিত হৃদয় শুধু কেবল ছাপানো বইয়ের পাতাকেই বাষ্পাকৃত করেছে, তা নয়, সিনেমা থিয়েটারেও তার আর্দ্রতা প্রতি সন্ধ্যায় ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এই সাধারণ বাঙালি পাঠক ও দর্শকের অশিক্ষিত রুচির প্রতি যে পৃথ্বীশ অপরিসীম অবজ্ঞা অনুভব করে সেই মানুষেরই

'পরে ভাগ্যের এই বিচার।

একটা রূঢ় কথা ওর মুখ দিয়ে বেরচ্ছিল, এমন সময় [ বাঁশরি ] অলক্ষ্য পথ দিয়ে ওদের পিছনে এসে দাঁড়ালে। ওকে দেখেই সোমশংকর চমকে দাঁড়িয়ে উঠল, লাল হয়ে উঠল তার মুখ। বাঁশরি বললে, "শংকর, আজ আমার এখানে নেমন্তন্ন ছিল না। ধরে নিচ্ছি সেটা আমার গ্রহের ভুল নয়, গৃহকর্তাদেরই ভুল, সংশোধন করবার জন্যে এলুম। সুষমার সঙ্গে আজ তোমার এনগেজমেন্টের দিন, অথচ এ সভায় আমি নেই এ কখনো হতেই পারে না। খুশি হও-নি অনাহূত এসেছি বলে।"

"খুব খুশি হয়েছি সে কি বলতে হবে।"

"সে কথাটা ভালো ক'রে বলবার জন্যে চলো ওই ফোয়ারার ধারে ময়ূরের ঘরের কাছে। পৃথ্বীশবাবু নিশ্চয়ই প্লটের জন্য একমনে ছিপ ফেলে বসে আছেন, ওঁর ওই অবকাশটা নষ্ট করলে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি হবে। দেখছ-না সর্বসাধারণ থেকে অসীম দূরে এক কোণে আছেন বসে।"

সোমশংকরের হাতে হাত ঝুলিয়ে বাঁশরি চলে গেল ময়ূরের ঘরের দিকে। পুকুরের মাঝখানে ফোয়ারা। ঘাটের পাশে চাঁপা গাছ। গাছের তলায় ঘাসের উপর বসল দুজনে। সোমশংকর সংকোচ বোধ করলে, সবাই তাদের দূর থেকে দেখছে। কিন্তু বাঁশরির ইঙ্গিত অবহেলা করবার শক্তি নেই তার রক্তে। পুলক লাগল ওর দেহে। বাঁশরি বললে, "সময় বেশি নেই, কাজের কথাটা এখনি সেরে ছুটি দেব। তোমার নতুন এনগেজমেন্টের রাস্তায় পুরোনো জঞ্জাল জমেছে, সেগুলো সাফ করে ফেললে পথটা পরিষ্কার হবে। এই নাও।"

এই বলে একটা পান্নার কণ্ঠী, হীরের ব্রেসলেট, একটা মুক্তো বসানো বড়ো গোল ব্রোচ ফুলকাটা রেশমের থলি থেকে বের করে সোমশংকরকে দেখিয়ে আবার থলিতে ভ'রে তার কোলের উপর ফেলে দিলে। থলিটা বাঁশরির নিজের হাতের কাজ করা। সোমশংকর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "বাঁশি, জানো আমার মুখে কথা জোগায় না। যতটুকু বলতে পারলেম না তার সব মানে নিজে বুঝে নিয়ো।" বাঁশরি দাঁড়িয়ে উঠল। বললে, "সব কথাই আমার জানা, মানে আমি বুঝি। এখন যাও, তোমাদের সময় হল।"

"যেয়ো না বাঁশি, ভুল বুঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ শহরে এসে কলেজে পড়া আরম্ভের মুখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে। তার দাম কিছুতে শোধ হবে না। তুচ্ছ এই গয়নাগুলো।"

"আমার শেষ কথাটা শোনো শংকর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অরুণ রঙের মধ্যে, ডাক দিয়ে বাইরে আনলে যাকে তাকে নাও বা না নাও, নিজে তো তাকে পেলুম। আত্মপরিচয় ঘটল, বাস। দুই পক্ষের হয়ে গেল শোধবোধ। এখন দুইজনে অঋণী হয়ে আপন-আপন পথে চললুম, আর কী চাই।" সোমশংকর থলিটা পকেটের মধ্যে পুরে গয়নাগুলো ফেলে দিলে পুকুরে। বাঁশরি দ্রুতপদে চলে গেল যেখানে বসে আছে পৃথ্বীশ। সকলেরই লক্ষ্যগোচর ভাবে বসল তার পাশে। প্রশ্রয় পেয়ে পৃথ্বীশ একটু ঝগড়ার সুরে বললে, "এত দেরি করে এলে যে।"

"প্রমাণ করবার জন্যে যে বাঘ-ভাল্লুকের মধ্যে আসো নি। সবাই বলে উপন্যাসের নতুন পথ খুলেছ নিজের জোরে, আর এখানকার এই পুতুল নাচের মেলার পথটা বের করতে ওফিস্যাল গাইড চাই, লোকে যে হাসবে।"

"পথ না পাই তো অন্তত গাইডকে তো পাওয়া গেল।" এই বলে একটু ভাবের ঝোঁক দিয়ে ওর দিকে তাকালে। এই রকম আবিষ্ট অবস্থায় পৃথ্বীশের মুখের ভঙ্গি বাঁশরি সইতে পারত না। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "সস্তা মিষ্টান্নের কারবার শুরু করতে আজ ডাকি নি তোমাকে। সত্যি করে দেখতে শেখো, তার পরে সত্যি করে লিখতে শিখতে পারবে। অনেক মানুষ অনেক

অমানুষ আছে চারি দিকে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে।"

"নেই বা দেখলুম, তোমার কী তাতে?"

"লিখতে যে পারি নে পৃথ্বীশ। চোখে দেখি মনে বুঝি। ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে একদিন বাংলা দেশে কারিগরদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছিল। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙুলটা কেটে দিয়েছেন। আমদানি করা মালে কাজ চালাতে হয়। সেটা কিন্তু সাচ্চা হওয়া চাই।"

এমন সময় কাছে এল সুষমা।

সুষমাকে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। সচরাচর এরকম চেহারা দেখা যায় না। লম্বা সতেজ সবল, সহজ মর্যাদায় সমুন্নত, রঙ যাকে বলে কনক গৌর, ফিকেচাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক স্পষ্ট করে যেন কুঁদে তোলা।

সুষমা পৃথ্বীশকে একটা নমস্কার করে বাঁশরিকে বললে, "বাঁশি কোণে লুকিয়ে কেন?"

"কুনো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্যে। সম্প্রতি বেকার হওয়াতে এই দায়িত্বটা নিয়েছি— দিন কাটছে একরকম। খনির সোনাকে শানে চড়িয়ে নাম করতে পারব। পূর্ব হতেই হাতযশ আছে। জহরৎকে দামি করে তোলে জহরী, পরের ভোগের জন্যে। সুষী, ইনিই হচ্ছেন পৃথ্বীশবাবু জানো বোধহয়।"

"খুব জানি, এই সেদিন পড়ছিলুম, এঁর 'বোকার বুদ্ধি' গল্পটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বুঝতেই পারলুম না।"

পৃথ্বীশ বললে, "অর্থাৎ বইটা এমনিই কি ভালো।"

"ও-সব ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরির উপর। আমি সময় পেলে শুধু পড়ি, তার পরে বলতে কিছু সাহস হয় না, পাছে ধরা পড়ে কালচারের খাক্‌তি।"

বাঁশরি বললে, "বাংলার মানুষ সম্বন্ধে গল্পের ছাঁচে ন্যাচরল হিস্‌ট্রি লিখছেন পৃথ্বীশবাবু, যেখানটা জানেন না দগদগে রঙ দেন লেপে মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে। দেখে দয়া হল। বললুম, জীবজন্তুর সাইকোলজির খোঁজে গুহা-গহ্বরে যেতে যদি খরচে না কুলোয় জুওলজিকালের খাঁচাগুলোর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিপাত করতে দোষ কী?"

"তাই বুঝি এনেছ এখানে?"

"পাপ মুখে বলব কী করে তা কবুল করছি। পৃথ্বীশবাবুর হাত পাকা, কিন্তু মালমসলাও তো পাকা হওয়া চাই। যতদূর সাধ্য, জোগান দেবার মজুরিগিরি করছি। এর পরে যে জিনিস বেরবে পৃথিবী চমকে উঠবে, নোবেল প্রাইজ কমিটি পর্যন্ত।"

"ততদিন অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে আমাদের ওদিকে চলুন। সবাই উৎসুক হয়ে আছে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। মেয়েরা অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে ঘুরছে কাছে আসতে সাহস নেই। বাঁশি, একলা ওঁকে বেড়া দিয়ে রাখলে অনেকের অভিশাপ কুড়োতে হবে।"

বাঁশরি উচ্চহাস্যে হেসে উঠল। "সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর। সে তুমি জানো। রাজারা দেশ জয় করত ধন লুঠের জন্যে। মেয়েদের লুঠের মাল প্রতিবেশিনীদের ঈর্ষা।" এ কথার উত্তর না দিয়ে সুষমা বললে, "পৃথ্বীশবাবু, গণ্ডি পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার যাবেন ওদিকটাতে"— এই বলে চলে গেল।

পৃথ্বীশ তখনি বলে উঠল, "কী আশ্চর্য ওকে দেখতে। বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না— যেন এথীনা, যেন মিনার্ভা, যেন ব্রুন্‌ হিল্ড।"

উচ্চস্বরে হাসতে লাগল বাঁশরি। বলে উঠল, "যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষ হোক-না সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। নিজেকে হাড়পাকা রিয়ালিস্ট বলে দেমাক করো, ভান করো মন্তর মান না। এক পলকে লাগল মন্তর, উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজিক যুগে। মনটা তোমাদের রূপকথার, সেইজন্যেই কোমর বেঁধে কলমটাকে টেনে চলেছ উজানপথে। দুর্বল ব'লেই বলের এত বড়াই।"

পৃথ্বীশ বললে, "সে কথা মাথা হেঁট করে মানব, পুরুষ জাত দুর্বল জাত।"

বাঁশরি বললে, "তোমরা আবার রিয়ালিস্ট! রিয়ালিস্ট মেয়েরা। আমরা মন্তর মানি নে। যতবড়ো স্থূল পদার্থ হও, তোমরা যা, তোমাদের তাই বলেই জানি। রঙ আমরা মাখাই নে তোমাদের মুখে, মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব, মেয়েদের কাজ হয়েছে তোমাদের ভোলানো। পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা, মিনার্ভা! হায় রে হায়! ওগো রিয়ালিস্ট, এটুকু বুঝতে পার না যে, রাস্তায় চলতে চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালির দোকানে এঁকেছ কড়া তুলিতে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা, মিনার্ভা।"

বাঁশরির ঝাঁঝ দেখে পৃথ্বীশ মনে মনে হাসলে। বললে, "বৈদিক কালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলোনো।— কিন্তু যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তি করতেন। তোমাদের যে সেই দশা দেখি বাঁশি। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা, আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না, এমনি করে মাটি করলে এই জাতটাকে।"

"সত্যি সত্যি, খুব সত্যি! ওই বোকাদের আমরা বসাই উঁচু বেদীতে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে হাজার গুণে ভুলি।"

পৃথ্বীশ জিজ্ঞাসা করল, "এর উপায় কী।"

বাঁশরি বললে, "তাই তো বলি অন্তত লেখবার বেলায় সত্যি কথাটা লেখো। আর মন্তর নয় মাইথলজি নয়। মিনার্ভার মুখোশটা খুলে একবার দেখো। সেজেগুজে পানের ছিপে ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালি যে মন্তরটা ছড়ায়, ওই আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে। সামনে পড়েছে পথচলতি এক রাজা, তাঁকে ভোলাতে বসেছে কিসের জন্যে? টাকার জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিসটা মাইথলজি নয়, ওটা ব্যাঙ্কের। ওটা তোমাদের রিয়ালিজমের কোটায়।"

পৃথ্বীশ বললে, "টাকার প্রতি ওঁর দৃষ্টি আছে সেটাতে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল, সেইসঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।"

"আছে গো আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজে দেখলে দেখতে পাবে পানওয়ালিরও হৃদয় আছে, কিন্তু টাকা এক দিকে হৃদয়টা আর-এক দিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখন গল্প জমবে। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, বলবে মেয়েদের খেলো করা হল, অর্থাৎ তাদের মন্ত্রশক্তিতে বোকাদের মনে খট্‌কা লাগানো হচ্ছে। উঁচু দরের পুরুষ পাঠকেরা গালি পাড়বে, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া, সর্বনাশ। কিন্তু ভয় কোরো না পৃথ্বীশ, রঙ যখন যাবে জ্বলে, মন্ত্র যখন পড়বে চাপা— তখনো সত্য থাকবে টিকে।"

"ওঁর হৃদয়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? অসভ্যতা হবে, কিন্তু লেখক তো ড্রয়িংরুমের পোষা ভদ্রলোক নয়, সে অত্যন্ত আদিম শ্রেণীর সৃষ্টিকর্তা, চতুর্মুখের তুল্য কিংবা প্রলয়কর্তা দিগম্বরের স্বজাত।"

"ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে চোখ যদি থাকে। এখন চলো ওইদিকে, তোমাকে নিয়ে ওদের মধ্যে প্রসাদ ভাগ করে দেই গে।"

"তোমার প্রসাদ?"

"হ্যাঁ, আমারই প্রসাদ। আমার নিন্দে দিয়েই এর স্বাদটা হয়ে উঠেছে উপাদেয়।"

"দুঃখের কথা জানাই তোমাকে বাঁশরি। চাদরটাতে মস্ত একটা কালির দাগ। অন্যমনস্ক হয়ে দেখতে পাই নি।"

"এখানে কারো কাপড়ে কোনো দাগ নেই, তা দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"তা হলে জিত রইল একা তোমারই। তুমি রিয়ালিস্ট, ওই কালীর দাগ তোমার ভূষণ। আজও খাঁটি হয়ে ওঠনি বলেই এতক্ষণ লজ্জা করছিলে।"

"তুমি আমাকে খাঁটি করে তুলবে?"

"হাঁ, তুলব, যদি সম্ভব হয়।"

বাঁশরির প্রত্যেক কথায় পৃথ্বীশের মনটা যেন চুমুকে মদ খাচ্ছে। এই দলের মেয়ের সঙ্গে এই ওর প্রথম আলাপ। অপরিচিতের অভিজ্ঞতায় মনটা পথ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে পদে পদে। কোন্ কথাটা পৌঁছোয় কোন্ অর্থ পর্যন্ত, কতদূর পা বাড়ালে পড়বে না গর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ঠাহর করে উঠতে পারছে না। এই অনিশ্চয়তা মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে দিনরাত। যে কথার যে উত্তর দেয় নি বাড়িতে ফিরে এসে সেইটে ও বাজাতে থাকে, ঠিক সময় কেন মনে আসে নি ভেবে হায় হায় করে। বাঁশরি ওকে অনেকটা প্রশ্রয় দিয়েছে, তবু পৃথ্বীশ বিষম ভয় করে তাকে। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে সাহসী পুরুষের স্পর্ধাকেই পুরস্কৃত করে মেয়েরা, যারা ওদের সসংকোচে পথ ছেড়ে দেয়, বঞ্চিত হয় তারাই। নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, ওর গোঁয়ার্তুমি যদি হত খাঁটি গিনি সোনার দরের, বাজালে টন্ করে উঠত, তা হলে মেয়ে মহলে উড়ত ওর জয়-পতাকা। পুরুষের উপকরণে বিভীষিকা বীভৎসতার দাম আছে ওদের কাছে।

পৃথ্বীশ স্পষ্ট বুঝেছে যে, নিজেদের সমাজের উপর বাঁশরির জোর দখল। ওকে সবাই যে ভালোবাসে তা নয়, কিন্তু তুচ্ছ করবার শক্তি নেই কারো। তাই সে যখন স্বয়ং পৃথ্বীশকে পাশে করে নিয়ে চলল আসরের মধ্যে, পৃথ্বীশ তখন মাথাটা তুলে চলতেই পারলে, যদিও লক্ষ্মীছাড়া এণ্ডিচাদরের কালির লাঞ্ছনা মন থেকে সম্পূর্ণ ঘোচে নি।

জনতার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছিল, কিন্তু ওর উপর থেকে সমবেত সকলের লক্ষ্য তখন গেছে সরে।

সবেমাত্র উপস্থিত হয়েছে আর-একটি লোক তার উপরে মন না দিয়ে চলে না।

সোমশংকর তার কাছে বিনয়াবনত, সুষমার দেহমন ভক্তিতে আবিষ্ট। অন্য সকলে কীভাবে ওকে অভ্যর্থনা করবে স্থির করতে পারছে না, ভক্তি দেখাতেও সংকোচ, না দেখাতেও লজ্জা। দেহের দৈর্ঘ্য মাঝারি আয়তনের চেয়ে কিছু বড়ো, মনে হয় চারি দিকের সকলের থেকে পৃথক তার ঋজু সুদৃঢ় শরীর, যেন ওকে ঘিরে আছে একটা সূক্ষ্ম ভৌতিক পরিবেষ্টন। ললাট অসামান্য উন্নত, জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ, ঠোঁটে রয়েছে অনুচ্চারিত অনুশাসন, মুখের রঙ পাণ্ডুর স্বচ্ছশ্যাম, অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ধৌত। দাড়িগোঁফ কামানো, সুডৌল মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল, পায়ে নেই জুতো, তসরের ধুতিপরা, গায়ে খয়েরি রঙের ঢিলে জামা। নাম মুক্তারাম শর্মা; সকলেরই বিশ্বাস আসল নাম ওটা নয়। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ঈষৎ হেসে শান্ত হয়ে থাকে, তা নিয়ে কল্পনা করে নানা লোকে নানা প্রকার, কোনোটা অদ্ভুত অপ্রাকৃত, কোনোটা কুৎসায় কটু। ওর শিক্ষা য়ুরোপে এইরকম জনশ্রুতি— নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কলেজের ছেলেরা অনেকে ওর কাছে আসে পড়া নেবার জন্যে, তাদের বিশ্বাস পরীক্ষায় উতরিয়ে দিতে ওর মতো কেউ নেই, অথচ কলেজি শিক্ষার 'পরে ওর নিরতিশয় অবজ্ঞা। এই শেখাবার উপলক্ষ করে ছেলেদের উপর ওর প্রভাব পড়ছে ছড়িয়ে। এমন একদল আছে যারা ওর জন্য প্রাণ দিতে পারে। এই ছেলেদের ভিতর থেকে বাছাই ক'রে ও একটি অন্তরঙ্গ চক্র তৈরি করেছে কি না কে জানে— হয়তো করেছে। ছুটির সময় একদলকে সঙ্গে নিয়ে ও ভ্রমণ করতে যায় দূর প্রদেশে, দেখা যায় সব জায়গাতেই ওর পরিচিত ভক্ত, তাদের ভাষাও ওর জানা।

সুষমা যখন প্রথম কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মুক্তারামের কাছে ওর পাঠ আরম্ভ। বাঁধা পাঠ্য বইটাকে গৌণ করে শিক্ষক পড়িয়েছে আপন মত অনুসারে নানা বিষয়ের বই। ছুটির সময় যথাযোগ্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ওকে ছুরি খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে, ডিঙি নৌকো দুহাতে দাঁড় ধরে বাইতে করেছে পটু, মোটর গাড়ির কলের তত্ত্ব, চালানোর কৌশল নিপুণ করে শিখিয়েছে।

সুষমার বিধবা মা ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান ব্রাহ্মমতে উপাসনা ক'রে হয় এই তার ছিল ইচ্ছে। সুষমা জিদ করে ধরে পড়ল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে মুক্তারামকে

দিয়ে। মুক্তারামের কোন্ সম্প্রদায় কেউ জানে না, ব্রাহ্মসমাজে তার গতিবিধি নেই, আর আচরণ নয় নিষ্ঠাবান হিন্দুর মতো। সুষমার মা বিভাসিনী গভীর ভক্তি করে মুক্তারামকে, তবু তার ইচ্ছা ছিল সমাজের লোক দিয়েই ক্রিয়াটা নিষ্পন্ন হয়। সুষমা কোনোমতেই রাজি হল না। আজ মুক্তারামের আহ্বান এখানে সেই কারণেই।

মুক্তারামকে সবাই সংকোচ করে, বাঁশরি করে না। সে এসেই একটি ছোটোরকম নমস্কার করে বললে, "সুষমার মাস্টারিতে আজ শেষ ইস্তফা দিতে এসেছেন?"

"কেন দেব? আরো একটি ছাত্র বাড়ল।"

বাঁশরি সোমশংকরের দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনে বললে, "তাকে মুগ্ধবোধের পাঠ শুরু করাবেন? ওই দেখুন-না, মুগ্ধতার তলায় ডুবেছে মানুষটা, হঠাৎ ওর বোধোদয় কোনোদিন হয় যদি সেদিন ডাক্তার ডাকতে হবে।" মুক্তারাম কোনো উত্তর না করে বাঁশরির মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালে। নীরবে জানালে একে বলে ধৃষ্টতা। বাঁশরির মতো মেয়েও কুণ্ঠিত হল এই দৃষ্টিপাতে।

স্বল্পজলা নদীর স্রোতঃপথ প্রশস্ত হয়ে এখানে-ওখানে চর পড়ে যেরকম দৃশ্যটা হয় সেইরকম চেহারা বিভাসিনীর। শিথিল প্রসারিত হয়েছে দেহ, কিছু মাংসবাহুল্য ঘটেছে তবু চাপা পড়ে নি যৌবনের ধারা। তার সৌন্দর্য স্বীকার করতে হয় আজও। পতিকুলে মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই তার, স্বামীর দত্ত সম্পত্তি থেকে সংসারের অভাব সহজেই পূরণ হয়ে আরো কিছু হাতে থাকে। কন্যার ভবিষ্যৎ লক্ষ করে সেই টাকা এতদিন সঞ্চিত হয়েছে বিশেষ যত্নে। সোমশংকরের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ প্রস্তাবের পর থেকে সেই দায়িত্বের টান এসেছে আলগা হয়ে।

এই বিবাহ যে হতে পারে এ ছিল অভাবনীয়। সবাই জানত রাজকুমার সম্পূর্ণ বাঁশরির প্রভাবের অধীনে, কেউ যে তার নাগাল পেতে পারে এ কথা মনে হত অসম্ভব। কিন্তু সেসময় বেঁচে ছিল পূর্বতন রাজা প্রভুশংকর, বাঁশরির সঙ্গে সোমশংকরের বিবাহের প্রধান বাধা। অল্পদিন হল পিতার মৃত্যু হয়েছে। তবু জাতের বাধা কাটতে চায় না। ক্ষত্রিয়বংশের বাইরে রাজার বিবাহ প্রস্তাবে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমন সময়ে মুক্তারাম এই সম্বন্ধ পাকা করলেন কী করে সেই এক কাহিনী।

বিভাসিনী এসে সংবাদ দিল, সময় উপস্থিত। ঘরের ভিতরের বেদি রচনা করে সভার স্থান হয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা সবাই চলল সেইদিকে। বাঁশরির নিমন্ত্রণ হয় নি, তা ছাড়া কন্যাপক্ষের ইচ্ছে ছিল না সে উপস্থিত থাকে। বাঁশরি এসেছে ভদ্ররীতি এবং ভদ্রসমাজকে উপেক্ষা ক'রে। তার দৃঢ় পণ সে থাকবে অনুষ্ঠান-সভার মধ্যেই। কেউ-বা হাসবে, কেউ-বা রাগবে, কিন্তু কিসের কেয়ার করে সে। মনকে শক্ত করে মাথা তুলে পা বাড়াচ্ছিল ঘরের মধ্যে, পা গেল কেঁপে, বোধ করি চোখে আসছিল জল, পারলে না ঘরে যেতে, আটকে রইল বাইরে।

পৃথ্বীশ জিজ্ঞাসা করলে, "ঘরে যাবে না?"

বাঁশরি বললে, "না, সস্তাদামের সদুপদেশ শুনলে গায়ে জ্বর আসে।"

"সদুপদেশ!"

"হাঁ, উপদেষ্টার শিকারের এই তো সময়, যাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ। পায়ে দড়ি-বাঁধা জীবের 'পরে নিঃশেষ করে দেয় শব্দভেদী বাণের তূণ, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ পায় আহূত-রবাহূতের দল।"

"আমি একবার দেখে আসি-না।"

"না, শোনো, একটা প্রশ্ন আছে। সাহিত্য-সম্রাট, গল্পটার মজ্জা যেখানে সেখানে পৌঁচেছে তোমার দৃষ্টি?"

"আমার হয়েছে অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়। লেজটা ধরেছি চেপে বাকিটা টান মেরেছে আমাকে, সমস্ত চেহারাটা পাচ্ছি নে। মোট কথাটা বুঝছি সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুরকে, পাবে ঐশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত হৃদয়টা নয়।"

"শোনো, বলি, সোমশংকর নয় প্রধান নায়ক এ কথা মনে রেখো।"

"তাই না কি। তা হলে অন্তত গল্পের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দাও, তার পরে সাঁতরে হোক খেয়া ধরে হোক পারে পৌঁছব।"

"এ খবরটা বোধ হয় আগে থাকতেই জান, যে, মুক্তারাম তরুণসমাজে বিনামাইনের মাস্টারি করে থাকেন, বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য— কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বাছাই করার রীতি এত কড়া যে এতদিনে একটিমাত্র পেয়েছেন, তারই নাম সুষমা সেন।"

"যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের কী দশা!"

"তাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা কত, খবর পাই নি। কিন্তু এ জানি, তাদের অনেকেই চক্ষু মেলে চাঁদের পানে তাকিয়ে থাকে।"

"সেই চকোরীর দলে তুমি নাম লেখাও নি বাঁশি?"

"তোমার কী মনে হয়?"

"আমার মনে হয় চকোরী নও, তুমি মিসেস রাহুর পদ পাবার উমেদার। তুমি যাকে নেবে তাকে আগাগোড়া দেবে আত্মসাৎ করে, চক্ষু মেলে চেয়ে থাকা নয়।"

"ধন্য! 'সাধু', চরিত্রচিত্রে তুমি হবে বাংলাদেশে প্রথমশ্রেণীর প্রথম। গোল্ডমেডালিস্ট। লোকমুখে শোনা যায় মেয়েদের স্বভাবের রহস্য ভেদ করতে হার মানেন মেয়েদের সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত— তোমার দৃষ্টি দেখছি কোনো বাধা মানে না।"

হাতজোড় করে পৃথ্বীশ— বললে, "বন্দনা সারা হল, এবার পালা শুরু করো।"

"এটা কি এখনো আন্দাজ করতে পার নি যে, সুষমা ওই মুক্তারাম সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গিয়েছে।"

"ভালোবাসা না ভক্তি?"

"চরিত্রবিশারদ, এখনো জান না, মেয়েদের যে ভালোবাসা ভক্তিতে পৌঁছয় সেটা তাদের মহাপ্রয়াণ। তার থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। মেয়েদের মায়ায় অভিভূত হয়ে সমানক্ষেত্রে যারা ধরা দিয়েছে তারা কেনে ইন্টারমিডিয়েটের টিকিট, কেউ-বা থার্ডক্লাসের। মেয়েদের কাছে হার মানল না যে, ওদের ভুজপাশের দিগ্‌বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্য গগনে, দুই জোড়হাত উপরে তুলে তাকেই দিলে মেয়েরা আপন শ্রেষ্ঠদান। দেখ নি কী সন্ন্যাসী যেখানে সেখানে মেয়েদের কী ভিড়।"

"আচ্ছা, মানছি তা, কিন্তু উল্টোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান বর্বরের দিকে, তাদের কঠোরতম অপমানে ওরা পুলকিত হয়ে ওঠে, পিছন পিছন রসাতল পর্যন্ত যেতে হয় রাজি।"

"তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত, এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের ভালোবাসা। উপেক্ষা তারই 'পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিংবা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।"

"বুঝলুম, ওই সন্ন্যাসীকে ভালোবেসেছে সুষমা।"

"কী ভালোবাসা। মরণের বাড়া। কোনো সংকোচ ছিল না। কেননা ঠাউরেছিল একেই বলে ভক্তি। মাঝে মাঝে মুক্তারামকে দূরে যেতে হত কাজে, তখন সুষমা শুকিয়ে যেত, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাসে, চোখে প্রকাশ পেত জ্বালা, মন শূন্যে শূন্যে খুঁজে বেড়াত কার দর্শন, পড়াশুনোতে মন দেওয়া হত অসম্ভব। বিষম ভাবনা হল মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাঁশি, কী করি।" আমার বুদ্ধির উপর বিশ্বাস ছিল তখনো। আমি বললেম, "মুক্তারামের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও।" শুনে আঁৎকে উঠে বললেন, "এমন কথা ভাবতে পার কী করে।" তর্ক না করে নিজেই চলে গেলুম মুক্তারামের কাছে। সোজা বললেম, "নিশ্চয় জানেন, সুষমা আপনাকে অসম্ভবরকম ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করে উদ্ধার করুন বিপদ থেকে।" এমন করে তাকালেন

মুখের দিকে, আমার রক্তচলাচল গেল থেমে। গম্ভীর সুরে বললেন, "সুষমা আমার ছাত্রী, তার ভার আমার উপরে, তা ছাড়া আমার ভার তোমার উপরে নেই।" পুরুষের কাছে এত বড়ো ধাক্কা আমার জীবনে এই প্রথম। ধারণা ছিল সব পুরুষের 'পরেই সব মেয়ের আবদার চলে যদি সাহস থাকে আবদার করবার। দেখলেম দুর্ভেদ্য দুর্গ আছে, মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই রুদ্ধদ্বারের সামনে। এর পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যায় একখানা চিঠি থেকে, তার কপি দেখাব তোমার শিক্ষার্থে।"

এমন সময়ে যে-ঘরে সভা বসেছিল সেখানে কোন্ এক জানলা থেকে অপরাহু-সূর্যের রশ্মি বাঁকা হয়ে পড়ল ঠিক সুষমার মুখে। দূর থেকে বাঁশরি দেখতে পেলে উপদেশের এক অংশে মুক্তারাম বর-কনের পরস্পরের আঙটিবদল উপলক্ষে সুষমার আঙুল থেকে আঙটি খুলে নিয়ে সোমশংকরের আঙুলে পরাচ্ছে। সুষমা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ, শান্ত তার মুখ, দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর [করে] পড়ছে জল।

বাঁশরি বললে, "মুক্তারামের মুখখানা একবার দেখো। ওই যে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন লক্ষ যোজন মাইল দূরে, ওই মেয়েটার মনে যে অগ্নিকাণ্ড চলছে তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই অথচ তাকে নিয়ে উজ্জ্বল ছবি বানিয়ে তুললে, মুক্তরামও নিজের মধ্যে যে তত্ত্বটা নিয়ে আছে সে ওই মেয়েটার মর্মান্তিক বেদনা থেকে বহুদূরে, তবু নিষ্ঠুর রেখায় ফুটিয়ে তুললে নাটকটাকে।"

পৃথ্বীশ জিজ্ঞাসা করলে, "সুষমার প্রতি সন্ন্যাসীর মন সত্যিই এতই যদি নির্লিপ্ত হবে ওকে অমন করে বেছে নিলে কেন?"

"আইডিয়ালিস্ট! বাস্ রে ওদের মতো ভয়ংকর নির্মম জীব নেই জগতে। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়, নিজে খায় না ক্ষিধে পেলেও, সারে সারে নরবলি দেয় আইডিয়ার কাছে। জেঙ্গিস খাঁর চেয়ে সর্বনেশে।"

"বাঁশি, সন্ন্যাসীর 'পরে তোমার মনোভাবে কোনো রস দেখছি না তো। করুণা নয়, ভক্তি তো নয়ই।"

"ভক্তি করবার মেয়ে নই গো আমি! মেয়েদের পরমশত্রু ওই মানুষটা। রাজারানী যদি হতুম মেয়েদের চুলে দড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনীকাঞ্চন ও ছোঁয় না তা নয় কিন্তু তাকে দেয় ফেলে ওর কোন্ এক জগন্নাথের রথের তলায়, বুকের পাঁজর যায় গুঁড়িয়ে।"

"ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো।"

"সন্ধান পাওয়া শক্ত। ওর এক শিষ্যকে জানি, তার রস সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় নি, ডাক দিলে খুশি হয়ে আসে কাছে। সেই মুগ্ধের মুখ থেকে খবর আদায় করেছিলুম। 'তরুণ তাপস সংঘ' নামে মুক্তারাম এক সংঘ বানিয়েছে। বাছা বাছা ছেলেদের পুরোপুরি মানুষ করে তোলবার ব্রত ওর। তার পরে বীজবপনের নিয়মে সমস্ত ভারতবর্ষময় দেবে তাদের ছড়িয়ে।"

"কিন্তু তরুণী?"

"একেবারে বিবর্জিতা।"

"তা হলে সুষমাকে কিসের প্রয়োজন?"

"অন্ন চাই যে। ব্রহ্মচারীকেও ভিক্ষার জন্য আসতে হয় মেয়েদের দ্বারে। রাজভাণ্ডারের চাবি দিতে চান ওর হাতে। রোসো অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে আসছে, এইবার একবার ঘরে ঢুকে দেখে আসি গে।"

গেল ঘরের মধ্যে। তখন মুক্তারাম বলছে, "তোমরা যে সম্বন্ধ স্বীকার করছ, জেনো, সে আত্মপ্রকাশের জন্যে, আত্মবিলোপের জন্যে নয়। যে-সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি, যা বেঁধে রাখে পশুর মতো তা প্রকৃতির হাতে গড়া প্রবৃত্তির শিকলই হোক আর মানুষের কারখানায় গড়া দাসত্বের শিকলই হোক— ধিক্ তাকে।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুষমার মুখ, যেন সে দৈববাণী শুনলে। মুক্তারামের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

চৌরঙ্গি অঞ্চলে বাঁশরিদের বাড়ি। সেখানে ওর দুই অবিবাহিত ভাই থাকে। পাটনা অঞ্চলে থাকতে হয় বাপকে বেহার গবর্মেন্টের কোন্ কাজে। মা প্রায়ই থাকে তারই সঙ্গে, মেয়েকে রাখতে চায় কাছে, মেয়ে কলকাতা ছেড়ে যেতে নারাজ।

পৃথ্বীশকে বাঁশরি এত প্রশ্রয় দেয়, সেটা একেবারেই পছন্দ করে না ভাইরা। সবাই জানে বাঁশরির বুদ্ধি অসামান্য তীক্ষ্ণ, মেয়েদের দিক থেকে সেটা একেবারেই আরামের নয়, তা ছাড়া ওর অধিকাংশ সংকল্প দুঃসাহসিক হিংস্র প্রাণীর মতো, শুধু যে লম্বা লাফ দিতে পারে তা নয়, সঙ্গে থাকে প্রচ্ছন্ন কোষে তীক্ষ্ণ নখর। ওর ভাইরা সুযোগ পেলেই পৃথ্বীশের চেহারা নিয়ে, লেখা নিয়ে ঠাট্টা করে, কিন্তু এ বাড়িতে যাতায়াতের বাধা দেবার আভাসমাত্র দিতে সাহস পায় না।

পৃথ্বীশ জানে এদের ঘরে তার প্রবেশ অনভিলষিত। তাই নিয়ে ওখানকার দ্বারী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পুরুষ অধিবাসীর কাছে ওর সংকোচ ভাঙতে চায় না— ও কেবলই মনে করে, ওর আদ্যোপান্ত সমালোচনা করে সবাই, বিশেষত কপালের সেই দাগটার। এদের বাড়িতে অন্য যে-সব অভ্যাগতদের আসতে দেখে, তারা সাজে সজ্জায় ভাবে ভঙ্গিতে ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ। ও চেষ্টা করে নিজেকে বোঝাতে যে ওরা ডেকোরেটেড ফূল্‌স্, কিন্তু সেই স্বগতোক্তিতে লজ্জা চাপা পড়ে না। ও যখন দেখে অন্যরা এখানে আসে স্বাধিকারের নিঃসংকোচে তখন আপন সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে মনে মনে সবলে স্ফীত করে তুলেও নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পারে না। সেটা বোঝে বাঁশরি এবং এও বোঝে যে বাঁশরির দিকে ওর আকর্ষণ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে অন্তত তার একটা কারণ এই শ্রেণীগত দুরধিগম্যতা। বাঁশরির সামীপ্যে ওর মনে একটা অহংকার জাগে, ইচ্ছে করে দেখুক সব বাইরের লোকে। এই অহংকারটা ওর পক্ষে লজ্জার কারণ। তা জেনেও পারে না সামলাতে। একটা কথা বুঝে নিয়েছে বাঁশরি যে, ওদের বাড়িতে হেঁটে আসতে বাধে পৃথ্বীশের। যখন দরকার হয় নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দেয় ওকে আনতে। অর্থাভাবগ্রস্ত পৃথ্বীশ শোফারকে মোটা বকশিস দিতে ভোলে না।

আজ শৌখিনমণ্ডলীর দিনারম্ভে অর্থাৎ বেলা আটটায় গাড়ি পাঠিয়েছিল বাঁশরি। সেদিন পৃথ্বীশের হল অকালবোধন। তারও দিনগণনা হয় পূর্বাহ্ণের প্রথম ক'টা ঘণ্টা বাদ দিয়ে। বাঁশরির ভাইরা তখন বিছানায় শুয়ে আধ-মেলা চোখে চা খাচ্ছে। সূর্যের যেমন অরুণ সারথি, ওদের জাগরণের তেমনি অগ্রদূত গরম চায়ের পেয়ালা। পৃথ্বীশ যখন এল বাঁশরির চুলবাঁধা তখন শিথিল, মুখ ফ্যাকাসে, আটপৌরে শাড়ি, পায়ে ঘাসের জাপানি চটি। মুগ্ধ হল পৃথ্বীশের মন, অসজ্জিত রূপের মধ্যে অন্তরঙ্গতা আছে, তাতে দুরু দুরু কাঁপিয়ে দিল ওর বুকের ভিতরটা। ইচ্ছে করতে লাগল মরীয়া হয়ে দুঃসাহসিক কথা একটা কিছু বলে ফেলে। মুখে বেধে গেল, শুধু বললে, "বাঁশি, আজ তোমাকে দেখাচ্ছে সকালবেলাকার অলস চাঁদের মতো।"

বাঁশরির স্পষ্ট করে বলতে ইচ্ছে করছিল 'অকরুণ বিধাতার শাপ তোমার মুখে। মুগ্ধ দৃষ্টি তোমাকে মানায় না। দোহাই তোমার, গদগদ ভাবটা রেখে দিয়ো আপন নির্জন ঘরের বিরহের জন্য জমিয়ে।' পৃথ্বীশের মুখের 'পর চোখ রাখা বাঁশরির পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব, বিশেষত যখন সেই মুখে কোনো আবেগের তরঙ্গ খেলে, হয় দুর্নিবার হাসি পায়, নয় ওকে পীড়িত করে।

পৃথ্বীশের ভাবোচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বাঁশরি বললে, "কাজের কথার জন্যে ডেকেছি, অন্য অবান্তর কথার প্রবেশ স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড।"

পৃথ্বীশ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, "জরুরি কথা এত কী আছে।"

"জরুরি নয়! এই বুঝি তুমি আর্টিস্ট। নিজের চক্ষে দেখলে আসন্ন ট্র্যাজেডির প্রলয় সংকেত। এখনো রঙের তুলি বাগিয়ে ধরতে মন ছট্‌ফট্ করছে না? আমার তো কাল সারারাত ঘুম হল

না। কী বলব, বিধাতা শক্তি দেন নি নইলে এমন কিছু বলতুম যার অক্ষরে অক্ষরে উঠত আগুনের ফোয়ারা। আর্টিস্টের মতো দেখতে পাচ্ছি সমস্তটাই স্পষ্ট, অথচ আর্টিস্টের মতো বলতে পারছি না স্পষ্ট করে। চতুর্মুখ যদি বোবা হতেন তা হলে অসৃষ্ট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।"

"বাঁশি, কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না? কে বলে তুমি নও পুরো আর্টিস্ট? তোমার শক্তির যে-সব প্রমাণ মুখে-মুখে যেখানে-সেখানে হরির লুটের মতো ছড়িয়ে ফেলো দেখে আমার ঈর্ষা হয়।"

"আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোক স্পষ্ট সামনে পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই অথচ বলা আছে এইটে পুরুষ আর্টিস্টের। সেই বলা চিরকালের— আমাদের বলা যত ভালোই হোক সে কেবল নগদ বিদায় দিনেদিনের। ঘরে ঘরে মুহূর্তে মুহূর্তে সে বুদ্‌বুদের মতো উঠছে আর মেলাচ্ছে।"

পুরুষ আর্টিস্টের অহংকার ঘনিয়ে উঠল, সে বললে, "আচ্ছা বেশ, কাজ শুরু হোক। কাল বলেছিলে একটা চিঠির কথা।"

"এই নাও", ব'লে একটা চিঠির কপি করা এক অংশ ওকে পড়তে দিলে। তাতে আছে—"প্রেমে মানুষের মুক্তি। কবিরা যাকে ভালোবাসা বলে সেটা বন্ধন। তাতে একজন মানুষকে আসক্তির দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকেই তীব্র স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে তোলে। যত তার দাম প্রকৃতিজুয়ারি তার চেয়ে অনেক বেশি ঠকিয়ে আদায় করে। এই তো প্রকৃতির চাতুরি, নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। মোহের জাদু লাগিয়ে এই মরীচিকার সৃষ্টি। এই কথাটাকেই শেক্সপিয়ার কৌতুকচ্ছলে দেখিয়েছেন তাঁর ভরাবসন্তের স্বপ্নে। প্রেম জাগ্রত দৃষ্টি, নরনারীর ভালোবাসা স্বপ্নদৃষ্টি নেশার ঘোরে। প্রকৃতি মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে অনুভূতিকে তীব্র করে, তাকে সহজ সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। এই ভোলানোটা প্রকৃতির স্বরচিত। খাঁচাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশায় বশ করা যায়। বন্ধনের প্রতি আসক্তিকে সর্বান্তঃকরণে ভয় করো, জেনো ওটা সত্য নয়। সংসারে যত দুঃখ, যত বিরোধ সকলের মূল এই ভ্রান্তি নিয়ে, যে ভ্রান্তি শিকলকে মূল্যবান করে দেখায়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে যদি চিনতে চাও, তবে বিচার করলেই বুঝতে পারবে কোন্‌টাতে মুক্তি দেয়, কোন্‌টাতে দেয় না। প্রেমে মুক্তি, আসক্তিতে বন্ধন।"

"চিঠি পড়লুম। তার পরে?" "তারপরে তোমার মাথা, অর্থাৎ কল্পনা। মনে মনে শুনতে পাচ্ছ না, শিষ্যকে বলছেন সন্ন্যাসী— ভালোবাসা আমাকেও না, ভালোবাসা আর কাউকেও না। নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাপদ আত্মনিবেদন, এই হল দীক্ষামন্ত্র।"

"তা হলে এর মধ্যে সোমশংকর আসে কোথা থেকে?"

সেই রাস্তাই তো তৈরি হল প্রেমে। সন্ন্যাসী বলেছেন প্রেমে সকলেরই অধিকার। সোমশংকরের তাতে পেট ভরবে না, সে চেয়েছিল বিশেষ প্রেম, মীনলাঞ্ছনের মার্কা মারা। কিন্তু সর্বনাশে সমুৎপন্নে যথালাভ, অর্ধেকের চেয়ে কম হলেও চলে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সুষমা ওকে নিশ্চয় খুব গম্ভীর সুরে বলেছিল, যে-প্রেম বিশ্বের সকলের জন্যে আমাদের দুজনের মিলন সেই প্রেমের পথকেই খুলে দেবে। পথের মাঝখানটা ঘিরে নিয়ে দেয়াল তুলবে না। শুনে সোমশংকরের ভালোবাসা দ্বিগুণ প্রবল হয়েছে। সেই ভালোবাসা নির্বিশেষ প্রেম নয় এ কথা লিখে রাখতে পারো।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে।"

"আমি হলে পরম ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর কথা সোনার জলে মরক্কো চামড়ার বাঁধা খাতায় লিখে রাখতুম, তার পরে দুর্দম আসক্তির জোর কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতাম কালির আঁচড় কেটে। ওই তাপস চায় প্রকৃতির মতোই মুগ্ধ করতে, নিজের মন্ত্র দিয়ে অন্যের

মন্ত্রটা খণ্ডন করবার জন্যে। আমার উপর খাটত না এ মন্ত্র, যদি একটু সম্ভব হত তা হলে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে সুষমার দিকে তাকাত না, এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি।"

"বেশ কথা, কিন্তু ইতিহাসের গোড়ার দিকে অনেকটা ফাঁক পড়েছে, সেটা ভরিয়ে নিতে হবে। ওদের বিবাহসম্বন্ধ সন্ন্যাসী ঘটালো কী উপায়ে?"

"প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়, তারা যে কোনো-এক খৃস্টশতাব্দীতে দক্ষিণ থেকে এসেছিল দিগ্‌বিজয় বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশে, সেইটে প্রমাণ করে হিন্দি অনুবাদসহ সংস্কৃততে লিখলে এক পুঁথি। কাশীর কোনো কোনো দ্রাবিড়ী পণ্ডিতের সমর্থন জুড়ে দিলে তার সঙ্গে। সন্ন্যাসী স্বয়ং সোমশংকরের রাজ্যে গেল— প্রজারা চেহারা দেখেই তেত্রিশ কোটির মধ্যে কোন্-এক দেবতার অংশাবতার বলে নিলে ওকে মাথায় করে। সভাপণ্ডিত শুদ্ধ মুগ্ধ হল আলাপে। কুমায়ুনের কোন্ পাহাড়ে এদের দুজনের ঘটালে সাক্ষাৎ। ওরা দোঁহে মিলে ঘোড়ায় চড়ে ফিরল দুর্গমে, শিকারে বেরোল বনে জঙ্গলে। বীরপুরুষের মন ভুলল অনেকখানি প্রকৃতির মোহে, অনেকখানি সন্ন্যাসীর মন্ত্রে, তার পর এই যা দেখছ।"

"ইচ্ছা করছে তরুণ তাপস সংঘে আমিও যোগ দিই।"

"কেন, সংসারতাপ নিবারণের জন্যে, না পেটের জ্বালা?"

"সন্ন্যাসীর Love's philosophy যা শুনলুম শেলির সঙ্গে তা মেলে না কিন্তু মনের শান্তি পাবার জন্যে নিজের পক্ষে আশু তার প্রয়োজন।"

"যেয়ো সংঘে, কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু তার আগে এমন একটা গল্প লিখে যাও যাকে নাম দিতে পারবে মোহমুদ্‌গর।"

"শংকরের মোহমুদ্‌গর?"

"হাঁ তাই। সত্য কথা লিখতে শেখো। ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নয়, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে।"

বাঁশরির মুখ লাল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন ইস্পাতের ঝল্‌সানি। পৃথ্বীশ মনে মনে ভাবছে— কী সুন্দর দেখাচ্ছে এ'কে।

বাঁশরি একসময়ে চৌকি থেকে উঠে বললে, "বলবার কথা শেষ হল। এখন মফিজকে বলে আসি তোমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসুক।"

পৃথ্বীশ ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরলে, বললে, "খাবার চাই নে, তুমি যেয়ো না।"

বাঁশরি হাত ছুটিয়ে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। বললে, "আমাকে হঠাৎ তোমার 'বেমানান' গল্পের নায়িকা বানিয়ে তুলো না, তোমার জানা উচিত ছিল আমি ভয়ংকর সত্যি।"

ঠিক সেই সময়ে ড্রেসিং গাউন প'রে ওর ভাই সতীশ ঢুকে পড়ল ঘরে। জিজ্ঞাসা করলে, "উচ্চ হাসির আওয়াজ শুনলাম যে।"

"উনি এতক্ষণ স্টেজের মুনুবাবুর নকল করছিলেন। ভারি মজা।"

"পৃথ্বীশবাবুর নকল আসে নাকি?"

"ওঁর বই পড়লেই তো টের পাওয়া যায়। শোনা, ওর জন্যে মফিজকে কিছু খাবার আনতে বলে দাও তো।"

পৃথ্বীশ বললে, "না দরকার নেই, কাজ আছে, দেরি করতে পারব না।" ব'লে দ্রুত নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাঁশরি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললে, "মনে থাকে যেন আজ বিকেলে সিনেমা আছে। তোমারই সেই পদ্মাবতী।" উত্তর এল, "সময় হবে না।"

বাঁশরি মনে মনে বললে, সময় হবেই জানি। অন্যদিনের চেয়ে দু ঘণ্টা আগে।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, তুমি ওই পৃথ্বীশের মধ্যে কী দেখতে পাও বলো দেখি।"

"ওর বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজ দিয়েছিলেন দেখতে পাই তার উত্তর। আর তার মাঝখানটাতে দেখি পরীক্ষকের কাটা দাগ।"

"এমন ফেল-করা জিনিস নিয়ে করবে কী?"

"ওকে প্রথম শ্রেণীতে পাস করাব।"

"তার পরে স্বহস্তে প্রাইজ দেবে নাকি?"

"সর্বনাশ, দিলে জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে।"

কথা ছিল বর-কনের পরস্পর আলাপ জমাবার অবসর দেওয়া চাই, তাই বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে অন্তত আরো দু মাস। কিন্তু সেদিন বাঁশরির অনিমন্ত্রিত প্রবেশ দেখে কন্যাপক্ষ সকলে ভয় পেয়ে গেল। বুঝল যে দুর্গ আক্রমণ শুরু হল। সন্ন্যাসীর গাঁথা দেয়াল যদি কোনো মেয়ে টলাতে পারে, সে একা বাঁশরি।

দিন-পনেরোর মধ্যে বিয়ে স্থির হল। বাইরে বাঁশরির উচ্চহাসি উচ্চতর হতে লাগল, কিন্তু ভিতরে যদি কারো দৃষ্টি পৌঁছত দেখতে পেত পিঁজরের মধ্যে সিংহিনী ঘুরছে ল্যাজ আছড়িয়ে। বেলা দশটা হবে, সোমশংকর বসে আছে বারান্দায়, সামনে মেঝের উপর বসেছে জহরী নানা-প্রকার গয়নার বাক্স খুলে, রেশমি ও পশমি কাপড়ের গাঁঠরি নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করছে কাশ্মীরি দোকানদার, এমন সময় কোনো খবর না দিয়েই এসে উপস্থিত বাঁশরি। বললে, "ঘরে চলো।" দুজনে গেল বৈঠকখানায়। সোফায় বসল সোমশংকর, বাঁশরি বসল পাশেই।

বললে, "ভয় নেই, কান্নাকাটি করতে আসি নি। তা হোক তবু তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার আমাকে দিয়েছ, তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জান কি তুমি, যে সুষমা তোমাকে ভালোবাসে না।"

"জানি।"

"তাতে তোমার কিছুই যায় আসে না।"

"কিছুই না।"

"তা হলে সংসারযাত্রাটা কীরকম হবে?

"সংসারযাত্রার কথা ভাবছি নে।"

"তবে কিসের কথা ভাবছ।"

"ভাবছি একমাত্র সুষমার কথা।"

'অর্থাৎ তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে ও সুখী হবে?"

"সুষমার মতো মেয়ের সুখী হবার জন্যে ভালোবাসার দরকার নেই।"

"কিসের দরকার আছে, টাকার?"

"এটা তোমার যোগ্য কথা হল না বাঁশরি— এটা যদি বলত কলুটোলার ঘোষগিন্নি আশ্চর্য হতুম না।"

"আচ্ছা, ভুল করেছি। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর বাকি আছে। কিসের দরকার আছে সুষমার।"

"জীবনে ও একটা কোন্ লক্ষ্য ধরেছে, সেইটে ওর ধর্ম। সাধ্যমতে আমি যদি কিছু পরিমাণে তাকে সার্থক করতে পারি তা হলেই হল।"

"লক্ষ্যটা কী বোধহয় জান না।"

"জানবার চেষ্টাও করি নি। যদি আপনা হতে ইচ্ছে ক'রে বলে জানতে পাব।"

"অর্থাৎ ওর লক্ষ্য তুমি নও, তোমার লক্ষ্য ওই মেয়ে।"

"তাই বলতে পারি।"

"এ তো পুরুষের মতো শোনাচ্ছে না, ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই।"

"আমার পৌরুষ দিয়ে ওর জীবন সম্পূর্ণ করব, ওর ব্রত সার্থক করব— আর কিছু চাই নে আমি। আমার শক্তিকে ওর প্রয়োজন আছে এই জেনে আমি খুশি। সেই কারণে সকলের মধ্যে আমাকেই ও বেছে নিয়েছে এই আমার গৌরব।"

"এতবড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে ঘোলা করেছে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা।

শুনলুম ভালো হল আমার, শ্রদ্ধা গেল ভেঙে; বন্ধন গেল ছিঁড়ে। শিশুকে মানুষ করার কাজ আমার নয়, সে কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলুম এই মেয়েকে।"

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল মুক্তারাম। পদধূলি নিয়ে তাকে প্রণাম করলে সোমশংকর।

অগ্নিশিখার মতো বাঁশরি দাঁড়াল তার সামনে। বললে, "আজ রাগ করবেন না, ধৈর্য ধরবেন, কিছু বলব, কিছু প্রশ্ন করব।"

"আচ্ছা বলো তুমি।"— মুক্তারামের ইঙ্গিতে সোমশংকর চলে গেল।

"জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরকে শ্রদ্ধা করেন আপনি।"

"বিশেষ শ্রদ্ধা করি।"

"তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন ওর কাঁধে যে ওকে ভালোবাসে না।"

"যে ভার দিয়েছি আমি তাকেই বলি মহদ্‌ভাব। বলি পুরস্কার। একমাত্র সোমশংকর সুষমাকে গ্রহণ করবার যোগ্য।"

"ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি?"

"সুখকে উপেক্ষা করতে পারে ওই বীর মনের আনন্দে।"

"আপনি মানবপ্রকৃতিকে মানেন না?"

"মানবপ্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।"

"এতই যদি হল— বিবাহ ওরা নাই করত।"

"ব্রতের সঙ্গে ব্রতকে প্রাণের বন্ধনে যুক্ত করতে চেয়েছিলুম। খুঁজেছিলুম তেমন দুটি মানুষকে, দৈবাৎ পেয়েছি। এটা একটা সৃষ্টি হল।"

আর কেউ হলে বাঁশরি জিজ্ঞাসা করত— 'আপনি নিজেই করলেন না কেন?' কিন্তু মুক্তারামের চোখের সামনে এ প্রশ্ন বেধে গেল।

বললে, "পুরুষ বলেই বুঝতে পারছেন না, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে সম্পূর্ণ করে মেলানো যায় না।"

"মেয়ে বলেই বুঝতে চাইছ না যে, প্রেমের মিলন ভালোবাসার চেয়ে সত্য, তাতে মোহের মিশেল নেই।"

'সন্ন্যাসী, তুমি জান না মানুষকে। তার হৃদয়গ্রন্থি জোর করে টেনে ছিঁড়ে সেই জায়গায় তোমার নিজের আইডিয়ার গ্রন্থি জুড়ে দিয়ে অসহ্য ব্যথার 'পরে বড়ো বড়ো বিশেষণ চাপা দিতে চাও। গ্রন্থি টিঁকবে না। ব্যথাই যাবে থেকে। মানুষের লোকালয়ে তোমরা এলে কী করতে— যাও-না তোমাদের গুহার গহ্বরে বদরিকাশ্রমে— সেখানে মনের সাধে নিজেদের শুকিয়ে মারতে চাও মারো, আমরা সামান্য মানুষ আমাদের তৃষ্ণার জল মুখের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে এলে কোন্ করুণায়? আমাদের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে? যা তুমি নিজে ভোগ করতে জান না তা তুমি ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে?

"এই যে সুষমা, শোনো বলি, মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেকে, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করে দিনে দিনে মরতে চাও জ্বলে— চাও না তুমি ভালোবাসা। কিন্তু যে চায়, পাষাণ করে নি যে আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলে তার চিরজীবনের সুখ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোমাকে, ঘোড়ায় চড়ো, শিকার করো যাই কর, তুমি পুরুষ নও, আইডিয়ার সঙ্গে গাঁঠছড়া বেঁধে তোমার দিন কাটবে না গো, তোমার রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।"

বাঁশরির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে বাইরে থেকে তাড়াতাড়ি এল সোমশংকর। বললে, "বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।"

"যাব না তো কী। মনে কোরো না বুক ফেটে মরব, জীবন হয়ে থাকবে চির-চিতানলের শ্মশান। কখনো আমার এমন বিচলিত দশা হয় নি— আজ কেন বন্যার মতো এল এই পাগলামি!

লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা— তোমাদের তিনজনের সামনেই এই অপমান। মুছে ফেলব লজ্জা, এর চিহ্ন থাকবে না। চললুম।"

সন্ধেবেলায় কোনো একটা উপলক্ষে সানাই বাজছে সুষমাদের বাড়িতে। বাঁশরি তখন তার একলা বাড়ির কোণের ঘরে বসে পড়ছে একটা খাতা নিয়ে। শেষ হয়ে গেছে পৃথ্বীশের লেখা গল্প। নাম তার, 'ভালোবাসার নীলাম'।

নায়িকা পঙ্কজা কেমন করে অর্থলোভে দিনে দিনে সার চন্দ্রশেখরের মন ভুলিয়ে তাকে আয়ত্ত করলে তার খুব একটা টকটকে ছবি, সুনিপুণ তন্নতন্ন তার বিবরণ। দুই নম্বরের নায়িকা দীপিকা নির্বোধকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, শেষকালে কী অসহ্য ঘৃণা, কী বুকফাটা কান্না। ছুটে বেরোলে আত্মহত্যা করতে, শীতকালে জলে পা দিতে গিয়েই হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে শীত করে উঠল, কিংবা হঠাৎ মনে সংকল্প এল বেঁচে থেকেই শেষ পর্যন্ত ওদের দুজনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। দ্বিধার এই দুটো কারণের মধ্যে কোন্‌টা সত্য সেটা কৌশলে অনিশ্চিত রাখা হয়েছে।

পৃথ্বীশ কখন এক সময় পা টিপে টিপে একটা চেয়ারে এসে বসেছে পিছন দিকে। বাঁশরি জানতে পারে নি। পড়া হয়ে যেতেই বাঁশরি খাতাখানা যখন ধপ করে ফেললে টেবিলের উপর— পৃথ্বীশ সামনে এসে বললে, "কেমন লাগল। মেলোড্রামার খাদ মিশোই নি এক তোলাও। সেন্টিমেন্টালিটির তরল রস চায় যারা তাদের পক্ষে নির্জলা একাদশী; একেবারে নিষ্ঠুর সত্য।"

বাঁশরি বললে, "কেমন লাগল? এই দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলে পাতাগুলো ছিঁড়তে লাগল একটার পর একটা। পৃথ্বীশ বললে, "করলে কী? আমার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লেখা নষ্ট করলে, তা জান।"

"কী দাম চাই?"

"তোমাকে।"

"আমাকে? নিতে সাহস আছে তোমার?"

"আছে।"

"সেন্টিমেন্ট এক ফোঁটাও থাকবে না।"

"নেই রইল।"

"নির্জলা একাদশী, নিষ্ঠুর সত্য।"

"রাজি আছি।"

"আচ্ছা, রাজি? দেখো, নভেল লেখা নয়, সত্যিকার সংসার।"

"শিশু নই আমি, এ কথা বুঝি।"

"না মশায়, কিছু বোঝ না। বুঝতে হবে দিনে-দিনে পলে-পলে, বুঝতে হবে হাড়ে-হাড়ে।"

"সেই হবে আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা। আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না কিছুতেই।"

"সত্যি কথা বলি। এত দিন তোমাকে কাছে কাছেই দেখলুম, বুদ্ধি তোমার পাকে নি, তাই কেবলই ধার ক'রে ক'রে কাজ চালাও। মেয়েদের সম্বন্ধে বইপড়া কথা অনেক শুনেছি তোমার মুখে। একটা কথা শুনে রাখো, যারা অবুঝ তাদের উপর মেয়েদের খুব একটা টান আছে, যেমন মমতা রোগাদের 'পরে। ওদের ভার পেলে মেয়েদের বেকার দশা ঘোচে। তোমার উপর আমার সত্যিকার স্নেহ জন্মেছে। এতদিন তোমাকে বাঁচিয়ে এসেছি তোমার নিজের নির্বুদ্ধিতা আর বাইরের বিরুদ্ধতা থেকে। সেইজন্যে যে সর্বনেশে প্রস্তাব এইমাত্র করলে সেটাতে সম্মতি দিতে আমার দয়া হচ্ছে।"

"সম্মতি যদি না দাও তা হলে যে নির্দয়তা হবে তার তুলনা নেই।"

"মেলোড্রামা?"

"না, মেলোড্রামা নয়।"

"আজ না হোক কাল মেলোড্রামা হয়ে উঠবে না?"

"যদি কোনোদিন হয়ে ওঠে তবে ওই খাতার মতো দিনগুলোকে নিজের হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো।"

বাঁশরি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আচ্ছা দিলেম সম্মতি।"

পৃথ্বীশ ওর দিকে লাফ দিয়ে এল। বাঁশরি পিছু হঠে গিয়ে বললে, "এখনি শুরু হল! এখনো ভালো করে ভেবে দেখো— পিছোবার সময় আছে।"

পৃথ্বীশ হাত জোড় করে বললে, "মাপ করো আমাকে। ভয় হচ্ছে পাছে তোমার মত বদলায়।"

"বদলাবে না। অমন করে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো না। যাও রেজিস্ট্রারের আপিসে। যত শীঘ্র পার বিয়ে হওয়া চাই। নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপতে দিয়ো আজই।"

"অনুষ্ঠান কিছু হবে না?"

"কিছু না, একেবারে নির্জলা একাদশী।"

"কাউকে নিমন্ত্রণ?"

"কাউকে না।"

"কাউকেই না?"

"আচ্ছা, সোমশংকরকে। আর-একটা কথা বলি, গল্পটার কপি নিশ্চয় আছে তোমার ডেস্কে, সেটা পুড়িয়ে ফেলো, নইলে শান্তি পাবে না আমার হাতে।"

পরের দিন সোমশংকর এল। বাঁশি বললে, "তুমি যে।"

"নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। জানি অন্য পক্ষ থেকে তোমাকে নিমন্ত্রণ করবে না। কিন্তু আমার দিক থেকে কোনো সংকোচ নেই।"

"কেন নেই?"

"একদিন আমি তোমাকে যা দিয়েছি আর তুমি আমাকে যা দিয়েছ এ বিবাহে তাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করবে না তা তুমি জান।"

"তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন?"

"সে কথা বুঝতে যদি নাও পার, তবু আমার উপর দয়া কোরো।"

"নাই-বা বুঝলুম, তুমি বলো।"

"সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যে ব্রত নিয়েছি বোঝাতে পারব না সে, আমার ভালোবাসার চেয়ে বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে বাঁচি আর মরি।"

"আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন হতে পারত না?"

"যদি পারত তবে বাধা ঘটত না। তুমি নিজেকে ভুল বোঝাও না, তাই জানি, তুমি নিশ্চিত জানো তোমার ভালোবাসা টলিয়ে দিল আমাকে আমার কেন্দ্র থেকে। তোমার কাছে আমি দুর্বল। যে দুঃসাধ্য কর্মে সুষমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আমাকে মিলিয়েছেন, সেখানে আমাদের বিচলিত হবার অবকাশ নেই। সেখানে ভালোবাসার প্রবেশপথ বন্ধ।"

অশ্রু গোপন করার জন্যে চোখ নিচু করে বাঁশরি বললে, "এখনো সম্পূর্ণ করে বলো নি, কেন এলে আজ আমার এখানে?"

"আমার ভালোবাসার কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

ডুব সাঁতার দিয়ে জল থেকে তুলে এনেছিল, সেই কণ্ঠী, সেই ব্রেসলেট, সেই ব্রোচ। ধরলে

বাঁশরির সামনে। বাঁশরি বললে, "মনে করেছিলাম হারিয়েছে, ফিরে পেয়ে আরো বেশি করে পেলুম। নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমাকে।"

সোমশংকর একে-একে গয়নাগুলি পরিয়ে দিলে যত্ন করে। বাঁশরি বললে, "শক্ত আমার প্রাণ, তোমার কাছেও কোনো দিন কেঁদেছি ব'লে মনে পড়ে না। আজকে যদি কাঁদি কিছু মনে কোরো না।" এই ব'লে মাথা রাখল সোমশংকরের বুকের উপর।

বিবাহের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা। সুষমাদের যে-ঘরে বিবাহ-সভা বসবে, যেখানে আসন পড়বে বর-কনের, সেখান থেকে সমস্ত লোকজন সরিয়ে দিয়ে, সুষমা একলা বসে মেঝের উপর একটা পদ্মফুলের আলপনা এঁকেছে। থালায় আছে নানা জাতের ফুল ফল, ধূপ জ্বলছে, ইলেকট্রিক আলো নিবিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। ঘরের দ্বারের কাছে সুষমা বসে আছে চুপ করে। মুক্তারামকে ডেকে পাঠিয়েছে। এখনি সে আসবে।

এল মুক্তারাম। সুষমা অনেকক্ষণ তার পায়ের উপর মাথা দিয়ে রইল পড়ে। তার পর সেই আলপনা-কাটা জায়গায় আসন পেতে বসালে তাকে। বললে, "প্রভু দুর্বল আমি, মনের গোপনে যদি পাপ থাকে আজ সমস্ত ধুয়ে দাও। আমার সমস্ত আসক্তি দূর হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী। আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টির সামনে তোমার চরণস্পর্শে আমার নতুন জীবন আরম্ভ হোক। কাল থেকে তোমার ব্রতের পথে যাত্রা করে চলব শেষ দিন পর্যন্ত।"

মুক্তারাম উঠে দাঁড়ালে। কোনো কথা না বলে ডান হাতে স্পর্শ করলে সুষমার মাথা। সুষমা থালা থেকে ফুলগুলি নিয়ে মুক্তারামের দুই পা ঢেকে দিলে।

### পরিশিষ্ট

পৃথ্বীশ একখানা চিঠি পেলে। চলে গেল সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ডেরাদুনে, একটা নিষ্ঠুর গল্প লেখবার জন্য। সকলের চেয়ে কালিমা লেপনে পূজনীয়ের চরিত্রে। এই তার প্রতিশোধ, তার সান্ত্বনা। পাঠকেরা বুঝল কাদের লক্ষ্য করে লেখা, উপভোগ করলে কুৎসা, বললে এইটে নবযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। একজন ভক্ত যখন লেখাটা মুক্তারামকে দেখালে, মুক্তারাম বললে— "লেখকের শক্তি আছে রচনার।"

# গল্প

## [ প্রায়শ্চিত্ত ]

মণীন্দ্র ছেলেটির বয়স হবে চোদ্দ। তার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ কিন্তু পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগ নেই। তবু সে স্বভাবতই মেধাবী বলে বৎসরে বৎসরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু অধ্যাপকেরা তার কাছে যতটা প্রত্যাশা করেন সে-অনুরূপ ফল হয় না। মণীন্দ্রের পিতা দিব্যেন্দু ছিলেন এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কর্তব্যে ছেলের শৈথিল্য দেখে তাঁর মন উদ্‌বিগ্ন ছিল।

অক্ষয় মণীন্দ্রের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সে বড়ো দরিদ্র। ছাত্রবৃত্তির 'পরেই তার নির্ভর। মা বিধবা। বহু কষ্টে অক্ষয়কে মানুষ করেছেন। তার পিতা প্রিয়নাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন যথেষ্ট উপার্জন করতেন। লোকের কাছে তাঁর সম্মানও ছিল খুব বেশি। কিন্তু ব্যয় করতেও তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল যত তাঁর ঋণ, সম্পত্তি তার অর্ধেকও নয়। অক্ষয়ের মা সাবিত্রী তাঁর যত কিছু অলংকার, গাড়ি ঘোড়া বাড়ি গৃহসজ্জা প্রভৃতি সমস্ত বিক্রয় করে ক্রমে ক্রমে স্বামীর ঋণ শোধ করেছেন।

সাবিত্রী অনেকপ্রকার শিল্প জানতেন। কাপড়ের উপর রেশম ও জরির কারুকার্যে তাঁর নৈপুণ্য ছিল। দরজিরা তাঁর কাছে কাপড় রেখে যেত, তিনি ফুল কেটে পাড় বসিয়ে তার মূল্য পেতেন। তা ছাড়া তাঁর মোজা-বোনা কল ছিল, তিনি পশমের মোজা গেঞ্জি প্রস্তুত করে দোকানে বিক্রয়ের জন্যে পাঠাতেন। এই নিয়ে তাঁকে নিরন্তর পরিশ্রম করতে হত। এক-একদিন রাত্রি জেগে কাজ করতেন, নিদ্রার অবকাশ পেতেন না।

সাবিত্রীর স্বামীর এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর নাম সঞ্জয় মৈত্র। একসময়ে ব্যবসায়ে যখন তাঁর সর্বনাশ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন প্রিয়নাথ নিজের দায়িত্বে অনেকটাকার ঋণ সংগ্রহ করে তাঁকে রক্ষা করেন। সঞ্জয় সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা কখনো বিস্মৃত হন নি। প্রিয়নাথের মৃত্যুর পরে তিনি বারংবার সাবিত্রীকে অর্থসাহায্যের প্রস্তাব করেছিলেন। সাবিত্রী কিছুতেই ভিক্ষা নিতে স্বীকার করেন নি। তা ছাড়া তাঁর প্রতিজ্ঞা অর্ধাশনে থাকবেন তবু কখনো ঋণ করবেন না।

সঞ্জয়ের পুত্রের উপনয়নে একদিন তাঁর বাড়িতে সাবিত্রীর নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর বেশভূষা নিতান্ত সামান্য ছিল; এক থার্ড ক্লাসের গাড়ি ভাড়া করে অক্ষয়কে নিয়ে যখন তিনি এলেন দ্বারের লোকেরা কেউ তাঁদের লক্ষ করলে না।

আজ সাবিত্রীর সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা চাই। দরজিকে কথা দিয়েছে বিকেল তিনটের মধ্যে একটা জামার কাজ শেষ করে তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

অন্তঃপুরে সঞ্জয়ের স্ত্রী নৃত্যকালীকে গিয়ে বললেন, "আজ আমাদের দুজনকে সকাল-সকাল খাইয়ে বিদায় করে দাও।"

নৃত্যকালীর ধনের অহংকার বড়ো তীব্র, তিনি সাবিত্রীর অনুরোধ গ্রাহ্যই করলেন না। ধনীঘরের কুটুম্বদের আহারের ব্যবস্থা করতে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সাবিত্রীকে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবার তিনি উপযুক্ত মনে করেন নি।

সাবিত্রী বাড়ির উজ্জ্বলা দাসীকে অনুনয় করে বললেন, "কাউকে আমার জন্যে একখানা থার্ডক্লাস গাড়ি ডেকে দিতে বলে দাও, এখনি বাড়ি যাওয়া আমার বড়ো প্রয়োজন।"

উজ্জ্বলা বললে, "আচ্ছা, দেখছি।" ব'লে চলে গেল। কিছুই করলে না।

অক্ষয়ের বয়স তখন খুব অল্প ছিল। সে বললে, "মা, আমি গাড়ি ডেকে আনছি।"

সাবিত্রী তাকে নিষেধ করে মুখের উপর ঘোমটা টেনে পথে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে কিছু মুড়ি ছিল তাই গুড় দিয়ে মেখে অক্ষয়কে খাওয়ালেন। নিজে কিছুই খেলেন না। অক্ষয় সেইদিন প্রথম

তার মায়ের চোখে জল দেখেছিল। সে কথা কোনোদিন সে ভুলতে পারে নি। সেদিন থেকে তার মনে এই প্রতিজ্ঞা ছিল, যে, বড়ো হয়ে সে তার মায়ের দুঃখ এবং অসম্মান দূর করবে। দিন রাত্রি একমনে সে পড়া করে, আর বৎসরে-বৎসরে পরীক্ষায় সে পুরস্কার পায়।

ক্লাসে অক্ষয় ছিল সবপ্রথম। মণীন্দ্রের বুদ্ধি তার চেয়ে বেশি ছিল কিন্তু পরীক্ষায় কোনোদিন তাকে অতিক্রম করতে পারে নি।

এ বৎসর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হল। মণীন্দ্র অন্যসকল বিষয়েই ভালো উত্তর দিয়েছিল, কেবল অঙ্কের প্রশ্ন তার কঠিন ঠেকল।

অক্ষয় তার সঙ্গে এক জায়গাতেই পরীক্ষা দিতে বসেছে। একটার সময় জলখাবারের আধঘণ্টা ছুটি ছিল। অক্ষয় দ্রুত পরীক্ষার উত্তর লেখা শেষ করে একটার কিছু আগেই বেরিয়ে গেল। ডেস্কের উপর ছিল তার কাগজগুলি। মণীন্দ্র তার থেকে দুখানা কাগজ চুরি করে নিয়ে চলে গেল, কেউ জানতে পারল না।

এবার অক্ষয়ের পরীক্ষার ফল ভালো হল না। সে বৃত্তি পাবে নিশ্চিত আশা করে ছিল কিন্তু যখন পেল না তখন সকলেই বিস্মিত হল। এবার মণীন্দ্র পেলে পুরস্কার। তার পিতা দিব্যেন্দু সকলের চেয়ে আশ্চর্য হলেন। কেন যে এমন হল তার কারণ বুঝতে পারলেন না।

হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলেন। মণীন্দ্রের পড়বার ঘরে তার দেরাজের মধ্যে অক্ষয়ের হাতের লেখা দুখানা পরীক্ষার পত্র দিব্যেন্দুর হাতে পড়ল। মণীন্দ্র তার দুষ্কর্মের কথা স্বীকার করলে।

বিদ্যালয়ে প্রাইজ দেবার দিন উপস্থিত হল। প্রথম প্রাইজের জন্যে মণীন্দ্রের ডাক পড়ল। সে প্রাইজ হাতে নিয়ে বললে, "এ আমার প্রাপ্য নয়—এ প্রাইজের [ অধিকার ] অক্ষয়ের। আমি অপরাধ করেছি।"

বাড়ি এসে দিব্যেন্দু মণীন্দ্রকে বললেন—"যে-অপরাধ করেছ তার দণ্ড তোমার শোধ হয় নি। মণীন্দ্রের [ অক্ষয়ের ] ছাত্রবৃত্তি মাসিক পনেরো টাকা নিজে থেকে তোমার দেওয়া চাই।"

মণীন্দ্র ভেবে পেল না কী উপায়ে সে দিতে পারে। দিব্যেন্দু বললেন, "এক বৎসর তোমাকে পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতে হবে। গাড়িঘোড়ার যে খরচ প্রতি মাসে লাগে তারি থেকে অক্ষয়ের বৃত্তির টাকা শোধ হতে পারবে।"

[১৩২৪]

# গ্রন্থপরিচয়

# কবিতা

রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ সংস্করণের) পূর্ব প্রকাশিত বিভিন্ন খণ্ডে ব্যক্তিপ্রসঙ্গমূলক যে-সকল কবিতা মুদ্রিত, এখানে সেগুলির একটি সূচী দেওয়া হইল। অনেক রচনায় স্পষ্টভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম না থাকিলেও অনুষঙ্গ বিচারে এবং পূর্ববর্তী গবেষকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া রচনার পাশে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ পাঠকবর্গের সুবিধার্থে প্রদত্ত হইল।

বর্তমান খণ্ডের 'স্ফুলিঙ্গ' অংশে যে-সকল ক্ষুদ্রায়তন কবিতা সংকলিত হইয়াছে, অনুরূপ কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) চতুর্দশ ও ষোড়শ খণ্ডে 'স্ফুলিঙ্গ' শিরোনামে মুদ্রিত, ব্যক্তিপ্রসঙ্গমূলক কোনো কোনো কবিতা সেখানেও পাওয়া যাইবে।

| রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) | | শিরোনাম | উদ্দিষ্ট ব্যক্তি |
|---|---|---|---|
| প্রথম খণ্ড। | সন্ধ্যাসংগীত (১২৮৮) | উপহার | কাদম্বরী দেবী |
| | বউ-ঠাকুরানীর হাট (১২৮৯) | উপহার : | |
| | | প্রবেশক কবিতা | সৌদামিনী দেবী |
| প্রথম খণ্ড। | কড়ি ও কোমল (১২৯৩)। | পত্র | প্রিয়নাথ সেন |
| | | মঙ্গলগীত ১, ২, ৩ | ইন্দিরা দেবী |
| | | পুরাতন | কাদম্বরী দেবী |
| | | নূতন | কাদম্বরী দেবী |
| | | কোথায় | কাদম্বরী দেবী |
| | | শান্তি | কাদম্বরী দেবী |
| | মানসী (১২৯৭)। | উপহার : | |
| | | প্রবেশক কবিতা | মৃণালিনী দেবী |
| | | পত্র | শ্রীশচন্দ্র মজুমদার |
| | | শ্রাবণের পত্র | শ্রীশচন্দ্র মজুমদার |
| | | পত্রের প্রত্যাশা | শ্রীশচন্দ্র মজুমদার |
| | বিসর্জন (১২৯৭)। | উৎসর্গ : | |
| | | প্রবেশক কবিতা | সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| দ্বিতীয় খণ্ড। | চিত্রা (১৩০২) | স্নেহস্মৃতি | কাদম্বরী দেবী |
| তৃতীয় খণ্ড। | চৈতালি (১৩০৩) | নদীযাত্রা | অভিজ্ঞা দেবী |
| | | মৃত্যুমাধুরী | অভিজ্ঞা দেবী |
| | | স্মৃতি | অভিজ্ঞা দেবী |
| | | বিলয় | অভিজ্ঞা দেবী |
| চতুর্থ খণ্ড। | কথা (১৩০৬) | উৎসর্গ-কবিতা | জগদীশচন্দ্র বসু |
| | কল্পনা (১৩০৭) | জগদীশচন্দ্র বসু | জগদীশচন্দ্র বসু |
| | ক্ষণিকা (১৩০৭) | উৎসর্গ : | |
| | | প্রবেশক কবিতা | লোকেন্দ্রনাথ পালিত |
| চতুর্থ খণ্ড। | নৈবেদ্য (১৩০৮) | ১৬-সংখ্যক কবিতা | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| | | স্মরণ (১৩১০) | মৃণালিনী দেবী |

| | রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) | শিরোনাম | উদ্দিষ্ট ব্যক্তি |
|---|---|---|---|
| পঞ্চম খণ্ড। | উৎসর্গ (১৩২১) | "উৎসর্গের বহু কবিতার (সংখ্যা ৩১, ৩৪, ৩৯-৪৪) যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্যের ধারণা হইবে ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ তারিখে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর অকাল তিরোধানের কথা মনে রাখিলে। ফলত একমাত্র স্মরণ কাব্যেই প্রিয়জনের উদ্দেশে কবির স্মৃতিতর্পণ নিঃশেষ হয় নাই— উৎসর্গেও তাহার অনুবৃত্তি দেখা যায়।" —গ্রন্থপরিচয়, স্বতন্ত্র 'উৎসর্গ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ সংস্করণ। | |
| | | ৩০-সংখ্যক কবিতা | জগদীশচন্দ্র বসু |
| | | সংযোজন, ৮-সংখ্যক কবিতা | নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| | খেয়া (১৩১৩) | উৎসর্গ : | |
| | | প্রবেশক কবিতা | জগদীশচন্দ্র বসু |
| ষষ্ঠ খণ্ড। | গীতালি (১৩২১) | আশীর্বাদ : | রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও |
| | | প্রবেশক কবিতা | প্রতিমা দেবী |
| ষষ্ঠ খণ্ড। | বলাকা (১৩২৩) | উৎসর্গ : | |
| | | প্রবেশক কবিতা | উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন |
| | | ৭-সংখ্যক কবিতা | সাজাহান |
| | | ৩৯-সংখ্যক কবিতা | উইলিয়ম শেক্সপীয়র |
| সপ্তম খণ্ড। | পলাতকা (১৩২৫) | শেষ প্রতিষ্ঠা | মাধুরীলতা দেবী |
| | শিশু ভোলানাথ (১৩২৯) | বুড়ি | নন্দিতা দেবী |
| সপ্তম খণ্ড। | পূরবী (১৩৩২) | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত |
| | | শিলঙের চিঠি | শোভনা দেবী ও নলিনী দেবী |
| | | অতিথি | ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো |
| | | চিঠি | দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| | | তৃতীয়া | নন্দিনী দেবী |
| | | বিরহিনী | নন্দিনী দেবী |
| অষ্টম খণ্ড। | বনবাণী (১৩৩৮) | জগদীশচন্দ্র বসু | |
| | | প্রিয়করকমলে | জগদীশচন্দ্র বসু |
| | | শাল | সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত। |
| | | কুটিরবাসী | তেজেশচন্দ্র সেন |
| | পরিশেষ (১৩৩৯) | আশীর্বাদ : | |
| | | প্রবেশক কবিতা | অতুলপ্রসাদ সেন |
| | | আশীর্বাদ | দিলীপকুমার রায় |
| | | আশীর্বাদী | অমলিনা দেবী |

| রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) | | শিরোনাম | উদ্দিষ্ট ব্যক্তি |
|---|---|---|---|
| | | পরিণয় | সুরমা কর ও সুরেন্দ্রনাথ কর |
| | | শূন্যঘর | প্রশান্তচন্দ্র-নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | পথসঙ্গী | কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় |
| | | আশ্রমবালিকা | মমতা সেন |
| | | বধূ | অমিতা সেন |
| | | মিলন | ইন্দিরা মৈত্র |
| | | বুদ্ধদেবের প্রতি | গৌতম বুদ্ধ |
| | | আশীর্বাদ | লীলা দেবী |
| | | আশীর্বাদ | কল্পনা দেবী |
| | | বুদ্ধজন্মোৎসব | গৌতম বুদ্ধ |
| | | পরিণয়মঙ্গল | হৈমন্তী দেবী ও অমিয় চক্রবর্তী |
| | | আশীর্বাদী | যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী |
| | | আশীর্বাদ | চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |
| | | আশীর্বাদ ১, ২ | দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| | | উত্তিষ্ঠত নিবোধত | রমা দেবী |
| | | অতুলপ্রসাদ সেন | অতুলপ্রসাদ সেন |
| অষ্টম খণ্ড। | পুনশ্চ (১৩৩৯) | বাসা | প্রতিমা দেবী |
| | | সুন্দর | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | বিচ্ছেদ | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | নাটক | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | পত্র | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | ফাঁক | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | উল্লিখিত সকল কবিতাই পত্রের কাব্যরূপ। ‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়াছে। | |
| নবম খণ্ড। | শেষ সপ্তক (১৩৪২) | পনেরো-সংখ্যক কবিতা | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | ষোলো | সুধীন্দ্রনাথ দত্ত |
| | | সতেরো | ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় |
| | | আঠারো | চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য |
| | | বিয়াল্লিশ | চারুচন্দ্র দত্ত |
| | | তেতাল্লিশ | অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী |
| | | পঁয়তাল্লিশ | প্রমথনাথ চৌধুরী |
| | বিচিত্রিতা (১৩৪০) | আশীর্বাদ | নন্দলাল বসু |
| দশম খণ্ড। | বীথিকা (১৩৪২) | নুটু | রমা মজুমদার/কর |
| দশম খণ্ড। | পত্রপুট (১৩৪৩) | প্রবেশক কবিতা | কৃষ্ণ কৃপালনী ও নন্দিতা কৃপালনী |
| | | ‘দুই’-সংখ্যক কবিতা | কালিদাস নাগ |

| রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) | শিরোনাম | উদ্দিষ্ট ব্যক্তি |
|---|---|---|
| শ্যামলী (১৩৪৩) | উৎসর্গ-কবিতা | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে সংকলিত কবিতা 'ধরণী বিদায়বেলা আজ' সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশে রচিত কবিতা। | |
| একাদশ খণ্ড। খাপছাড়া (১৩৪৩) | উৎসর্গ-কবিতা | রাজশেখর বসু |
| | ছবি-আঁকিয়ে | নন্দলাল বসু |
| একাদশ খণ্ড। সেঁজুতি (১৩৪৫) | উৎসর্গ | নীলরতন সরকার |
| | পত্রোত্তর | সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত |
| | গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর | গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| দ্বাদশ খণ্ড। প্রহাসিনী (১৩৪৫) | আধুনিকা | অপরাজিতা[রাধারানী] দেবী |
| | পরিণয়মঙ্গল | জয়শ্রী দেবী ও কুলপ্রসাদ সেনগুপ্ত |
| | ভাইদ্বিতীয়া | পারুল দেবী |
| | অপাক-বিপাক | প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ |
| | নারীপ্রগতি | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | গরঠিকানি | অপরাজিতা[রাধারানী] দেবী |
| | অপিচ দ্রষ্টব্য, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে সংকলিত 'পত্রদূতী' কবিতা। | |
| | পলাতকা | নন্দিতা দেবী |
| | কাপুরুষ | নির্মলকুমারী ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ |
| | অটোগ্রাফ | অভিজিৎ চন্দ |
| | সংযোজন অংশে সংকলিত | |
| | নাসিক হইতে খুড়ার পত্র | সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে |
| | পত্র | অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী |
| | নাতবউ | তনুজা গঙ্গোপাধ্যায় |
| | মিষ্টান্বিতা | পারুল দেবী |
| | মধুসন্ধায়ী ১, ২, ৩, ৪ | মৈত্রেয়ী দেবী |
| | অপিচ দ্রষ্টব্য, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে সংকলিত 'বিবিধ জাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া' কবিতা। | |
| | তুমি | সুধীরচন্দ্র কর |
| আকাশপ্রদীপ (১৩৪৬) | বধূ | কাদম্বরী দেবী |
| | শ্যামা | কাদম্বরী দেবী |
| দ্বাদশ খণ্ড। নবজাতক (১৩৪৭) | মৌলানা জিয়াউদ্দীন | মৌলানা জিয়াউদ্দীন |
| | অবর্জিত | প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ |

| | রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) | শিরোনাম | উদ্দিষ্ট ব্যক্তি |
|---|---|---|---|
| | সানাই (১৩৪৭) | সার্থকতা | মৈত্রেয়ী দেবী |
| ত্রয়োদশ খণ্ড। | রোগশয্যায় (১৩৪৭) | প্রবেশক কবিতা | নন্দিতা কৃপালনী ও অমিতা ঠাকুর |
| | আরোগ্য (১৩৪৭) | প্রবেশক কবিতা | সুরেন্দ্রনাথ কর |
| | | ১৯-সংখ্যক কবিতা | নন্দিতা কৃপালনী |
| | | ২০-সংখ্যক কবিতা | বিশ্বরূপ বসু |
| | | ২২-সংখ্যক কবিতা | মৈত্রেয়ী দেবী |
| | | ২৩-সংখ্যক কবিতা | রানী চন্দ |
| | জন্মদিনে (১৩৪৮) | ৮-সংখ্যক কবিতা | সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| | | ১৫-সংখ্যক কবিতা | মৈত্রেয়ী দেবী |
| ত্রয়োদশ খণ্ড। | শেষ লেখা (১৩৪৮) | ৮-সংখ্যক কবিতা | নন্দিতা কৃপালনী |
| | | ১২-সংখ্যক কবিতা | নন্দিতা কৃপালনী |
| | সে (১৩৪৪) | উৎসর্গ-কবিতা | চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য |
| | গল্পসল্প (১৩৪৮) | প্রবেশক কবিতা | নন্দিতা কৃপালনী |

চর্তুদশ খণ্ড। 'স্ফুলিঙ্গ' (১৩৫২) কাব্যধৃত অনেক কবিতা বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে/অনুরোধে তাঁহাদের নামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখসহ রচিত। ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে রচিত কবিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ৪০-সংখ্যক কবিতার (দৌহিত্রী নন্দিতার উদ্দেশে) উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বতন্ত্র 'স্ফুলিঙ্গ' গ্রন্থে এই-সকল কবিতার কোনো-কোনোটির সূত্র দেওয়া হইয়াছে।

| | রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) | শিরোনাম | উদ্দিষ্ট ব্যক্তি |
|---|---|---|---|
| | মহাত্মা গান্ধী (১৩৫৪) | 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ 'গান্ধী মহারাজ' কবিতা সংকলিত। | |
| | খৃষ্ট (১৩৬৬) | 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে যিশু খৃষ্ট-এর উদ্দেশে রচিত 'বড়োদিন' ও একটি অনুবাদ 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে' সংকলিত। | |
| ষোড়শ খণ্ড। | পূরবী (সংযোজন) | শিবাজি উৎসব | |
| | বীথিকা (সংযোজন) | যুগলপাখি | নির্মলকুমারী ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ |
| | | জন্মদিনে | নির্মলকুমারী মহলানবিশ |
| | | পুপুদিদির জন্মদিনে | নন্দিনী দেবী |
| | প্রহাসিনী (সংযোজন) | সালগম সংবাদ/ নাতিনীর জবাব | শান্তা গঙ্গোপাধ্যায় |
| | | এপ্রিলের ফুল | নলিনী দেবী |
| | | তোমার বাড়ি | নন্দিতা কৃপালনী |
| | | হ্যারাম | নন্দিতা কৃপালনী |
| | | বেঁটে ছাতাওয়ালি | নন্দিতা কৃপালনী |
| | | দিদিমণি | নন্দিনী দেবী |
| | স্ফুলিঙ্গ | বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত কোনো কোনো কবিতার সূত্র গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হইয়াছে। | |

| রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) | শিরোনাম | উদ্দিষ্ট ব্যক্তি |
|---|---|---|
| সপ্তদশ খণ্ড। | আকুল আহ্বান | কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে বলিয়া অনুমিত। |
| | উপহার-গীতি | কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে বলিয়া অনুমিত। |
| সপ্তদশ খণ্ড। প্রভাত সংগীত (সংযোজন) | উৎসর্গ-কবিতা : স্নেহ উপহার | ইন্দিরা দেবী |
| কড়ি ও কোমল (সংযোজন) | পত্র | ইন্দিরা দেবী |
| | পত্র | ইন্দিরা দেবী |
| | জন্মতিথির উপহার / একটি কাঠের বাক্স | ইন্দিরা দেবী |
| | চিঠি | ইন্দিরা দেবী |

—

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে কোনো কোনো রচনার শিরোনাম সংকলনকালে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে শিরোনামের পূর্বে বিন্দুচিহ্ন, প্রদত্ত-শিরোনামের সূচক; অনুরূপভাবে গ্রন্থপরিচয় অংশেও এই রীতি অনুসৃত।

বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত কবিতাবলি বর্তমান রচনাবলীর প্রথমাংশে সংকলিত হইয়াছে। সেগুলির প্রকাশসূচী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নরূপ—

| | | |
|---|---|---|
| ১ | • জগদীশচন্দ্র বসু | মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ |
| ২ | • জগদীশচন্দ্র বসু | প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৪ |
| ৩ | নমস্কার | বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৪ |
| ৪ | • নন্দলাল বসু | প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ |
| ৫ | • নন্দলাল বসু | প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮ |
| ৬ | চার্লস অ্যান্ড্রুজের প্রতি | তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮৭৬ শক। ১৩২১ বঙ্গাব্দ |
| ৭ | • প্রফুল্লচন্দ্র রায় | আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩২ |
| ৮ | • রামমোহন রায় | *The Students' Rammohun Centenary Volume,* Calcutta 1934 |
| ৯ | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন | [আষাঢ় ১৩৩২] |
| ১০ | • চিত্তরঞ্জন দাশ | আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ আষাঢ় ১৩৪২ |
| ১১ | • আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ আষাঢ় ১৩৪২ |
| ১২ | • আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ |
| ১৩ | পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা | প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২ |
| ১৪ | • ব্রজেন্দ্রনাথ শীল | আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ পৌষ ১৩৪২ |
| ১৫ | পরমহংস রামকৃষ্ণদেব | প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২ |
| ১৬ | • বিধুশেখর ভট্টাচার্য | প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২ |
| ১৭ | শরৎচন্দ্র | ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৪ |
| ১৮ | হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় | প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৪ |
| ১৯ | বঙ্কিমচন্দ্র | শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৫ |
| ২০ | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫ |
| ২১ | জলধর | ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ |

২২ কল্যাণীয় রথীন্দ্রনাথ — অনুষ্ঠানপত্রী [১৩৪৫]
২৩ • কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮

১. 'সম্বর্ধনা-সঙ্গীত' : জয় হোক তব জয়। রচনাকাল, মাঘ ১৩০৯। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জগদীশচন্দ্র বসুর (১৮৫৮-১৯৩৭) বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতায় 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' তাঁহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে 'সারস্বত সম্মিলন'-এর আয়োজন করেন (১৯ মাঘ ১৩০৯। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩)। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -লিখিত 'সঙ্গীত সমাজ' প্রবন্ধ। প্রকাশ, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ের পরিশিষ্ট ১ অংশে প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্যাবলি সংকলিত হইয়াছে।

২. 'সত্যের মন্দিরে তুমি'। রচনাকাল অপরিজ্ঞাত। অনুমান করা যাইতে পারে যে, জগদীশচন্দ্র যখন বিলাতে গবেষণারত ছিলেন (১৯০০-০২) ওই সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি রচনা করিয়া তাঁহার কাছে প্রেরণ করেন।

৩. 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২-১৯৫০) সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ উপলক্ষে ইংরাজ সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক মামলা আরম্ভ করায় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা রচনা করিয়া অরবিন্দর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রচনাকাল ৭ ভাদ্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। কামাখ্যাকান্ত রায় তাঁহার 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' স্মৃতিকথায় (প্রকাশ : 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ৩৫, ২২শে শ্রাবণ ১৪০৬) লিখিয়াছেন, "বোধহয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে একদিন গুরুদেব দেহলি থেকে প্রত্যুষে আমাদের ক্লাসে এলেন একখানা চিঠি হাতে ক'রে। পিছনে একটি দারোয়ান প্রতীক্ষা করছিল। এসেই তিনি বললেন : 'একটি কবিতা তোমাদের শোনাচ্ছি, এটি সকালের ডাকেই পাঠিয়ে দেব।'— এই বলে তিনি 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার' কবিতাটি পড়ে শোনালেন। সে স্বর এখনও আমার কানে বাজছে। কী আবেগ, কী গাম্ভীর্য! চিঠিটি দারোয়ান মারফত বোলপুর পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাদের পড়াতে শুরু করলেন।"

৪. নন্দলাল বসুর (১৮৮৩-১৯৬৬) শান্তিনিকেতনে প্রথম আগমন উপলক্ষে রচিত। রচনাকাল ১২ বৈশাখ, ১৩২১। 'প্রবাসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সম্পাদক লেখেন—"নন্দলাল বসুর অভিনন্দন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে। ছুটির পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রকে লইয়া অচলায়তন নাটকের চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে বিদ্যালয়ের অনেক বন্ধু বোলপুর গিয়াছিলেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তাঁহাদের মধ্যে একজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মতো গুণী ব্যক্তিকে আশ্রমে পাইয়া তাঁহার যথোচিত আদর করেন।"

৫. নন্দলাল বসুর জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের শেষ আশীর্বাদ। রচনাকাল ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০। সুধীরচন্দ্র কর তাঁহার 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা' (আশ্বিন ১৩৬০) গ্রন্থে কবিতাটি সংকলন করিয়েছেন। নন্দলাল বসুর পারলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পুস্তিকায় (১৫ বৈশাখ ১৩৭৩) কবিতাটি 'রূপকার' নামে সংকলিত হইয়াছে।

৬. চার্লস ফ্রিয়র অ্যান্ডরুজের (১৮৭১-১৯৪০) শান্তিনিকেতনে আগমন (১৯ এপ্রিল ১৯১৪) উপলক্ষে লিখিত। শান্তিনিকেতন হইতে তৎকালে প্রকাশিত 'আশ্রম-সংবাদ'-এ প্রকাশিত সংবাদ নিম্নরূপ—

"শ্রীযুক্ত সি. এফ. এন্ড্রুস্ বিগত ৬ই বৈশাখ সন্ধ্যায় ইংলন্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

তাঁহার আগমন উপলক্ষে পূজনীয় আচার্য্যদেব একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আশ্রমের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলে তাঁহাকে আসনে বসাইয়া শঙ্খধ্বনি করত লোকসমাগমের মধ্যে স্বয়ং আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্রক্‌চন্দনে ভূষিত করেন।...”

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায় 'ব্রহ্মবিদ্যালয়/আশ্রমকথা' বিভাগে (পৃ. ৮৫) কবিতাটি মুদ্রিত হয়। তৎপূর্বে পূর্বোক্ত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক -সংখ্যায় কবিতাটি অংশত প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭. প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (১৮৬১-১৯৪৪) সপ্ততিতম জন্মবার্ষিক উদ্‌যাপনে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাউন হলে তাঁহাকে সংবর্ধনা প্রদান উপলক্ষে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিরূপে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে গদ্যে রচিত উক্ত অভিভাষণটি মুদ্রিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহার রচিত *Mahatmaji and the Depressed Humanity* গ্রন্থ (ডিসেম্বর ১৯৩২) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্দেশে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রসঙ্গে প্রকাশিত সংবাদটি এখানে সংকলিত হইল—

“রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য রায়কে আশীর্ব্বাদস্বরূপ দুই ছত্র কবিতা একটি সুন্দর তাম্রফলকে খোদিত করাইয়া দিয়াছেন। তাম্রফলকটি মোরাদাবাদে পরিকল্পিত ও প্রস্তুত। কবিতাটি এই ঃ—”

দ্রষ্টব্য, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ/আনন্দবাজার পত্রিকা', তৃতীয় খণ্ড (১৯৯৬) পৃ. ৮-১০

৮. রামমোহন রায়ের (১৮৭২-৩৩) প্রয়াণশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছাত্রসমাজ-প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ *The Students' Rammohun Centenary Volume*, (Calcutta 1934)-এ কবিতাটির প্রথম প্রকাশ।

৯. 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' (১৮৭০-১৯২৫) শীর্ষক কবিতা তৎকালে 'ভারতবর্ষ' ও অন্য দু-একটি সাময়িকপত্রে একযোগে প্রকাশিত হয়।

১০. দক্ষিণ কলিকাতার সাহানগর শ্মশানঘাটে (বর্তমান কেওড়াতলা) চিত্তরঞ্জন দাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াস্থলে তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতিসৌধের উদ্‌বোধন (১৬ জুন ১৯৩৫) উপলক্ষে রচিত। এই কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরাজি রূপান্তর (দ্র. *Visva Bharati News*, July 1935) নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Thy motherland spreads the veil from her breast on this dust
where the body lift its last touch.
Thy country's invocation is charted in this silent stones.
For the bodiless presence to take its seat here
on the alter of deathless love

16.6.35

১১. কলিকাতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (২৯ জুন ১৮৬৪ - ২৫ মে ১৯২৪) উদ্দেশে নবনির্মিত স্মৃতিমন্দিরে (Ashutosh Mookerjee Memorial Building) তাঁহার জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রেরিত। এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার ২৯ জুন ১৯৩৫। কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরাজি রূপান্তর এখানে সংকলিত হইল।

Once the Goddess of wisdom left her own
signature upon your name, and you
maintained her majesty with all your life.

Let that yours ever proclaim her
triumph uniting your memory with her
service in this Temple of Learning.

১২. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পঞ্চদশ স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুরী হইতে কবিতাটি লিখিয়া পাঠান। রচনাকাল, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে হওয়ার সম্ভাবনা। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এইরূপ— "আশুতোষ স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৬শে এপ্রিল পুরী হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।"

১৩. কালীঘাটে পশুবলি প্রথার প্রতিবাদে জয়পুরের অধিবাসী রামচন্দ্র শর্মা ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ হইতে অনশন করিয়া প্রাণবিসর্জনের পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের প্রতিবাদ সমর্থন করিয়া তাঁহার উদ্দেশে এই কবিতা রচনা করেন। 'পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা' শীর্ষক তিন স্তবকের কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কার্তিক ১৩৪২ সংখ্যা প্রবাসীতে পুনরায় শেষে আর-একটি স্তবক যোগ করিয়া এই কবিতা পুনঃপ্রকাশিত হয়, বর্তমান রচনাবলীতে দ্বিতীয় পাঠটি গৃহীত হইল।

রবীন্দ্রনাথের এই সমর্থনে বঙ্গীয় সমাজে অংশত বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আশা করিয়াছিলেন অনশন হইতে রামচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত করিবেন। হীরেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (রচনাকাল, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, শান্তিনিকেতন) আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (দ্র. 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ/আনন্দবাজার পত্রিকা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯১)। ইহা ছাড়া, বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও জনৈক প্রশ্নকর্তাকে যে দুইখানি পত্র লেখেন (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ ও ২৪ ভাদ্র ১৩৪২) তাহা প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্তিক ১৩৪২ সংখ্যায়। এই পত্রগুলি বর্তমান রচনাবলীর গদ্যাংশের 'পরিশিষ্ট' অংশভুক্ত ২৪-সংখ্যক রচনাসূত্র লিখিত গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইয়াছে।

সংবাদ সংস্থা 'ইউনাইটেড প্রেস'-কে রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্র শর্মার উদ্‌যোগ বিষয়ে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান রচনাবলীর গদ্যাংশে 'রামচন্দ্র শর্মা' নামে তাহা সংকলিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত মদনমোহন মালব্যর অনুরোধে ৬ অক্টোবর ১৯৩৫ তাঁহার অনশন-ব্রত ভঙ্গ করেন।

১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের (১৮৬৪-১৯৩৮) দ্বি-সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা সেনেট হলে ৪ পৌষ ১৩৪২।২০ ডিসেম্বর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁহার উদ্দেশে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা কালিদাস নাগ -কর্তৃক পঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কলিকাতা ফিলজফিক্যাল সোসাইটির রজতজয়ন্তী উৎসব এবং ব্রজেন্দ্রনাথের দ্বি-সপ্ততিতম জন্মোৎসব একই স্থলে একই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি আনন্দবাজার পত্রিকার ৪ পৌষ ১৩৪২। ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৫ সংখ্যায় অনুষ্ঠানের সংবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছিল; 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৪২ সংখ্যায়।

১৫. রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬-৮৬) জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত। কবিতাটি 'প্রবাসী' ও 'উদ্বোধন' পত্রে ফাল্গুন ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ -কৃত ইংরাজি অনুবাদের প্রকাশ *Probuddha Bharat* পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ সংখ্যায়। অনুবাদটি অতঃপর সংকলিত হইল—

**To the Paramhansa Ramkrishna Deva**

Diverse courses of worship from varied springs
of fulfilment have mingled in your meditation.

The manifold revelation of the joy of the
Infinite had given form to a shrine of unity in your life
where from far and near arrive salutations to which I join
mine own.

কবিতায় প্রশস্তিজ্ঞাপন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত Parliament of Religions-এর তৃতীয় দিনের অধিবেশনে (৩ মার্চ ১৯৩৭) সভাপতির ভাষণে যে ইংরাজি রচনা পাঠ করেন তাহা পরিমার্জিতরূপে প্রকাশিত হয় *The Modern Review* পত্রিকার এপ্রিল ১৯৩৭ সংখ্যায়। প্রবন্ধটি সংকলিত হইয়াছে *The Religions of the World*, vol. 1 (1938) গ্রন্থে।

১৬. বিধুশেখর শাস্ত্রীকে (১২৮৫-১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে সম্মানিত করা উপলক্ষে রচিত। কবিতায় প্রশস্তি জ্ঞাপন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখরকে পত্রদ্বারা যে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, এখানে তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হইল। পত্রটি ফাল্গুন ১৩৪২ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়—

ওঁ

প্রীতি নমস্কার সম্ভাষণ

আপনার রাজদত্ত সম্মান লাভের পর কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গেল— যথোচিত অভিনন্দন পাঠাতে পারি নি তার কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। বিবাহ-উৎসবে বিধবার যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ— আমি উপাধিত্যাগী, কী আখ্যা দেবেন? ব্যুপাধিক? আপনার নব উপাধি-সম্প্রদান উপলক্ষ্যে শঙ্খধ্বনি হয় তো আমাকে শোভা পায় না। তবু আপনার রাজধানীর বন্ধুসভা থেকে দূরে এই অন্তরালে বসে রাজবুদ্ধির প্রশংসাবাদ জানাচ্চি। আমাদের এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে যতদিন ছিলেন ততদিন আপনার প্রকাশ অবরুদ্ধ ছিল, তাই রাজার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন— আজ প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং সম্মানও পেয়েছেন তারই উপযুক্ত। আমরা আপনাকে নিতান্ত আটপহুরে শাস্ত্রী উপাধি দিয়েছিলেম দীন-জনোচিত সঙ্কোচের সঙ্গে, সেটা মানী সমাজে ব্যবহার্য নয়। সেটা আজ এখানকার ধূলিতেই স্খলিত হয়ে রইল।...

ইতি ১৮ জানুয়ারি, ১৯৩৬
আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) পরলোকগমনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৪৪ সংখ্যায় ও একই সঙ্গে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতাটি মুদ্রিত হয়। রচনাকাল ১২ মাঘ ১৩৪৪।

শরৎচন্দ্রের পীড়ার সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে পত্র লেখেন, এখানে তাহা সংকলিত হইল—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, রুগ্নদেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে।

ইতি

৩১।১২।৩৭ তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন, সংবাদপত্র হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত হইল—

"বাঙালি জীবনের সুখ দুঃখের চিত্র যাঁহার নিবিড় অনুভূতিতে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, আধুনিক যুগের সেই দরদী সর্বজনপ্রিয় লেখকের মৃত্যুতে দেশবাসীর সহিত আমিও সমবেদনা অনুভব করিতেছি।" দ্র. 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ/আনন্দবাজার পত্রিকা' তৃতীয় খণ্ড (১৯৯৬), পৃ. ১৩৮।

১৮. হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়-র (১৮৫৭-১৯৩৮) পরলোকগমনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। রচনাকাল ২ মাঘ ১৩৪৪। 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় একই সঙ্গে প্রকাশিত (ফাল্গুন ১৩৪৪)। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পাঠে কবিতাটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্রদুটি ছিল না।

১১ মাঘ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বর্তমান কবিতাপ্রসঙ্গে লিখিতেছেন,

"তোমার বাবার স্মরণার্থ আমি একটি চৌপদী কবিতা পাঠিয়েছিলুম, বোধ করি যথাসময়ে সেটা পেয়েছ। আরো দু লাইন ছিল চৌপদীর সীমা বাঁচাবার জন্যে কেটে দিয়ে দিয়েছিলুম, তবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলুম।

দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক,
জরা আচ্ছাদন তলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক।"

প্রকাশ, 'দেশ' ৫ ফাল্গুন ১৩৬৭।

ইতিপূর্বে ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারীকে তাঁহার প্রয়াত পিতৃদেবের উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"পূর্ণ পরিণত জীবনের প্রায় চরম প্রান্তে মৃত্যু যখন নিশ্চিত অবধারিত, এবং যখন প্রতি মুহূর্তে জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, তখন মৃত্যুকে যিনি কখনো ভয় করেন নি, তাঁর পক্ষে মৃত্যুকে শোকাবহ বলে গণ্য করতে পারি নে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সুখদুঃখ স্নেহপ্রেমের নানা সম্বন্ধে জড়িত, বিচ্ছেদদুঃখ তাঁদের বেদনা দেবে জানি, কিন্তু যিনি চলে গেছেন তাঁর শান্তি ও নিষ্কৃতির দিকে লক্ষ্য করলে এই দুঃখকে তার তুলনায় সামান্য বলেই স্বীকার করতে হবে।"

প্রকাশ, 'দেশ' ৫ ফাল্গুন ১৩৬৭।

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১০ আষাঢ় ১৩৪৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে (অভিজ্ঞান সংখ্যা ১৫৯) কবিতাটির একটি পূর্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশিত কবিতা হইতে অনেকাংশে পার্থক্য থাকায় শিরোনামহীন কবিতাটি এখানে সংকলিত হইল—

আপন অশ্রান্ত বেগে সৃষ্টি চলিয়াছে যাত্রা করি
  নিরন্তর দিবা-বিভাবরী।
স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে অচৈতন্য যা রহে না জেগে,
  ধূলি বিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে।

নদী যদি ক্লান্ত হয় মহাসমুদ্রের অভিসারে,
  অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে।
নিশ্চল গৃহের কোণে কাঁপে, স্তিমিত নিভৃতে যেই বাতি
  দরিদ্র আলোক তার লুপ্ত হয়, না ফুরাতে রাতি।
যাত্রীর মশালে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে,
  জানে না সে আঁধারে মিশিতে।

যাহার অন্তরে নাই অনাগত যুগের পাথেয়
  জানি সে কালের কাছে হেয়।
কীর্তিনাশা স্মৃতিনাশা নির্মম স্রোতের ধারে ধারে—
  পড়ে আছে অতীতের পরিত্যক্ত খ্যাতি সারে সারে।
আপনার অর্থ তারা হারায়েছে, হারায়েছে গতি
  অন্ধ রাতে হারায়েছে জ্যোতি।
তাই স্বদেশের তরে, তারি লাগি ধ্বনিছে প্রার্থনা,
  সেই দান লাগি, যাহা নহে জীর্ণপ্রাণ শুষ্ক শস্যকণা।
উঠে না অঙ্কুর যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান,
  আজ গেলে কাল অবসান।

পেয়েছে তোমার হাতে তব দেশ, কালের যে বর,
  হে বঙ্কিম, নহে সে স্থাবর।
নব-সাহিত্যের উৎস উৎসারিত মন্ত্রস্পর্শে তব
  চির-চলমান গতি, জাগাইয়া প্রাণ অভিনব।
এ-বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলে স্রোত সম্মুখের টানে
  ফলবান ভবিষ্যৎ-পানে।
তাই নিত্য ধ্বনিতেছে সে বাণীর তরঙ্গ-হিল্লোলে—
  হে বঙ্কিম, তব নাম তব খ্যাতি তারি স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গনি,
  তাই মোরা করি জয়ধ্বনি।

[ কালিম্পঙ। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়? ১৩৪৫ ]

২০. মেদিনীপুরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) স্মৃতিমন্দির নির্মাণ উপলক্ষে লিখিত। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ তারিখে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসংরক্ষণ-সমিতির অধিবেশনে পঠিত। কবিতাটি স্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসবের (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) আমন্ত্রণপত্রে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়।
২১. জলধর সেনের (১৮৬১-১৯৩৯) মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।
২২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৮৮-১৯৬১) জন্মের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত। 'কল্যাণীয় শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে— রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ' নামে পুস্তিকাকারে প্রচারিত। পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ'

দ্বিতীয় খণ্ডে (২২ শ্রাবণ ১৩৬৮) 'স্মরণ' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত।

২৩. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৩-১৯৪৯) উদ্দেশে রচিত। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ. ৭২৪) কেদারনাথের 'পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়' শীর্ষক 'প্রবাসী'-সম্পাদককে লিখিত পত্রের সহিত (রচনাকাল, ১৭ অগাস্ট ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি সংকলিত হয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কেদারনাথের পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"মনের অবস্থা আজ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। দুর্লভ সম্পত্তি খুইয়ে সর্বহারার মত বিমূঢ়, চঞ্চল।...

আমি প্রায় তাঁর সমবয়সী— এক বৎসর কয়েক দিনের ব্যবধান মাত্র। গত জানুয়ারি মাসে নিজে পীড়িতাবস্থায় তাঁর কাছে পাথেয়রূপে আশীষপ্রার্থী হই। তাঁর স্নেহকরুণ আশ্বাসবাণী, এই কৃতজ্ঞের প্রাণে যেন আশার স্নিগ্ধ প্রলেপ দান করে— মর্ম কিন্তু বিচলিতও কম হয় নি। বেশ জানি— বাংলার তথা বিশ্বের রবি, চিরদিনই মৃত্যুজয়ী হয়ে থাকবেন— তবু... বস্তুতান্ত্রিক অভ্যাস ব্যথা দেয়!

তাঁর সেই দুর্লভ আশীষবাণী, নিম্নে সমগ্রই উদ্ধৃত করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ তাতে মৃত্যুকে যে অভিনন্দন দিয়েছেন, তা সকলেরই সম্পত্তি— সকলকেই অভয়দানে ভয়-মুক্ত করবে বলেই আমার ধারণা।

প্রথম দুটি লাইন তাঁর মহত্ত্বের নিদর্শনরূপেই গ্রহণ করবেন। যে-হেতু— ব্যক্তিগত।"

## স্ফুলিঙ্গ

ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে বিভিন্ন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল ক্ষুদ্রায়তন কবিতা রচনা করেন, সেগুলি বিভিন্ন সূত্র হইতে সংকলিত হইয়া যথাসম্ভব কালানুক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে। সংকলিত কবিতাগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি নিম্নরূপ—

১. প্রথম পাতাখানি মেলেছে শতদল। ৪ শ্রাবণ ১৩১২। হেমেন্দ্রনাথ গুহরায়ের উদ্দেশে। দ্রষ্টব্য, 'বিক্রমপুর' দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

২. লিখব তোমার রঙিন পাতায়। ১১ আষাঢ় ১৩২১, শান্তিনিকেতন। কলিকাতার মেয়ো হাসপাতালের চিকিৎসক, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র-র স্বাক্ষর-সংগ্রহ খাতায় লিখিত।

৩. কলাবিদ্যা কুঞ্জে কুঞ্জে। ১ বৈশাখ ১৩২২। অসিতকুমার হালদারের উদ্দেশে। 'রবিতীর্থে' গ্রন্থে (১৩৬৫) অসিতকুমার কবিতাটির রচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "১৩২২—১লা বৈশাখ রবিদার সামনে ধরলুম পুরোনো autographএর খাতাখানি আমার পিতামহের ১৮৬০ সালে বার্লিন থেকে আনা। রবিদা আশীর্বচন লিখেছিলেন সরসভাবে..."

৪. আমার মূর্তি পূর্ণ করি। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৪। অসিতকুমার হালদারের উদ্দেশে। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত। অপিচ দ্রষ্টব্য. 'রবিতীর্থে' গ্রন্থ, পৃ. ১৬২।

৫. পূর্ণতা আসুক আজি। অতসী হালদার/বড়ুয়া। 'রবিতীর্থে' গ্রন্থে (পৃ. ১৫৮) অসিতকুমার জানাইয়াছেন, "...আমার বড় মেয়ে অতসী— ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়ার স্ত্রী। ইনি এখন ছবি আঁকায় বেশ নাম করেচেন। এঁদের বিবাহে রবিদাদা লিখে পাঠিয়েছিলেন..."

৬. কল্যাণপ্রতিমা শান্তা। ফাল্গুন ১৩২২। সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালমৃতা কন্যা

শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে রচিত। রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডে সংকলিত 'প্রহাসিনী' কাব্যের 'সংযোজন' 'সালগম সংবাদ/নাতিনীর জবাব' কবিতা রবীন্দ্রনাথ শান্তার প্রত্যুত্তর হিসাবে রচনা করেন।

৭. হে মহা ধীমান। ১১ জুন ১৯১৬। জাপানি শিল্পী ইয়োকো ইয়ামা টাইকানের উদ্দেশে রচিত। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপানে থাকাকালীন টোমি ওয়াডা কোরা-কে সিল্কের কাপড়ে জাপানি তুলিতে কবিতাটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য, সুচন্দ্রা বসু, 'আমরা যেথায় মরি ঘুরে' নিবন্ধ, 'দেশ' বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৮. একদিন অতিথির প্রায়। ২৫ বৈশাখ ১৩২৫। জাপানি শিল্পী আরাই কাম্পোর উদ্দেশে রচিত। জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রা' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অতিথি-শিল্পশিক্ষকরূপে অবস্থান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে শিল্পীকে যে বিদায়-সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পীর তুলিতেই কবিতাটি লিখিয়া দেন।

৯. তোমাদের মিলন হউক ধ্রুব। ১৬ ফাল্গুন ১৩২৮। অরুন্ধতী সরকার/ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে। সীতা দেবী তাঁহার 'পুণ্যস্মৃতি' (১৩৪৯) গ্রন্থে এই কবিতা রচনার পটভূমি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আমার নব-বিবাহিতা ভ্রাতৃজায়াকে তিনি তাঁহার কাব্য-গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু লেখা ছিল না। বধূঠাকুরানী এই সুযোগে বইগুলি উপস্থিত করিলেন, লিপিবদ্ধ আশীর্বাদ পাইবার আশায়। তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল না। লোকে যেমন অবলীলায় নাম সহি করে, তেমনি তিনি অবলীলায় কয়েক লাইন কবিতা লিখিয়া দিলেন।"

কবিতাটিতে রচনাকাল হিসাবে বিবাহের তারিখটি উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থ অনুসারে তারিখটি হইবে ২ চৈত্র ১৩২৮।

১০. তোমাদের এই মিলন-বসন্তে। ১৫ ফাল্গুন ১৩২৯। প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবিশের পরিণয় উপলক্ষে। 'বসন্ত' গীতিনাট্যের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি উভয়ের পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়া দেন। দ্রষ্টব্য, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'পত্রাবলীর ভূমিকা', দেশ, ১৯ কার্তিক ১৩৬৭।

১১. যুগল প্রেমের কল্যাণমালা। ১০ ফাল্গুন ১৩৪১। নির্মলকুমারী-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর বিবাহবার্ষিক উপলক্ষে রচিত। দ্রষ্টব্য, নির্মলকুমারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র : 'দেশ' ১৭ চৈত্র, ১৩৬৮।

১২. পশ্চিম দিকের প্রান্তে। ২৪ অক্টোবর ১৯৩৬। নির্মলকুমারী মহলানবিশ-এর উদ্দেশে. প্রকাশ, 'দেশ' ২১ পৌষ ১৩৬৮।

১৩. মিলনের রথ চলে। ১৪ ফাল্গুন ১৩৪৫। নির্মলকুমারী-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর বিবাহ-বার্ষিক উপলক্ষে। প্রকাশ, 'দেশ' ৩ চৈত্র ১৩৬৮।

১৪. বর্ষ পরে বর্ষ গেছে চলে। ১৫ ফাল্গুন ১৩৪৭। নির্মলকুমারী-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরিণয়দিবস স্মরণে।

১৫. অন্তরে মিলনপুষ্প। ১২ আশ্বিন ১৩৩০। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবীর উদ্দেশে।

১৬. খেলার খেয়াল বশে। ২ ফাল্গুন ১৩৩২। ইন্দুলেখা ঘোষের উদ্দেশে।

১৭. পূর্বের দিগন্তমূলে। জুন ১৯২৫। অপূর্বকুমার চন্দ-র উদ্দেশে।

১৮. বহুদিন কেন তব সহাস্য। ৫ মাঘ ১৩৩৪। দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে। 'অনামী' প্রথম সংস্করণ [১৩৪০] ভুক্ত।

১৯. তব জীবনের গ্রন্থখানিতে। ৭ ফাল্গুন ১৩২৯। অমিতা সেনের (খুকু) উদ্দেশে। দ্রষ্টব্য,

'দেশ' শারদীয় ১৩৯২।

২০. অন্তরে তব স্নিগ্ধ মাধুরী। ১২ জানুয়ারি ১৯৩০। সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী তনুজা গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে। তনুজা দেবী -রচিত 'পাঁচমিশালি' রান্নার বইয়ে (শ্রাবণ ১৩৫৬) রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা গ্রন্থসূচনায় মুদ্রিত। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত স্বতন্ত্র 'স্ফুলিঙ্গ' গ্রন্থে (১৩৯৭ সং) কবিতাটির অপর একটি পাঠ দৃষ্ট হয়। অপিচ দ্রষ্টব্য, 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থধৃত 'নাতবউ' কবিতা।

২১. তোমাকে করিবে বন্দী। ২৪ মার্চ ১৯৩১। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র-র জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরা মৈত্র/চৌধুরীর উদ্দেশে। মীরা চরকায় সূতা কাটিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহার অটোগ্রাফ খাতায় গান্ধীজি লিখিয়া দেন—

Never make a promise in haste. Having once made it fulfil it at the cost of your life. 7.6.25

পরবর্তীকালে মীরা অটোগ্রাফ প্রার্থীরূপে সেই খাতা রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলিয়া দিলে তিনি প্রথমে বাংলা কবিতাটি লিখিয়া পরে ইংরাজিতে লেখেন—

Surrender your pride to truth, fling away your promise if it is found to be wrong.

March 24, 1931 Rabindranath Tagore

২২. বিকশি কল্যাণবৃন্তে। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও পুত্রবধূ প্রেমোৎপল ও অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে।

২৩. আকাশে চেয়ে আলোক-বর। ২২ ফাল্গুন ১৩৩৮। অশোকবিজয় রাহার উদ্দেশে। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, 'পত্রাষ্টক' (১৩৮৮), শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যকে লেখা অশোকবিজয়ের চিঠিপত্র সংকলন। অশোকবিজয়ের 'যেথা এই চৈত্রের শালবন' (১৩৬৮) কাব্যের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে কবিতাটি মুদ্রিত।

২৪. তোমার জীবনধারা। ২৭ ভাদ্র ১৩৩৯। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা রেবা ভট্টাচার্য-র নামকরণ উপলক্ষে।

২৫. জীবনের তপস্যায়। ৩০ ভাদ্র ১৩৩৯। উমা রায়ের উদ্দেশে।

২৬. তোমার লেখনী যেন। দোল ১৩৩৯। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের উদ্দেশে। আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ সূচনায় ১২ মার্চ ১৯৩৩ তারিখে কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এই কবিতার অপর একটি পাঠে দ্বিতীয় ছত্রটি নিম্নরূপ—

শত্রুমিত্র নির্বিভেদ সর্বজন পরে।

২৭. মোহন-কণ্ঠ সুরের ধারায়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩। অমলা দত্ত/ রায়চৌধুরীর উদ্দেশে রচিত। অমলা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। শিলঙের প্রমোদচন্দ্র দত্ত-র কন্যা।

২৮. নাই হল চাক্ষুষ পরিচয়। ১৬ বৈশাখ ১৩৪১। 'দেশ' শারদীয় ১৩৫৮ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোনো উল্লেখ নাই।

২৯. আমার নামের আখর। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। কণিকা মুখোপাধ্যায়/ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্দেশে।

৩০. হে অপরিচিতা। ২৪ নভেম্বর ১৯৩৪?। উমা চন্দ-র উদ্দেশে। অটোগ্রাফ খাতায় স্বাক্ষরসহ কোনো রচনার প্রত্যাশী হইয়া রবীন্দ্রনাথকে উমা চন্দ পত্রে অনুরোধ জানাইলে তাহার উত্তরে শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ ১৪ নভেম্বর ১৯৩৫ তারিখে লেখা পত্রে অটোগ্রাফ খাতা পাঠাইতে লেখেন। কবিতাটি সেখানেই লেখা হয়।

৩১. দুর্গম সংসার-পথে। ২৫ চৈত্র ১৩৪২। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুত্রবধূ লীলার বিবাহ উপলক্ষে রচিত। কবিতার 'দম্পতি' শিরোনামে

আর-একটি পাঠ পাওয়া যায়, সেখানে দ্বিতীয় স্তবক 'প্রেমের পাথেয় নিয়ে নিরাপদে চলো দিনরাত্রি' ও তৃতীয় স্তবকে 'মোহধন্ধ' স্থলে 'মোহধন্দ'— এই পাঠান্তর লক্ষ করা যায়।

৩২. আমি তোমার শ্যালী। [ বৈশাখ ১৩৪৩? ]। দৌহিত্রী নন্দিতার বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণ কৃপালনীর উদ্দেশে পৌত্রী নন্দিনীর জবানীতে লেখা। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত মূল রচনাটি নির্মলকুমারী মহলানবিশ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

৩৩. যুগল মিলন মন্ত্রে। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩। দেবরানী দেবীর পরিণয় উপলক্ষে। দ্রষ্টব্য, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৪।

৩৪. অস্তরবি-কিরণে তব। [ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ]। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের কন্যা, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শোভনা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে। প্রকাশ, 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩৪৪।

৩৫. তোমরা যুগল প্রেমে রচিতেছ। ১২ জুন ১৯৩৬। কোচবিহারের রাজকুমারী ইলা দেবীর সহিত ত্রিপুর-রাজকুমার রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মার পরিণয় উপলক্ষে রচিত।

৩৬. উদয়পথের তরুণ পথিক। ১৫.১.৩৮। রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন -প্রকাশিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা' চতুর্দশ সংকলনে (পৌষ ১৩৯২) 'টুকরো লেখা' পর্যায়ে মুদ্রিত।

৩৭. নবমিলন-পূর্ণিমায়। ২৫ ফাল্গুন ১৩৪৪। ঊর্মি দেবীর পরিণয় উপলক্ষে। 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৪৮ সংখ্যায় 'আশীর্বাদ' শিরোনামে প্রকাশিত দুটি কবিতার অন্যতম।

৩৮. হাবলুবাবুর মন পাব বলে। ১১.৩.৩৮। অজীন্দ্রনাথ-অমিতা ঠাকুরের পুত্র অভীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। দ্রষ্টব্য, 'দেশ' শারদীয় ১৩৫১।

৩৯. যুগলে তোমরা করো। ৩০ বৈশাখ ১৩৪৫। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সরিৎচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ উপলক্ষে।

৪০. ভোরের বেলায় যে জন পাঠালে। অগাস্ট ১৯৩৮। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র-র কন্যা বাবলির (মীরা মৈত্র/চৌধুরী) উদ্দেশে। দ্রষ্টব্য, 'টুকরো লেখা', 'রবীন্দ্রবীক্ষা' চতুর্দশ সংকলন (পৌষ ১৩৯২)।

৪১. লেখন আমার ম্লান হয়ে আসে। ৩০।৬।৪৫। মাখনলাল মৈত্র-র পুত্রবধূ বাসন্তী মৈত্র-র উদ্দেশে। শারদীয় 'বর্তমান' ১৩৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪২. যূথিকা, এসেছিলে জীবনের আনন্দ-দূতিকা। পৌষ ১৩৪৫। হেমচন্দ্র দত্ত-র কন্যা যূথিকার অকালমৃত্যু উপলক্ষে রচিত। বিশ্বভারতীতে প্রাক্-স্নাতক শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত 'কবি প্রণাম' গ্রন্থে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) কবিতাটি মুদ্রিত।

৪৩. মহিষী, তোমার দুটি। ৩ বৈশাখ ১৩৪৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রবধূ অমিতা ঠাকুরের উদ্দেশে। প্রকাশ, সাপ্তাহিক 'দেশ' ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯২। 'তপতী' নাটকের প্রথম অভিনয়ে রানী সুমিত্রার ভূমিকায় অমিতা ঠাকুর এবং বিক্রমজিৎ-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয়সূত্রে 'মহিষী' সম্বোধন এবং কবিতাশেষে 'বিক্রমজিৎ' লিখিত। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'স্ফুলিঙ্গ' স্বতন্ত্র গ্রন্থে (১৩৯৭) সংকলিত এই কবিতায় কোনো কোনো স্থলে স্বতন্ত্র পাঠ লক্ষণীয়।

৪৪. পাঠালে যে আমসত্ত্ব। ২.৭.১৯৩৯। নিরুপমা দেবী রবীন্দ্রনাথকে স্বহস্তে প্রস্তুত আমসত্ত্ব ও তৎসহ একটি কবিতা পাঠাইলে তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা রচনা করেন। দ্রষ্টব্য, নিরুপমা দেবী, 'আমার জীবন/সাহিত্যসাধনার স্মৃতি', 'এক্ষণ', শারদীয় ১৪০১ (পৃ. ১১১-১২)। 'পদাতিক' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় (১৩৮৯) এই কবিতার যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে কিছু পাঠান্তর লক্ষ করা যায়।

৪৫. তোমরা দুজনে একমনা। ১৪ পৌষ ১৩৪৬। নন্দিনী দেবীর (পুপে) পরিণয় উপলক্ষে রচিত এই কবিতার প্রকাশ পত্রী-আকারে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯। বাংলা কবিতার সহিত ইংরাজি অনুবাদও উল্লিখিত পত্রীতে দেখা যায়। 'প্রবাসী' কার্তিক ১৩৪৮ সংখ্যায় বাংলা কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ইংরাজি ও বাংলা কবিতা, তৎসহ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিবাহের আমন্ত্রণপত্র সংকলিত হইয়াছে 'রবীন্দ্রবীক্ষা'-র উনবিংশতিতম সংকলনে (২২শে শ্রাবণ ১৪০৩)।

৪৬. তোমার নামের সাথে। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। জগদিন্দ্রনাথ রায়-এর পৌত্র জয়ন্তনাথ রায়-এর উদ্দেশে।

৪৭. যে মিলনে সংসারের। ২১ জুন ১৯৪০। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ উপলক্ষে। কামাক্ষীপ্রসাদ ১৮.৬.১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, ...আগামী ১৮ই আষাঢ় আমার বিবাহ। আপনার আশীর্বাদ না হলে সে উৎসব সার্থক হবে না। ...আপনি যদি ছোট একটি কবিতা আমাকে পাঠান, তাহলে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করব।...

রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং হইতে কবিতাটি পাঠাইয়া দেন। —দ্রষ্টব্য, 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২।

৪৮. বাঙাল যখন আসে। ২ ডিসেম্বর ১৯৪০। সুধীরচন্দ্র কর-এর উদ্দেশে। সুধীরচন্দ্ররচিত 'সুরধুনী' (ফাল্গুন ১৩৩৪) কাব্যের সূচনায় মুদ্রিত। অপিচ দ্রষ্টব্য, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, 'রবীন্দ্র-দৈনিকী', 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৪৭।

৪৯. সুধীর বাঙাল গেল কোথায়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪০। সুধীরচন্দ্র কর-এর উদ্দেশে। প্রকাশ, 'রবীন্দ্র-দৈনিকী', 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৪৭। সুধাকান্ত লিখিয়াছেন, "১৬।১২।৪০ তারিখের কথা, এঁকে [সুধীরচন্দ্র] উদ্দেশ করেই মুখে মুখে ছড়া তৈরি হল।"

৫০. নাকের ডগা ঘসিয়া। ফাল্গুন? ১৩৪৭। সুধীরচন্দ্র কর-এর উদ্দেশে। প্রকাশ, 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৪৭।

৫১. সুধীর যখন কর্ম করেন। সুধীরচন্দ্র কর-এর উদ্দেশে।

৫২. লেখার যত আবর্জনা। সুধীরচন্দ্র কর-এর উদ্দেশে।

৫৩. আরোগ্যশালার রাজকবি। ২৫ পৌষ ১৩৪৭। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর উদ্দেশে। 'রবীন্দ্রবীক্ষা' দশম সংকলনে (পৌষ ১৩৯০) সংকলিত।

৫৪. সুধাকান্ত বচনের রচনে অক্লান্ত। ১২ মার্চ ১৯৪১। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর উদ্দেশে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' চতুর্থ খণ্ডে (১৩৭১) কবিতা রচনার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। পূর্ববর্তী 'আরোগ্যশালার রাজকবি' ইত্যাদি ১৮ ছত্রের কবিতাটি 'সুধাকান্ত বচনের রচনে' ইত্যাদি কবিতার পূর্বপাঠ বলা যাইতে পারে। দুটি রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকায় কবিতাটি এখানে স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করা হইল। দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' দশম সংকলন (পৌষ ১৩৯০) ও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'প্রহাসিনী' গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণের 'পরিশিষ্ট' অংশ।

সুধাকান্তকে কেন্দ্র করিয়া এই সময়ে রচিত/কথিত রবীন্দ্রনাথের অপর একটি কবিতা এখানে সংকলিত হইল—

পাশের ঘরেতে ব'সে যবে খাই দই-ভাত,<br>
কান খাড়া করে থাকি যদি কভু দৈবাৎ<br>
কবিমুখ হতে বাণী খ'সে পড়ে আলসে—<br>
তখনি টুকিয়া লই নাই হল ভালো সে।

কাগজে বাহির করি না মরিতে ঝাঁজটা,
এত হুঁসিয়ারি জেনো এডিটরি কাজটা।

উদয়ন
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

৫৫. খাতাভরা পাতা তুমি। আশ্বিন ১৩৪৮। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পুত্র সনৎকুমারের 'স্মরণ বহি'-তে লিখিত। প্রকাশ, 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৪৮।
৫৬. পথে যবে চলি মোর। মহাশ্বেতা দেবীর অটোগ্রাফ খাতায় লিখিত। প্রকাশ, 'মেঘনা' ১৩৫৪।
৫৭. অন্তসিন্ধু পার হয়ে। মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা মীরা গুপ্ত-র উদ্দেশে। প্রকাশ, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৮।

বর্তমান গুচ্ছে সংকলিত কবিতাগুলির রচনাকাল এবং কোনো কোনো স্থলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম জানা সম্ভবপর না হওয়ায় এগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হইল—

৫৮. আপনারে তুমি লুকাবে। হেমবালা সেনের উদ্দেশে। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যের (১৩৯৭ সং) ৪৬ সংখ্যক কবিতা।
৫৯. আমার বুড়ো বয়সখানা। ২৯৪-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-ধৃত।
৬০. উষায় কলকাকলিতে। উষা কর-সুপ্রভাস কর-এর উদ্দেশে।
৬১. কূলছাড়া যে মানুষ। শুভেন্দুশেখর বসুর উদ্দেশে।
৬২. জন্মদিন এল তব আজি। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের উদ্দেশে।
৬৩. তব কণ্ঠে বাসা। সাবিত্রী গোবিন্দ কৃষ্ণনের উদ্দেশে।
৬৪. তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি। গোলাম মোস্তাফার উদ্দেশে।
৬৫. তোমার গ্রন্থদানের। গিরিজাকুমার বসুর উদ্দেশে।
৬৬. নব-সংসার। পুলক ও মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ উপলক্ষে।
৬৭. বৈশাখের বেলফুল। সত্যেন্দ্রনাথ বিশীর উদ্দেশে।
৬৮. যুগলপ্রাণের মিলনের পরে।
৬৯. যে-লেখা কেবলি রেখা। মীরা ঘোষের উদ্দেশে।
৭০. লেখা যদি চাও এখনি। অপরিজ্ঞাত। দ্রষ্টব্য, সাপ্তাহিক 'দেশ', ১২ অক্টোবর ১৯৯১। আশামুকুল দাসের প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।
৭১. শান্তা, তুমি শান্তিনাশের। শান্তা রায়ের উদ্দেশে।
৭২. সংগীতের বাণীপথে। 'প্রবাসী', মাঘ ১৩৪৩।
৭৩. সায়াহ্নে রবির কর। গোলাম মহীউদ্দিনের উদ্দেশে।

## প্রবন্ধ

ব্যক্তিপ্রসঙ্গ-মূলক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গদ্যপ্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ)-এর পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলিতে মুদ্রিত হইয়াছে; পাঠকদের সুবিধার্থে তাহাদের একটি সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

দ্বিতীয় খণ্ড। চারিত্রপূজা (১৩১৪)
বিদ্যাসাগরচরিত ১
বিদ্যাসাগরচরিত ২
রামমোহন রায়
মহর্ষির জন্মোৎসব

মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনা
মহাপুরুষ

তৃতীয় খণ্ড। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩১৪)
রুদ্ধগৃহ
সরোজিনী-প্রয়াণ
ছোটোনাগপুর

চতুর্থ খণ্ড। সাহিত্য (১৩১৪)
কবিজীবনী

পঞ্চম খণ্ড। আধুনিক সাহিত্য (১৩১৪)
বঙ্কিমচন্দ্র
বিহারীলাল
পরিশিষ্ট। শোকসভা

ষষ্ঠ খণ্ড। সমাজ (১৩১৫)
বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য

সপ্তম খণ্ড। চার অধ্যায় (১৩৪১)
এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে 'আভাস' শীর্ষক ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ ছিল, যাহা পরবর্তী সংস্করণসমূহে বর্জিত হয়, দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়।

সপ্তম-অষ্টম খণ্ড। শান্তিনিকেতন (১৩১৬-১৩২৩)
দীক্ষা
মৃত্যু ও অমৃত
পূর্ণ
মাতৃশ্রাদ্ধ
বিশেষত্ব ও বিশ্ব
অগ্রসর হওয়ার আহ্বান

নবম খণ্ড। পরিচয় (১৩২৩)
ভগিনী নিবেদিতা

দ্বাদশ খণ্ড। কালান্তর (১৩৪৪)
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ত্রয়োদশ খণ্ড। পথের সঞ্চয় (১৩৪৬)
বন্ধু
কবি য়েট্‌স্‌
স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি

চতুর্দশ খণ্ড। মহাত্মা গান্ধী (১৩৫৪)
মহাত্মা গান্ধী
গান্ধীজি
চৌঠা আশ্বিন
মহাত্মাজির পুণ্যব্রত
ব্রত উদ্‌যাপন

চতুর্দশ খণ্ড। খৃষ্ট (১৩৬৬)
যিশুচরিত
খৃষ্টধর্ম
খৃষ্টোৎসব
মানবসম্বন্ধের দেবতা
বড়োদিন
খৃষ্ট
সপ্তদশ খণ্ড। ধর্ম ও দর্শন
রামমোহন রায়
সপ্তদশ খণ্ড। বিবিধ
পুষ্পাঞ্জলি
বর্ষার চিঠি

ইহা ছাড়া 'জীবনস্মৃতি' (নবম খণ্ড) ও 'ছেলেবেলা' (ত্রয়োদশ খণ্ড) গ্রন্থে আত্মস্মৃতি বর্ণনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বহু ব্যক্তিপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অণিমানন্দ (রেবাচাঁদ), জগদানন্দ রায়, কুঞ্জলাল ঘোষ, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, লরেন্স, শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদীশচন্দ্র বসু, নন্দলাল বসু প্রভৃতি ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে কোনো-কোনো রচনার শিরোনাম সংকলন-কালে প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি গ্রন্থমধ্যে বিন্দু-চিহ্নাঙ্কিত করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে— গ্রন্থপরিচয়েও তাহা অনুরূপভাবে চিহ্নিত হইল। 'ব্যক্তিপ্রসঙ্গ' গদ্যাংশ-ভুক্ত মূল অংশের রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ-রচিত বা তাঁহার দ্বারা সংশোধিত। এগুলির প্রকাশ-সূচি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | |
|---|---|
| ১. কৃষ্ণবিহারী সেন | সাধনা। আষাঢ় ১৩০২ |
| ২. সাম্রাজ্যেশ্বরী | ভারতী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ফাল্গুন ১৩০৭ |
| ৩. আচার্য জগদীশের জয়বার্তা | বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮ |
| ৪. • জগদীশচন্দ্র বসু | প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ |
| ৫. জগদীশচন্দ্র | তদেব। পৌষ ১৩৪৪ |
| ৬. • সতীশচন্দ্র রায় | 'গুরুদক্ষিণা' (দ্বিতীয় সংস্করণ) |
| ৭. মোহিতচন্দ্র সেন | বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১৩ |
| ৮. • রমেশচন্দ্র দত্ত | মানসী। আষাঢ় ১৩১৭ |
| ৯. সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | প্রবাসী, ভারতী। আশ্বিন ১৩২১ |
| ১০. • রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | আশুতোষ বাজপেয়ী : 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা' (১৩৩১) |
| ১১. • দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | দেবকুমার রায়চৌধুরী : 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (১৩২৪) |
| ১২. শান্তিনিকেতনের মুলু | শান্তিনিকেতন। অগ্রহায়ণ ১৩২৬ |
| ১৩. ছাত্র মুলু | 'প্রসাদ' (১৩২৬) |
| ১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী | প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৬ |
| ১৫. বিদ্যাসাগর | তদেব। ভাদ্র ১৩২৯ |
| ১৬. • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | শনিবারের চিঠি। বৈশাখ ১৩৬৮ |
| ১৭. • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | আনন্দবাজার পত্রিকা। ১ পৌষ ১৩৪৬ |

| | |
|---|---|
| ১৮. • সুকুমার রায় | শান্তিনিকেতন। ভাদ্র ১৩৩০ |
| ১৯. • সুকুমার রায় | 'পাগলা দাশু' (? ১৩৪৭) |
| ২০. উইলিয়াম পিয়ার্সন | আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৭ কার্তিক ১৩৩০<br>প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩০ |
| ২১. পরলোকগত পিয়র্সন | শান্তিনিকেতন। ফাল্গুন ১৩৩০ |
| ২২. • মনোমোহন ঘোষ | প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন। মার্চ ১৯২৪ |
| ২৩. • সরোজনলিনী দত্ত | গুরুসদয় দত্ত : 'সরোজনলিনী' |
| ২৪. জগদিন্দ্র বিয়োগে | মানসী ও মর্মবাণী। মাঘ ১৩৩৩ |
| ২৫. লর্ড সিংহ | প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৫ |
| ২৬. • উমা দেবী | বিশ্বভারতী পত্রিকা। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক (১৩৬৪) |
| ২৭. অরবিন্দ ঘোষ | প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৫ |
| ২৮. • শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কল্লোল। আশ্বিন ১৩৩৫ |
| ২৯. শরৎচন্দ্র | প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৮ |
| ৩০. • শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | বিচিত্রা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ |
| ৩১. • মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী | উপাসনা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ |
| ৩২. • হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১ | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮<br>বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৮ |
| ৩৩. • হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২ | রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ |
| ৩৪. • প্রফুল্লচন্দ্র রায় | বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৯ |
| ৩৫. • আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | 'জাতীয় সাহিত্য' (১৯৩২) |
| ৩৬. • শ্যামকান্ত সরদেশাই | 'শ্যামকান্তর্চী পত্রেঁ' (১৯৩৪) |
| ৩৭. • প্রিয়নাথ সেন | 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' (১৩৪০) |
| ৩৮. জগদানন্দ রায় | প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪০ |
| ৩৯. • উদয়শঙ্কর | প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪০ |
| ৪০. • স্বামী শিবানন্দ | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২ ফাল্গুন ১৩৪০ |
| ৪১. নন্দলাল বসু | বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৪০ |
| ৪২. • খান আবদুল গফ্ফর খান | আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯ ভাদ্র ১৩৪১ |
| ৪৩. দিনেন্দ্রনাথ | প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪২ |
| ৪৪. • দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' (১৩৪৩) |
| ৪৫. • কমলা নেহরু | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৬ ফাল্গুন ১৩৪২ |
| ৪৬. বীরেশ্বর | প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৪ |
| ৪৭. • বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | যুগান্তর। আষাঢ় ১৩৪৫ |
| ৪৮. মৌলানা জিয়াউদ্দিন | প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৪৫ |
| ৪৯. • লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া | গরীয়সী। মে ১৯৯৮ |
| ৫০. • কামাল আতাতুর্ক | আনন্দবাজার পত্রিকা। ৯ পৌষ ১৩৪৫ |
| ৫১. • কেশবচন্দ্র সেন | রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ |
| ৫২. • বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৫ পৌষ ১৩৪৫ |
| ৫৩. ঈ. বী. হ্যাভেল | প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৫ |
| ৫৪. দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজ | তদেব। মাঘ ১৩৪৫ |
| ৫৫. • রাধাকিশোর মাণিক্য | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ |

চতুর্দশ খণ্ড। খৃষ্ট (১৩৬৬)

যিশুচরিত
খৃষ্টধর্ম
খৃষ্টোৎসব
মানবসম্বন্ধের দেবতা
বড়োদিন
খৃষ্ট

সপ্তদশ খণ্ড। ধর্ম ও দর্শন

রামমোহন রায়

সপ্তদশ খণ্ড। বিবিধ

পুষ্পাঞ্জলি
বর্ষার চিঠি

ইহা ছাড়া 'জীবনস্মৃতি' (নবম খণ্ড) ও 'ছেলেবেলা' (ত্রয়োদশ খণ্ড) গ্রন্থে আত্মস্মৃতি বর্ণনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বহু ব্যক্তিপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অণিমানন্দ (রেবাচাঁদ), জগদানন্দ রায়, কুঞ্জলাল ঘোষ, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, লরেন্স, শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদীশচন্দ্র বসু, নন্দলাল বসু প্রভৃতি ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে কোনো-কোনো রচনার শিরোনাম সংকলন-কালে প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি গ্রন্থমধ্যে বিন্দু-চিহ্নাঙ্কিত করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে— গ্রন্থপরিচয়েও তাহা অনুরূপভাবে চিহ্নিত হইল। 'ব্যক্তিপ্রসঙ্গ' গদ্যাংশ-ভুক্ত মূল অংশের রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ-রচিত বা তাঁহার দ্বারা সংশোধিত। এগুলির প্রকাশ-সূচি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | |
|---|---|
| ১. কৃষ্ণবিহারী সেন | সাধনা। আষাঢ় ১৩০২ |
| ২. সাম্রাজ্যেশ্বরী | ভারতী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ফাল্গুন ১৩০৭ |
| ৩. আচার্য জগদীশের জয়বার্তা | বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮ |
| ৪. • জগদীশচন্দ্র বসু | প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ |
| ৫. জগদীশচন্দ্র | তদেব। পৌষ ১৩৪৪ |
| ৬. • সতীশচন্দ্র রায় | 'গুরুদক্ষিণা' (দ্বিতীয় সংস্করণ) |
| ৭. মোহিতচন্দ্র সেন | বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১৩ |
| ৮. • রমেশচন্দ্র দত্ত | মানসী। আষাঢ় ১৩১৭ |
| ৯. সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | প্রবাসী, ভারতী। আশ্বিন ১৩২১ |
| ১০. • রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | আশুতোষ বাজপেয়ী : 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা' (১৩৩১) |
| ১১. • দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | দেবকুমার রায়চৌধুরী : 'দ্বিজেন্দ্রলাল' (১৩২৪) |
| ১২. শান্তিনিকেতনের মুলু | শান্তিনিকেতন। অগ্রহায়ণ ১৩২৬ |
| ১৩. ছাত্র মুলু | 'প্রসাদ' (১৩২৬) |
| ১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী | প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৬ |
| ১৫. বিদ্যাসাগর | তদেব। ভাদ্র ১৩২৯ |
| ১৬. • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | শনিবারের চিঠি। বৈশাখ ১৩৬৮ |
| ১৭. • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | আনন্দবাজার পত্রিকা। ১ পৌষ ১৩৪৬ |

| | |
|---|---|
| ১৮. • সুকুমার রায় | শান্তিনিকেতন। ভাদ্র ১৩৩০ |
| ১৯. • সুকুমার রায় | 'পাগলা দাশু' (? ১৩৪৭) |
| ২০. উইলিয়াম পিয়ার্সন | আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৭ কার্তিক ১৩৩০<br>প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩০ |
| ২১. পরলোকগত পিয়র্সন | শান্তিনিকেতন। ফাল্গুন ১৩৩০ |
| ২২. • মনোমোহন ঘোষ | প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন। মার্চ ১৯২৪ |
| ২৩. • সরোজনলিনী দত্ত | গুরুসদয় দত্ত : 'সরোজনলিনী' |
| ২৪. জগদিন্দ্র বিয়োগে | মানসী ও মর্মবাণী। মাঘ ১৩৩৩ |
| ২৫. লর্ড সিংহ | প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৫ |
| ২৬. • উমা দেবী | বিশ্বভারতী পত্রিকা। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক (১৩৬৪) |
| ২৭. অরবিন্দ ঘোষ | প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৫ |
| ২৮. • শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কল্লোল। আশ্বিন ১৩৩৫ |
| ২৯. শরৎচন্দ্র | প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৮ |
| ৩০. • শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | বিচিত্রা। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ |
| ৩১. • মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী | উপাসনা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ |
| ৩২. • হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১ | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮<br>বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৮ |
| ৩৩. • হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২ | রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ |
| ৩৪. • প্রফুল্লচন্দ্র রায় | বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৯ |
| ৩৫. • আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | 'জাতীয় সাহিত্য' (১৯৩২) |
| ৩৬. • শ্যামকান্ত সরদেশাই | 'শ্যামকান্তচী পত্রে' (১৯৩৪) |
| ৩৭. • প্রিয়নাথ সেন | 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' (১৩৪০) |
| ৩৮. জগদানন্দ রায় | প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪০ |
| ৩৯. • উদয়শঙ্কর | প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪০ |
| ৪০. • স্বামী শিবানন্দ | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২ ফাল্গুন ১৩৪০ |
| ৪১. নন্দলাল বসু | বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৪০ |
| ৪২. • খান আবদুল গফ্ফর খান | আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯ ভাদ্র ১৩৪১ |
| ৪৩. দিনেন্দ্রনাথ | প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪২ |
| ৪৪. • দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' (১৩৪৩) |
| ৪৫. • কমলা নেহরু | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৬ ফাল্গুন ১৩৪২ |
| ৪৬. বীরেশ্বর | প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৪ |
| ৪৭. • বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | যুগান্তর। আষাঢ় ১৩৪৫ |
| ৪৮. মৌলানা জিয়াউদ্দিন | প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৪৫ |
| ৪৯. • লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া | গরীয়সী। মে ১৯৯৮ |
| ৫০. • কামাল আতাতুর্ক | আনন্দবাজার পত্রিকা। ৯ পৌষ ১৩৪৫ |
| ৫১. • কেশবচন্দ্র সেন | রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ |
| ৫২. • বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৫ পৌষ ১৩৪৫ |
| ৫৩. ঈ. বী. হ্যাভেল | প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৫ |
| ৫৪. দীনবন্ধু অ্যান্ডরুজ | তদেব। মাঘ ১৩৪৫ |
| ৫৫. • রাধাকিশোর মাণিক্য | আনন্দবাজার পত্রিকা। ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ |

৫৬. • প্রমথ চৌধুরী 'গল্পসংগ্রহ' (১৩৪৮)
৫৭. • অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঘরোয়া' (১৩৪৮)

পরিশিষ্ট

১. • কেশবচন্দ্র সেন — ধর্মতত্ত্ব। ১ মাঘ ১৯৬৬ সংবৎ (১৩১৭)
২. • রাজনারায়ণ বসু — প্রবাসী। কার্তিক ১৩২৪
৩. • রামমোহন রায় ১ — তদেব। কার্তিক ১৩২৪
৪. • রামমোহন রায় ২ — তদেব। কার্তিক ১৩২৪
৫. • রামমোহন রায় ৩ — আনন্দবাজার পত্রিকা। ৭ ফাল্গুন ১৩৩৯
৬. • রামমোহন রায় ৪ — তদেব। ১৩ আশ্বিন ১৩৪৩
৭. • বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১ — 'কার্যবিবরণী পুস্তক : বঙ্গীয় চতুর্দশ সাহিত্যসম্মিলন'। ৮ আষাঢ় ১৩৩০
৮. • বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২ — আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৪ শ্রাবণ ১৩৪৫
৯. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১ — তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মাঘ ১৮৪৪ শক (১৩৩০)
১০. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ২ — আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৬ আশ্বিন ১৩৩৪
১১. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৩ — তদেব। ১৩ আশ্বিন ১৩৩৯
১২. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৪ — তদেব। ১৩ আশ্বিন ১৩৩৯
১৩. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৫ — তদেব। ১৭ আশ্বিন ১৩৪১
১৪. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৬ — তদেব। ৫ আশ্বিন ১৩৪২
১৫. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৭ — তদেব। ১৭ আশ্বিন ১৩৪৩
১৬. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৮ — তদেব। ৫ আশ্বিন ১৩৪৫
১৭. • মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৯ — তদেব। ৫ ফাল্গুন ১৩৪৬
১৮. • সু-সীমো — প্রবাসী। পৌষ ১৩৩৫
১৯. • মদনমোহন মালব্য — আনন্দবাজার পত্রিকা। ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯
২০. • পোরে দেবৌদ — তদেব। ২৮ পৌষ ১৩৩৯
২১. • যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত — তদেব। ৯ শ্রাবণ ১৩৪০
২২. • বিঠলভাই প্যাটেল — তদেব। ১০ কার্তিক ১৩৪০
২৩. • হজরত মহম্মদ — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য়
২৪. • রামচন্দ্র শর্মা — আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯ ভাদ্র ১৩৪২
২৫. • রুডিয়ার্ড কিপলিং — তদেব। ৫ মাঘ ১৩৪২
২৬. • পঞ্চম জর্জ — তদেব। ৮ মাঘ ১৩৪২
২৭. • দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১ — তদেব। ৮ মাঘ ১৩৪২
২৮. • দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ — তদেব। ৯ পৌষ ১৩৪৩
২৯. • মুন্সী প্রেমচাঁদ — তদেব। ৩০ আশ্বিন ১৩৪৩
৩০. • মহম্মদ ইকবাল ১ — তদেব। ১ পৌষ ১৩৪৪
৩১. • মহম্মদ ইকবাল ২ — তদেব। ৯ বৈশাখ ১৩৪৫
৩২. • কামাল আতার্তুক — তদেব। ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
৩৩. • জগদীশচন্দ্র বসু — তদেব। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
৩৪. • ব্রজেন্দ্রনাথ শীল — তদেব। ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
৩৫. • ডবলিউ. বি. ইয়েটস্ — তদেব। ১৭ মাঘ ১৩৪৫
৩৬. • লর্ড ব্র্যাবোর্ন — তদেব। ১২ ফাল্গুন ১৩৪৫

৩৭. • ভাই সু — তদেব। ৪ মাঘ ১৩৪৬
৩৮. • তুলসীদাস — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪র্থ

১. ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫) মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পান ও এম. এ. পরীক্ষায় (১৮৬৯) সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ছাত্রজীবনে 'বিধবা বিবাহ' নাটকে অভিনয় করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত তিনি 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য 'কমিটি অব্ ফাইভ' -এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এখানে তিনি নাট্যশিক্ষকও ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি অসমবয়সী বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে। কৃষ্ণবিহারীর 'অশোকচরিত' গ্রন্থটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় লেখেন : 'গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।' কৃষ্ণবিহারী 'সাধনা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাঁহার লিখিত 'বুদ্ধচরিত' ইহাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ২৯ মে ১৮৯৫ তারিখে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে রবীন্দ্রনাথ এই শোকনিবন্ধ রচনা করেন। 'ভক্তবন্ধুদত্ত পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে' লিখিত ২০ ছত্রের যে-কবিতাটি এই রচনায় সংকলিত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া মনে হয় না।

২. ৯ মাঘ ১৩০৭ (২২ জানুয়ারি ১৯০১) তারিখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রানী 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিয়া ১১ মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজের সপ্ততিতম সাংবৎসরিক উৎসবের সায়ংকালীন অধিবেশনে 'প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া' পাঠ করেন। রচনাটি ফাল্গুন ১৮২২ শক (১৩০৭)-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও '"সাম্রাজ্যেশ্বরী' শিরোনামে ফাল্গুন ১৩০৭-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। দুইটি পাঠের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে, এখানে 'ভারতী' পত্রিকার পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। রচনাটির ইংরেজি অনুবাদ 'Prayers for the Late Queen-Empress at the Adi Brahmo Samaj' রচনার অন্তর্গত হইয়া জ্যৈষ্ঠ ১৮২৩ শক (১৩০৮)-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়। সম্ভবত ইহাই ইংরেজিতে অনূদিত কোনো রবীন্দ্ররচনার প্রথম প্রকাশ, অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয় নাই।

৩. ১০ মে ১৯০১ তারিখে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটুশনে বিজ্ঞানী ড. জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) 'The Response of Inorganic Matter to Mechanical and Electrical Stimulus' বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহার ফলে বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়। *Electrician* পত্রিকায় মুদ্রিত এই বক্তৃতার বিবরণ-সহ জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী অবলা বসু যে দুইটি পত্র (দ্র. ড. দিবাকর সেন -সম্পাদিত 'পত্রাবলী/আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু', পৃ. ৫৯-৬১, ১৭২), প্রেরণ করেন, সেগুলি পাইয়া রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লেখেন : 'ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি।... আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ।' এইদিনই তিনি অবলা বসুকে লিখিয়াছেন : 'আমার গর্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছি না— আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। এই জয়সংবাদ বাঙালি পাঠককে জানাইবার উদ্দেশ্যে তিনি বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করেন। এখানে যে 'বিদুষী ইংরাজ মহিলা'র উল্লেখ আছে, তিনি হইতেছেন সিস্টার নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)— তিনি ইংল্যান্ড হইতে রবীন্দ্রনাথকে যে-বিবরণ লিখিয়া পাঠান (পত্রটি রক্ষিত হয় নাই), তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধমধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। *Electrician* পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের ভাষণটি মুদ্রিত হয়। তাহা অবলম্বন করিয়া

রবীন্দ্রনাথ 'জড় কি সজীব?' ('বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ ১৩০৮) প্রবন্ধটি রচনা করেন।

৪. জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-সংখ্যা হইতে পৌষ-সংখ্যা পর্যন্ত 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 'জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী' ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হইতে থাকে। তাহারই ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 'পত্রপরিচয়'-শীর্ষক রচনাটি ২২ চৈত্র ১৩৩২ তারিখে লিখিয়া দেন। এই পত্রগুলি ড. দিবাকর সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'পত্রাবলী/ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' নামে বসু বিজ্ঞান মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৯৪)। রচনাশেষে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'যদি কোনোদিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়'— সবগুলি না হইলেও রবীন্দ্রনাথ-লিখিত কিছু পত্র পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলির প্রকাশ সমাপ্ত হইলে মাঘ-চৈত্র ১৯৩৩-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল, আরও-কিছু পত্র মুদ্রিত হয় ফাল্গুন ১৩৪৪ হইতে আষাঢ় ১৩৪৫ সংখ্যাগুলিতে। এগুলি পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫৭)।

৫. জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনাবসান হয় ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ তারিখে। ইহার পরে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি 'প্রবাসী'র পৌষ-১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রচনাটির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি রূপান্তর জানুয়ারি ১৯৩৮-সংখ্যা *The Modern Review* -তে মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধের শেষে টীকায় আছে, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের যাহা বলিয়াছিলেন উহা তাহারই অনুমোদিত অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

৬. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তরুণ শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের (জন্ম : ১৮৮২) অকালমৃত্যু ঘটে ১৮ মাঘ ১৩১০ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪) তারিখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়' প্রবন্ধটি লেখেন, সেটি চৈত্র ১৩১০-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। অতঃপর সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' (১৩১১) গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে তিনি শ্রাবণ ১৩১১-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ তাহার একটি 'সমালোচনা' লেখেন। পরে এই দুইটি রচনা মিলাইয়া তিনি 'সতীশচন্দ্র রায়'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন ও সেটি 'গদ্যগ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৩১৪) গ্রন্থের 'বন্ধুস্মৃতি' বিভাগে সংকলিত হয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর পরবর্তী সংস্করণে বিভাগটি বর্জিত হইয়াছিল। রচনাটি সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৭. দর্শনশাস্ত্রের বিশিষ্ট অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬) রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার কলেজের চাকরি ত্যাগ করিয়া স্বল্পবেতনে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' নয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৩১০)। স্বাস্থ্যের কারণে মোহিতচন্দ্র দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কাজ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ (৯ জুন ১৯০৬) তারিখে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিলে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুবিয়োগে একটি শোক-প্রবন্ধ লেখেন ও সেটি শ্রাবণ ১৩১৩ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ মুদ্রিত ও 'গদ্যগ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'বন্ধুস্মৃতি' বিভাগে সংকলিত হয়। ২য় সংস্করণ 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-তে এই বিভাগটি বর্জিত হইয়াছিল।

৮. 'মানসী' পত্রিকার আষাঢ় ১৩১৭-সংখ্যায় রমেশচন্দ্র-প্রাসঙ্গিক পত্রটির প্রকাশকালে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল : 'চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, গৌরহরিবাবুর অনুমতি অনুসারে তাহা প্রকাশিত হইল।'

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ রচনাটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

৯. রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম পরিচালক বহু গ্রন্থের লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

৫ ভাদ্র ১৩২১ তারিখে পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিলে উক্ত দিবসে পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক বিরাট সান্ধ্যসম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তিনি এই উপলক্ষে স্বহস্তে একটি অভিনন্দনপত্র রচনা করিয়া কোনো শিল্পীর দ্বারা অলংকৃত করাইয়াছিলেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩২২) লিখিত হইয়াছে : 'এই উপলক্ষ্যে বোলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পাদরী এন্ড্রু সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়াছিলেন।... শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রবাবুকে চন্দন দান করিয়া নিজের লিখিত নিম্নোক্ত অভিনন্দন-পত্র পড়িয়া শোনান।... এই অভিনন্দন-পত্রখানি কার্ডের ন্যায় কাগজে নানা রঙ্গীন লতাপাতার ছবি দ্বারা সজ্জিত এবং রচনাটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত; ইহার অপর পৃষ্ঠাতেও রঙ্গীন আলিম্পনের মধ্যে বেদের একটি আশীর্ব্বাচন-মন্ত্র লেখা আছে। এই কাগজের অভিনন্দনখানি চিত্র-সৌন্দর্য্যে মনোরম ও সুদৃশ্য হইয়াছিল।' 'ভারতী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় অভিনন্দনপত্রখানি ব্লক করিয়া মুদ্রিত হয়।

১০. রামেন্দ্রসুন্দরের অগ্রজ মামাতো ভাই আশুতোষ বাজপেয়ী তাঁহাকে আত্মস্মৃতি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনিই একটি নাতিদীর্ঘ জীবনী রচনা করেন ও রবীন্দ্রনাথ ২৮ ফাল্গুন ১৩২৪ তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হইয়াছিল; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স হইতে চৈত্র ১৩৩১-এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১১. বরিশালের লাখুটিয়ার জমিদার এবং কবি-সাহিত্যিক দেবকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৬-১৯২৯) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্থানীয়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতুল। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) স্নেহধন্য দেবকুমার 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নামে তাঁহার একটি জীবনী প্রণয়ন করিয়া তাহার ভূমিকা লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিলে তিনি বর্তমান রচনাটি লিখিয়া দেন। রচনাটি ১২ ভাদ্র ১৩২৪ তারিখে লিখিত 'ভূমিকা'-র অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেবকুমার লেখেন : 'একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত মহাকবি রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সদ্‌ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল। বিশেষ, দ্বিজেন্দ্রলালের দিব্যপ্রতিভা ও দুর্লভ জীবন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, এমন শক্তিমান পুরুষ বর্তমান বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথের তুল্য আর বড়ো-বেশি যে কেহ আছেন, আমি মনে করি না। এই কারণে, এ গ্রন্থের একটা ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ার জন্য আমি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তদনুসারে অতি সংক্ষেপে আমাকে যেটুকু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সকৃতজ্ঞ অন্তরে তাহাই এখন আমি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।'

১২. 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদ (মুলু) স্বল্পকালের জন্য শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে ভর্তি হন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না; কিন্তু রুগ্‌ণ শরীরেও মুলু আশ্রমজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন; ভুবনডাঙায় একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পুরানো সংবাদপত্র বিক্রয়ের অর্থে তিনি দরিদ্র বালকদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না, অল্প কয়েকদিনের জ্বরে কলিকাতায় তাঁহার জীবনাবসান হয় ১৯ ভাদ্র ১৩২৬ তারিখে। ৪ আশ্বিন তাঁহার শ্রাদ্ধদিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে বিশেষ উপাসনা করেন ও রামানন্দের অনুরোধে সেটি লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া লেখেন : 'মুলুর শ্রাদ্ধদিনের উপাসনা উপলক্ষ্যে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহার সারমর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদি কোনোরূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন ত করিবেন। ইহার কাপি আমার কাছে নাই। অতএব প্রয়োজন অতীত হইলে ইহা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন— অগ্রহায়ণের শান্তিনিকেতনে ছাপিব।' রচনাটি অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্বেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ব-কৌমুদী' ১৬ কার্তিক ১৮৪১ শক (১৩২৬)-সংখ্যায় উহা ছাপাইয়া দেয়। রচনাটি পরেও নানা স্থানে নানা ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকদের রচনার

একটি সংকলন 'প্রসাদ' নামে প্রকাশ করিতে আগ্রহী হইয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৬ মাঘ ১৩২৬ তারিখে লেখেন : 'মুলুর সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা ও কালীমোহনের লেখাটি পুস্তিকায় গ্রহণ করিবেন।... আমি এই সঙ্গে একটি লেখা পাঠাইতেছি ইহা আপনার পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে পারেন।' উক্ত লেখাটি 'ছাত্র মুলু' নামে 'প্রসাদ' [১৩২৬] পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়।

১৪. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) মৃত্যু হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ (১৩ আশ্বিন ১৩২৬) তারিখে। ইহার মাসখানেক পরে আসামের গৌহাটি শহরের ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রাঙ্গণে ১৬ কার্তিক শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, বর্তমান রচনাটি তাহারই লিখিত রূপ।

১৫. ১৭ শ্রাবণ ১৩২৯ তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন, বর্তমান রচনাটি তাহার প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কৃত অনুলেখন।

১৬. রচনাটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন : 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস মেদিনীপুর স্মৃতিরক্ষা-সমিতির পক্ষে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী তিনখণ্ডে প্রকাশ করিতেছিল; প্রথম খণ্ড (সাহিত্য) দেখিয়া তিনি [রবীন্দ্রনাথ] স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন।' ইহার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে রচনাটি প্রকাশ করিয়াছেন। দ্র. 'সাহিত্যের পূর্বসূরী প্রণাম', শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৬। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা-শাসক বিনয়রঞ্জন সেনকে লেখেন : 'বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে প্রকাশিত "বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী"র প্রথম খণ্ড পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁরই বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা। অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব যাঁর চরিত্রে দীপ্তমান হয়ে দেশকে সমুজ্জ্বল করেছিল, যিনি বিধিদত্ত সম্মান পূর্ণভাবে নিজের অন্তরে লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তবে তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে। এই অগৌরব থেকে বিস্মৃতিপরায়ণ বাঙালিকে রক্ষা করবার জন্যে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের সকলকে সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দিই।'

১৭. ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণটি পাঠ করেন। রচনাটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র (১ পৌষ ১৩৪৬) প্রতিবেদনের সহিত ও পৌষ ১৩৪৬-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দির' শিরোনামে মুদ্রিত হয়, শেষোক্ত পাঠে রচনার তারিখ পাওয়া যায় ২৮ নভেম্বর ১৯৩৯। এই উপলক্ষে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বর্তমান খণ্ডের 'কবিতা' অংশে সংকলিত হইয়াছে।

১৮. দীর্ঘ রোগভোগের পরে রসসাহিত্য-প্রণেতা সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) অকালমৃত্যু ঘটে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ (২৪ ভাদ্র ১৩৩০) তারিখে। তাঁর স্মরণে শান্তিনিকেতনের উপাসনা-মন্দিরে ২৬ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ উপাসনা করেন, বর্তমান রচনাটি তাহারই লিখিত রূপ।

১৯. সুকুমার রায় -রচিত 'পাগলা দাশু' [প্রথম প্রকাশ : ? ১৯৪০] গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ২ জুন ১৯৪০ তারিখে এই রচনাটি লেখেন ও এটি তাঁহার হস্তাক্ষরেই মুদ্রিত হয়।

২০. য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পথে ইটালিতে ট্রেন-দুর্ঘটনায় আহত হইয়া উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সনের মৃত্যু হয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখে। কার্তিক ১৩৩০-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এর 'আশ্রম সংবাদ'-এ লেখা হয় : 'শ্রদ্ধাস্পদ পিয়ার্সন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ কি করা হইবে সে বিষয়ে নির্ধারণ করিবার জন্য কলাভবনে একটি সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে হাসপাতালের উন্নতিসাধন করা মিঃ পিয়ার্সনের অত্যন্ত প্রিয়

চিন্তা ছিল। তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামে ইংরাজিতে যে বই লিখিয়াছেন তাহার লভ্যাংশ এই হাসপাতালের সাহায্যকল্পে দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি বিদেশ হইতে মাঝে মাঝে হাসপাতাল ফন্ডে সাময়িক দানও পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সেই টাকায় হাসপাতালের নানারকম সংস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় হাসপাতালের উন্নতি করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য শ্রীযুক্ত এন্ড্রুজ সাহেব সকলকে জানাইলেন যে মিঃ পিয়ার্সনের নামে এখানে একটি চিকিৎসালয় খোলা হইবে। ইহার এক অংশে গরীব গ্রামবাসীদিগকে বিনাপয়সায় ঔষধ দান ও চিকিৎসা করা হইবে। পূজনীয় গুরুদেবও এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন।' বর্তমান রচনাটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন এই হাসপাতালের উন্নতিকল্পে সাধারণের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া। 'প্রবাসী'তে মুদ্রণের পূর্বেই ১৭ কার্তিক ১৩৩০ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'পরলোকগত পিয়ার্সন সাহেব' শিরোনামে রচনাটি প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতীর অর্থসচিবের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে।

২১. মাঘ ১৩৩০-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এর 'আশ্রম সংবাদ'-এ লেখা হয় : '৯ই পৌষ [১৩৩০] আশ্রমের মৃত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধবাসর ও খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা হয়। পূজনীয় গুরুদেব আচার্যের আসন হইতে একটি অতি সুন্দর মর্মস্পর্শী উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমবন্ধু স্বর্গীয় পিয়ার্সন সাহেবের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেন।' বর্তমান রচনাটি তাহারই লিখিত রূপ।

২২. মনীষী রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র ও ডা. কৃষ্ণধন ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন ঘোষ (১৮৬৯-১৯২৪) বাল্যকালাবধি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেন। সেখানেই তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখিতে শুরু করেন ও সহপাঠী কবিবন্ধুদের সহিত একত্রে একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশ করিয়া কবি হিসাবে স্বীকৃতি পান। সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়া তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দেশে ফেরেন। দীর্ঘকাল তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ৯ মার্চ ১৯২৪ তারিখে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁহার অকালপ্রয়াণে শোকজ্ঞাপনের জন্য একটি সভা হয়। সেখানে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন, বর্তমান রচনাটি তাহার অনুলেখন। সাহিত্য আকাদেমি -প্রকাশিত মনোমোহন ঘোষের *Selected Poems* (1974) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ভাষণটির সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত -কৃত ইংরেজি অনুবাদ সংযোজিত হইয়াছে।

২৩. ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) পত্নী সরোজনলিনীর (১৮৮৭-১৯২৪) মৃত্যুর পর 'সরোজ-নলিনী' নামে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (১৯২৬)। গুরুসদয় যখন বীরভূমের জেলাশাসক ছিলেন, তখন তিনি কয়েকবারই পত্নীকে লইয়া শান্তিনিকেতনে গিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের গ্রামসেবামূলক কাজকর্মে সহায়তা করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পত্নীর জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়া গুরুসদয় রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি 'ভূমিকা' প্রার্থনা করিলে তিনি ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ তারিখে যাহা লিখিয়া দেন তাহা তাঁহার হস্তলিপিচিত্রাকারে মুদ্রিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে A Woman of India নামে ইংল্যান্ড হইতে গ্রন্থটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি অনূদিত হইয়া উহাতে যুক্ত হইয়াছে।

২৪. নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পাখোয়াজ-বাজানোয় তাঁহার দক্ষতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের গান ও আবৃত্তির সহিত তাঁহার পাখোয়াজ-সংগতের বর্ণনা অনেকের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। 'মানসী ও মর্মবাণী' মাসিকপত্রের তিনি অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। ৫ জানুয়ারি ১৯২৬ তারিখে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিলে রবীন্দ্রনাথ ইহাতে মুদ্রণের জন্য বর্তমান রচনাটি লিখিয়া দেন।

২৫. লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (১৮৬৩-১৯২৮) শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী রায়পুরের জমিদার-পরিবারের সন্তান। ব্যারিস্টার হিসাবে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া তিনি বহু

সরকারি পদ অলংকৃত করেন ও পরিশেষে 'লর্ড' উপাধি লাভ করিয়া সহকারী ভারতসচিবরূপে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আসন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে গিয়া সহকারী ভারতসচিব লর্ড সিংহকে বহুভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। ডিসেম্বর ১৯২৫-এ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পরিদর্শনে গিয়া লর্ড সিংহ দশ হাজার টাকা দান করেন; তাঁহার প্রদত্ত অর্থে 'সিংহ-সদন' নামক সুরম্য গৃহটি নির্মিত হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপভ্রমণের সময়ে তিনি তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন ও একই সঙ্গে অনেকগুলি নগর পরিক্রমা করেন। ৪ মার্চ ১৯২৮ কলিকাতায় লর্ড সিংহের জীবনাবসান হইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শ্রাদ্ধসভায় যোগ দিয়াছিলেন। শোক-প্রবন্ধটি রচনার তারিখ ৭ চৈত্র ১৩৩৪ (২০ মার্চ ১৯২৮)।

২৬. বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা গুপ্ত (১৯০৪-৩১) বা বুলা বাল্যাবধি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। ইঁহার 'বাতায়ন' (১৩৩৭) কাব্যগ্রন্থটির 'ভূমিকা' লিখিয়াছিলেন তিনি। প্ল্যানচেটের আসরে তিনি ভালো 'মিডিয়াম' হইতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার তাঁহার সহায়তায় পরলোকচর্চা করিয়াছিলেন, ইঁহার হস্ত-ধৃত পেনসিলে রবীন্দ্রনাথের অনেক আত্মীয়-বন্ধু-ভক্তের অশরীরী আত্মার আশ্চর্য কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইনি দীর্ঘজীবী হন নাই। তাঁহার অকালবিয়োগের পর বর্তমান রচনাটি তাঁহার শ্রাদ্ধসভায় পাঠ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ অমলচন্দ্র হোমকে প্রেরণ করেন।

২৭. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিবার্ট লেকচার' দিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ হইতে ২৮ মে ১৯২৮ 'শান্তিলি' জাহাজে আরোহণ করেন ও পরদিন ২৯ মে পন্ডিচেরি বন্দরে জাহাজ পৌঁছিলে তিনি ক্রেনের সাহায্যে ভূমিতে অবতরণ করিয়া পন্ডিচেরি আশ্রমে গিয়া অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ, ১৮৭২-১৯৫০) -এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা এই রচনায় ব্যক্ত হইয়াছে।

২৮. কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইবার জন্য য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ৩১ ভাদ্র ১৩৩৫ (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৮) একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে আশীর্বাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী পাঠ করেন।

২৯. ২৭ শ্রাবণ ১৩৩৮ তারিখে লিখিত রচনাটি আশ্বিন ১৩৩৮-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইলে তাহার পাদটীকায় জানানো হয় : 'এই প্রবন্ধটি প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অনুরোধে লেখা এবং তাঁহারা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার আসন্ন জন্মদিনে যে পুস্তকখানি বাহির করিতেছেন তাহাতে প্রকাশিত হইবে।'

৩০. শরৎচন্দ্রের একষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য 'রবিবাসর'-এর উদ্যোগে ১১ আশ্বিন ১৩৪৩ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) একটি সভা হয়। 'রবিবাসর'-এর তৎকালীন 'অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইলে তিনি জানান, ২৫ আশ্বিন রবিবারে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজিত হইলে 'রবীন্দ্রের সমাগম অসম্ভব হবে না।' ১১ আশ্বিনের উৎসবের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাই উক্ত তারিখেই শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজ হলে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ২২ আশ্বিন কলিকাতায় যান ও পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৫ আশ্বিন ১৩৪৩ (১১ অক্টোবর ১৯৩৬) রবিবার 'রবিবাসর'-এর সভায় উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানটির প্রতিবেদনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (২৭ আশ্বিন) লেখে : 'গত ২৫ আশ্বিন রবিবার পূর্বাহ্ণে শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের বেলিয়াঘাটার "প্রফুল্ল কাননে" রবিবাসরের বার্ষিক উদ্যানসম্মিলন হইয়া গিয়াছে।... রবিবাসরের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাড়ে দশটার পর উপস্থিত হইলে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন।... রবিবাসরের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায়

কবি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া একটি বাণী পাঠ করেন।' রচনাটি অগ্রহায়ণ ১৩৩৬-সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'শরৎচন্দ্রের প্রতি' শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

৩১. মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২৯) কাশিমবাজারের রাজবাহাদুর কৃষ্ণনাথ রায়ের ভাগিনেয় ছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় কৃষ্ণনাথের মৃত্যু হইলে মণীন্দ্রচন্দ্র ৩০ মে ১৮৯৮ তারিখে মাতুলের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া মহারাজা উপাধি লাভ করেন। তিনি দানশীল ছিলেন, শিক্ষাবিস্তারে ও অন্যান্য সৎকর্মে তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে সরকারি উৎপীড়নে বরিশালে প্রথম প্রাদেশিক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পণ্ড হইলে তাঁহারই আহ্বানে ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাশিমবাজারে এই সম্মেলন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হইল। এই বৎসরই মহারাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করিবার জন্য আপার সার্কুলার রোডের উপর সাত কাঠা জমি দান করেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন। পরে রমেশ ভবন নির্মাণের জন্য তিনি পরিষদগৃহের সংলগ্ন আরও সাত কাঠা জমি দান করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংস্কৃতাধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে একটি বাংলা অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সংকলন করিতে উদ্যোগী হইয়া অর্থকষ্টের সম্মুখীন হইলে রবীন্দ্রনাথ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকটে তাঁহার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। মণীন্দ্রচন্দ্র হরিচরণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হন। দীর্ঘ তেরো বৎসর তিনি এই দানসাহায্য অব্যাহত রাখেন ও প্রধানত তাঁহারই অর্থানুকূল্যে ১৩৩০ সালে উক্ত বিশাল অভিধান রচনা সমাপ্ত হয়। ২৫ কার্তিক ১৩৩৬ (১১ নভেম্বর ১৯২৯) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনাবসান হইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে পত্রিকাটির 'মণীন্দ্র-স্মৃতি-সংখ্যা'র (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলিটি লিখিয়া দেন।

৩২. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের ইতিহাস বহুবিস্তৃত। ১৭ নভেম্বর ১৯৩১ তারিখে হরপ্রসাদের জীবনাবসান ঘটিলে ৬ ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উদ্যোক্তাগণের নিকট প্রেরণ করেন ও ড. যদুনাথ সরকার সেটি সভাস্থলে পাঠ করেন। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি সভার পরের দিন অর্থাৎ ২১ অগ্রহায়ণ (৭ ডিসেম্বর) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ও 'নানা কথা'র অন্তর্গত হইয়া পৌষ ১৩৩৮-সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় মুদ্রিত হয়। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রভবনে রচনাটির একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

৩৩. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রভবনে তাহার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে; যতদূর জানা যায়, সম্পূর্ণ রচনাটি সেই সময়ে মুদ্রিত হয় নাই; সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ -সম্পাদিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ' (আষাঢ় ১৩৯৫)-তে ইহা প্রথম সংকলিত হয়। বর্তমান খণ্ডে এই পাঠটিই মুদ্রিত হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা' নাম দিয়া একটি গ্রন্থধারার সূচনা করে, তাহার প্রথম খণ্ডটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জীবৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ লাহা-র সম্পাদনায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত রচনাটির কিয়দংশ ও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধটির কিয়দংশ মিলাইয়া এবং শেষ অনুচ্ছেদটি নূতন করিয়া লিখিয়া 'ভূমিকা'র পাঠটি 'নির্মাণ' করেন। শেষ অনুচ্ছেটি এখানে উদ্ধৃত হইল :

'শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ উপলক্ষে বিশিষ্ট লোকগণের নিকট থেকে ভারত-তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে লেখমালা-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবিতকালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বার হয়েছিল। তাঁর পরলোক গমনের প্রায় এক বৎসর পরে এখন এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই সাধু

কার্যের দ্বারা পরিষৎ যে আদর্শ দেখালেন, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তা সার্থক হোক।'

৩৪. বিশিষ্ট রসায়নবিদ্‌ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (১৮৬১-১৯৪৪) সহিত বিভিন্নক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী ছিলেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩২ কলিকাতা টাউন হলে আচার্য রায়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন ও ২২ অগস্ট ১৯৩২ তারিখে রচিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। ১৩ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ইহা মুদ্রিত করিয়া সংবাদ দেয় :

'জয়ন্তী কমিটির পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্রখানি একটি কারুকার্যখচিত সুন্দর চর্মপেটিকার আধারে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত চর্মপেটিকার কারু-শিল্প বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু -কর্তৃক পরিকল্পিত এবং কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী -কর্তৃক অঙ্কিত। ইহার সমস্ত ব্যয় রবীন্দ্রনাথ বহন করিয়াছেন।...

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ *Mahatmaji and the Depressed Humanity* আচার্য রায়কে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছে। বইখানি কারুকার্যশোভিত একটি সুন্দর চর্মাধারে আচ্ছাদিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ উপহার দিয়াছেন।

'রবীন্দ্রনাথ আচার্য রায়কে আশীর্বাদস্বরূপ দুই ছত্র কবিতা একটি সুন্দর তাম্রফলকে খোদিত করাইয়া দিয়াছেন। তাম্রফলকটি মোরাদাবাদে পরিকল্পিত ও প্রস্তুত। কবিতাটি এই :—

"প্রেম রসায়নে, ওগো সর্বজনপ্রিয়,
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।"

—বর্তমান খণ্ডে 'কবিতা' অংশেও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৩৫. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৪-১৯২৪) সহিত বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূত্রে রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। আশুতোষের পুত্র রমাপ্রসাদ পিতার কয়েকটি বাংলা রচনা সংকলন করিয়া 'জাতীয় সাহিত্য' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৩২ সালে। তাঁহার অনুরোধে গ্রন্থটির ভূমিকা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান রচনাটি প্রণয়ন করেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ইহার খসড়ায় তারিখ পাওয়া যায় ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ (২৫ ভাদ্র ১৩৩৯)।

৩৬. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম প্রথম মারাঠি ছাত্র শ্যামকান্ত সরদেশাই (১৯০০-২৫) ১৯১২ সালে পৌষ-উৎসবের সময়ে ভর্তি হন ও ১৯১৬ সালে কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রম ত্যাগ করেন। ড. যদুনাথ সরকারের অনুরোধে তাঁহার পিতা গোবিন্দ সরদেশাই যদুনাথের মাধ্যমেই পুত্রকে এখানে ভর্তি করাইয়া দেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা শিখিয়া শ্যামকান্ত মহারাষ্ট্রের জীবনযাত্রা ও ইতিহাস লইয়া বহু রচনা লেখেন ও সেগুলি বিদ্যালয়ের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়। জার্মানিতে বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন, কিন্তু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া সেখানেই তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে তিনি পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে যে চিঠিগুলি লিখিতেন, সেগুলি সমকালীন আশ্রমজীবন ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অত্যন্ত মূল্যবান। মারাঠি ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত এই পত্রগুলি এবং পরে পুনার ফার্গুসন কলেজ ও বিদেশ হইতে লিখিত পত্রাবলি তাঁহার পিতা 'শ্যামকান্তচী পত্রেঁ' (১৯৩৪) গ্রন্থে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির জন্য বাংলায় একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন ১১ জুন ১৯৩৩ তারিখে। তাঁহার হস্তাক্ষরের লিপিচিত্র ও তাহার মারাঠি অনুবাদ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

৩৭. রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬) ছিলেন 'সাত সমুদ্রের নাবিক'— বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি ও ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অবাধ অধিকার ছিল। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁহার ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। অষ্টম খণ্ড 'চিঠিপত্র' (১৩৭০) গ্রন্থে উভয়ের পত্রাবলিতে এই সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ

যত পড়িয়াছিলেন, তত লিখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে পুত্র প্রমোদনাথ সেন পিতার রচনাগুলি একত্রিত করিয়া 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' (১৩৪০) নামে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির 'মুখবন্ধ' হিসাবে বর্তমান রচনাটি লিখিয়া দেন ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ তারিখে।

৩৮. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম শিক্ষকদের অন্যতম জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচয়িতা হিসাবে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে প্রথমে শিলাইদহের জমিদারি-কাছারির কর্মচারী এবং পরে পুত্র রথীন্দ্রনাথের অঙ্ক-শিক্ষক ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কাজ করিয়া জগদানন্দ অবসর গ্রহণ করেন। ২৫ জুন ১৯৩৩ তারিখে শান্তিনিকেতনে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিলে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। 'পরলোকগত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা' পাদটীকা-সহ তাঁহার ভাষণটি 'জগদানন্দ রায়' নামে ভাদ্র ১৩৪০-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩৯. উদয়শঙ্কর (১৯০০-৭৭), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী; পিতা উদয়পুরে ঝালোয়ার রাজার দেওয়ান শ্যামশঙ্কর। উদয়শঙ্কর বোম্বাইয়ের জে. জে. স্কুল অব্ আর্ট এবং লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব্ আর্টস্-এ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ উইলিয়াম রোটেনস্টাইন রুশ নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলে আনা-র অনুরোধে তিনি 'হিন্দু বিবাহ' ও 'রাধাকৃষ্ণ' নামক দুইটি নৃত্য-পরিকল্পনা করিয়া দেন ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। এইভাবে উদয়শঙ্করের নৃত্যশিল্পী-জীবনের সূচনা হয়। নৃত্যকলায় তাঁহার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকিলেও কল্পনাশক্তি ও সহজাত নৈপুণ্যে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। য়ুরোপ ও আমেরিকায় বিপুল জনসমাদর লাভ করিয়া তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নাচের দল লইয়া ভারতে আসেন। ৬ জুলাই ১৯৩৩ (২২ আষাঢ় ১৩৪০) কলিকাতায় ম্যাডান প্যালেস ভ্যারাইটিসে রবীন্দ্রনাথ উদয়শঙ্কর ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে উদয়শঙ্কর বলেন, আনা পাভলোভা, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নাচ দেখাইবার ইচ্ছা ছিল— পাভলোভার মৃত্যু ও গান্ধীজির কর্মব্যস্ততার জন্য তাঁহার দুইটি ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তৃতীয়টি আজ সফল হইবে। ৭ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে : 'নৃত্যোৎসব সম্পন্ন হইবার পর কবিবর উদয়শঙ্করকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলেন,— "নটরাজ শঙ্কর প্রাচীন ভারতের রসধারার উৎস— আমি আশা করি আমাদের এই শঙ্কর (উদয়শঙ্কর) হইতে সেই বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় প্রাচীন রস বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হইবে।" ইহার পর তাঁহারই আহ্বানে উদয়শঙ্কর তাঁহার সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে লইয়া ১২ জুলাই (২৮ আষাঢ়) শান্তিনিকেতনে আসিয়া নৃত্য পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাকে আশীর্বাদ জানান। তিনি আশীর্বাণীটি লিখিয়া দেন ও সেটি ভাদ্র ১৩৪০-সংখ্যা 'প্রবাসী'র 'বিবিধ প্রসঙ্গ'তে 'নৃত্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। ইহার ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ তারিখ-চিহ্নিত রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত খসড়াটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রচনাটির রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত টাইপ-করা ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপিও রক্ষিত হইয়াছে। ঈষৎ পাঠান্তরে রচনাটি সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-সংখ্যা *Visva-Bharati News*-এ মুদ্রিত হয় :

Udaysankar! You have made the art of dancing your life's companion. Through it you have won the laurels of the West. Now you are back home after a long absence. Your motherland has kept ready for you her love and her blessings, and the poet of Bengal offers them on her behalf.

Before you bid good-bye to the *Ashrama* there is one thing I would like to

tell you. There are no bounds to the depth or to the expansion of any art which, like dancing, is the expression of life's urge. We must never shut it within the bounds of a stagnant idea, nor define it as either Indian or oriental or occidental, for us finality only robs it of life's privilege which is freedom. You have earned for yourself rich praise from the connoisseurs of the art in many different lands and yet I know you feel it deep within your heart that the path to the realisation of your dream stretches long before you where new inspirations wait for you and where you must create in a limitless field new forms of living beauty. Genius is defined in our language as power that unfolds ever-new possibilities in the revelation of beauty and truth. It is because we are sure of your genius that we hope your creations will not be a mere imitation of the past nor burdened with narrow conventions of provincialism. Greatness in all its different manifestations has discontent for its guide in the path to victory where there are triumphant arches, but never to stop at, merely to pass through.

There was a time when in the heart of our country, the flow of dance followed a buoyant life. Through passage of time that is nearly choked up leaving us bereft of the spontaneous language of joy, and exposing stagnant pools of muddy impurities. In an unfortunate country where life's vigour has waned dancing vitiates into a catering for a diseased mind that has lost its normal appetites even as we find in the dance of our professional dancing girls. It is for you to give it health, strength and richness. The spring breeze coaxes the spirit of the woodlands into multifarious forms of exuberant expression. Let your dancing too wake up that spirit of spring in this cheerless land of ours; let her latent power of true enjoyment manifest itself in language of hope and beauty.

৪০. রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী শিবানন্দের (১৮৫৩-১৯৩৪) পূর্বাশ্রমের নাম তারকনাথ ঘোষাল। ১৯২২ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি হন। তাঁহার জীবনাবসানে শোকপ্রকাশের জন্য কলিকাতায় যে জনসভা হয়, সেখানে পাঠ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই বাণী পাঠাইয়া দেন। রচনার তারিখ : দোল পূর্ণিমা ১৩৪০ (৯ মার্চ ১৯৩৪)।

৪১. বিশিষ্ট শিল্পী নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬)। উল্লেখ্য, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় 'আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত' কর্মীদের পরিচয়দান প্রসঙ্গে নন্দলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন : 'ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে শোকে অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।' বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার তারিখ জানা যায় ৭ মার্চ ১৯৩৪ (২৩ ফাল্গুন ১৩৪০) নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্র হইতে : 'মধ্যাহ্নভোজনের পরে এই চিঠি লিখতে হয়েছিল, নন্দলালের সম্বন্ধে।'

৪২. ব্রিটিশ ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে পরিচিত বালুচিস্তানের কংগ্রেস নেতা খান আবদুল গফ্‌ফর খান (১৮৯১-১৯৮৮) 'সীমান্ত গান্ধী' নামে খ্যাত ছিলেন। নিজের কর্মস্থল পেশোয়ারে তিনি 'খুদা-ই-খিদমৎগার' বা ঈশ্বরের সেবক নামে গান্ধীবাদী অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ৩১ অগস্ট ১৯৩৪ তারিখে শান্তিনিকেতনে আগমন করিলে বিশ্বভারতীর ছাত্র-শিক্ষকদের সভায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রাচ্য প্রথায় আন্তরিক সংবর্ধনা জানাইয়া বলেন, আবদুল গফ্‌ফর খান জেলে থাকিবার সময়ে তাঁহার পুত্র ওয়ালি খানকে শিক্ষার নিমিত্ত শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করিয়া বিশ্বভারতীর প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর তাঁহার শান্তিনিকেতন পরিত্যাগের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জানাইয়া যাহা বলেন, তাহা তিনি স্বহস্তে লিপিবদ্ধও করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি এবং ইংরেজি ও উর্দু অনুবাদ পরবর্তীকালে একটি অনুষ্ঠানপত্রীতে (১৯৬৯) মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪৩. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র। ইনি অত্যন্ত সুকণ্ঠ ছিলেন ও গানের স্বরলিপি-রচনায় তাঁহার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। ফলে রবীন্দ্রসংগীতের সুর-সংরক্ষণে তাঁহার ভূমিকা অগ্রগণ্য। অমায়িক স্বভাবের দিনেন্দ্রনাথ অভিনয়েও কুশলী ছিলেন। ফলে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর অভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠানে দিনেন্দ্রনাথের সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান ও সেখানেই ২১ জুলাই ১৯৩৫ তারিখে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আশ্রমে পৌঁছাইলে ৫ শ্রাবণ ১৩৪২ (২২ জুলাই) মন্দিরে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দেন, সেইটিই 'দিনেন্দ্রনাথ' নামে ভাদ্র ১৩৪২-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়।

৪৪. দিনেন্দ্রনাথের রচিত গান ও তাহাদের স্বরলিপি, কবিতা, প্রবন্ধ, আশীর্বাণী ও শুভেচ্ছা এবং দিনেন্দ্র-স্মরণে রচিত বিভিন্ন ব্যক্তির কিছু লেখা একত্রিত করিয়া তাঁহার পত্নী কমলা দেবী 'দিনেন্দ্র রচনাবলী' নামে ১৩৪৩ সালে প্রকাশ করেন। ১ ভাদ্র ১৩৪৩ রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির যে 'ভূমিকা' লেখেন, তাহাই এখানে সংকলিত হইয়াছে।

৪৫. জওহরলাল নেহরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) পত্নী কমলা নেহরু (১৮৯৯-১৯৩৬) যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া জেনেভা শহরে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ জওহরলালকে টেলিগ্রামে শোকজ্ঞাপন করেন : 'Please accept my heartful condolence. She shared you heroism in her life and in her death she lives as the undying glory of that heroism.' ১১ মার্চ কমলা নেহরুর শ্রাদ্ধবাসরে মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা করিবার কথা ছিল, কিন্তু ওইদিন কলিকাতায় তাঁহার কাজ থাকায় তিনি ৮ মার্চ আশ্রমে 'কমলা দিবস' পালন উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা করেন। ক্ষিতীশ রায় তাঁহার ভাষণের অনুলেখন লইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণ রচনাটিই সংশোধন ও পুনর্লিখন করেন। ইহার পাণ্ডুলিপিটি 'ঋতুরাজ জওহরলাল' নামে মুদ্রিত হইয়াছে শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১ সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য়। উল্লেখ্য, এইরূপ নামকরণ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না, তাঁহার হস্তলিপি হইতে শব্দগুচ্ছটি স্বতন্ত্রভাবে ব্লক করিয়া রচনাশীর্ষে ব্যবহার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'মরণসাগরপারে তোমরা অমর' গানটিও রচনা করিয়াছিলেন।

৪৬. বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নিতাইবিনোদ গোস্বামীর মাতৃহীন একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর শৈশব হইতে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাভবনে আই. এ. পড়িবার সময়ে স্বল্পকালীন রোগভোগের পরে ১৪ অগস্ট ১৯৩৭ রাত্রে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ১৫ অগস্ট আশ্রমে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইয়াছিল, এই দুঃসংবাদে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ৮ ভাদ্র (২৪ অগস্ট) সিংহসদনে বীরেশ্বরের শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিচারণ করেন। রচনাটির অমিয় চক্রবর্তী -কৃত ও রবীন্দ্রনাথ-অনুমোদিত ইংরেজি অনুবাদ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭-সংখ্যা *The Visva-Bharati News*-এ মুদ্রিত হয়।

৪৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)-সংক্রান্ত রচনাটি রবীন্দ্রনাথ ১৮ জুন ১৯৩৮ (৩ আষাঢ় ১৩৪৫) তারিখে কালিম্পঙে লিখিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের কর্মী কিশোরীমোহন সাঁতরাকে পাঠাইয়া লেখেন : 'যুগান্তর কাগজের প্রার্থনা পূর্ণ করে এই লেখাটা পাঠালুম।

তোমার প্রস্তাব অনুসারে তোমাকে এই দানের মধ্যস্থ করে নেওয়া গেল।' সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মদিবসে (২৬ জুন ১৯৩৮ : ১১ আষাঢ় ১৩৪৫) ইহা 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

৪৮. বিশ্বভারতীর ইসলামিক বিভাগের অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দিন (?১৯০৩-৩৮) অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কলেজ ত্যাগ করিয়া বিশ্বভারতীতে ভর্তি হন ও রুশ পণ্ডিত বগদানভের নিকট ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন। ইহার পরে কিছুকাল কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর তিনি বিশ্বভারতীর ইসলামিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্বগৃহ অমৃতসরে গিয়া ৩ জুলাই ১৯৩৮ টাইফয়েড রোগে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কালিম্পঙ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া ৮ জুলাই ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের নিকট জিয়াউদ্দিনের স্মৃতিচারণ করেন। একই দিনে তিনি 'মৌলানা জিয়াউদ্দিন' নামে একটি কবিতাও লেখেন (দ্র 'নবজাতক')।

৪৯. বিখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) ঠাকুরপরিবারের আত্মীয় ছিলেন, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ২৬ মার্চ ১৯৩৮ তাঁহার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ৩০ অগস্ট ১৯৩৮ তারিখে লিখিত রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্যের একটি প্রতিলিপি হইতে জানা যায়, ইহা আসামের যোড়হাটের কমলেশ্বর চালিহাকে প্রেরিত হইয়াছিল। মূল রচনাটির লিপিচিত্র মে ১৯৯৪-সংখ্যা 'গরীয়সী' পত্রিকায় উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ আরু অসম' প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫০. মুস্তাফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) ১৯২৩ সালে তুরস্কের সুলতানকে গদিচ্যুত করিয়া সেখানে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া তিনি আমৃত্যু দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্তি প্রশাসনে ধর্মের প্রভাব খর্ব করা, সামাজিক গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূরীকরণ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া নারীসমাজকে মুক্তিদান। ১৯৩৫ সালে তাঁহাকে 'আতার্তুক' উপাধি দেওয়া হয়, যাহার অর্থ তুর্কি জাতির জনক।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৮ নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ভবানীপুর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এশিয়ার ইতিহাসে কামাল আতাতুর্কের স্থান আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেরণ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মেলনের কার্যারম্ভ হয়।

৫১. ব্রাহ্মনেতা, 'নববিধান' সমাজের কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই বাণীটি লিখিয়া দেন। রবীন্দ্রভবনে মূল রচনাটি রক্ষিত আছে। ইহা পূর্বে কোথাও মুদ্রিত হইয়াছিল কি না জানা নাই।

৫২. ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ৭ জানুয়ারি ১৯৩৯ (২২ পৌষ ১৩৪৫) শান্তিনিকেতনে আসিলে অপরাহ্নে আম্রকুঞ্জে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেখানে স্বস্তিবাচন ও নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন।

৫৩. Ernest Binfield Havel (১৮৬১-১৯৩৪) ১৮৯৬ সালে কলিকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়া বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। সেখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছাত্রদের বিদেশী ছবির নকল করা শিক্ষার পরিবর্তে ভারতীয় রীতির শিল্পচর্চার পদ্ধতি প্রয়োগ করা তাঁহারই কৃতিত্ব। এই উদ্দেশ্যে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ করিয়া লইয়া আসেন। ইহার জন্য তাঁহাকে ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয় দিক হইতেই বাধা পাইতে হইয়াছে। ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য ১৯১০ সালে লন্ডনে যে 'ইন্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে হ্যাভেল ছিলেন অন্যতম। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সংযোগ হইয়াছিল। হ্যাভেলের সংগ্রহে বহু ভারতীয় চিত্র-ভাস্কর্য ও আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসের বহু উপকরণ সঞ্চিত ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী লিলি হ্যাভেল সেগুলি বিশ্বভারতীকে দান করিতে চাহিলে রবীন্দ্রনাথ তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া সেগুলি রক্ষা করিবার জন্য কলাভবনে হ্যাভেল মেমোরিয়াল হল নির্মাণ করেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৮ তারিখে পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি প্রফুল্লরঞ্জন দাশ এই স্মৃতিমন্দিরের উদ্‌বোধন করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -কৃত অনুলিপি 'বক্তা কর্তৃক পুনর্লিখিত' হইয়া মুদ্রিত হয়।

৫৪. Charles Freer Andrews (১৮৭১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পর অ্যান্ডরুজ দিল্লির সেন্ট স্টিফেন'স্ কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ও মিশনারি-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও পরে বিশ্বভারতীর সেবায় যোগ দেন। অবশ্য তাঁহার কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত ছিল। ভারতে ও ভারতের বাহিরে নিপীড়িত ভারতবাসীর প্রয়োজনের সময়ে তিনি সর্বদাই তাহাদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ৫ এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে তাঁহার জীবনাবসান হয়। কলিকাতায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা করিয়া যাহা বলেন নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার অনুলেখন নেন।

৫৫. ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য (?১৮৫৬-১৯০৯) ১৮৯৭ হইতে ১৯০৯ পর্যন্ত দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় হইতেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, রাধাকিশোরের সময়ে তাহা সর্বাধিক গভীর হয়। তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য ও রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জন্য রাজকোষ হইতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার ত্রিপুরা-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ১২ মার্চ ১৯০৯ তারিখে কাশীতে এক মোটর-দুর্ঘটনায় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ক্ষীণ হইয়া আসিলেও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই। ইহার পরও তিনি দুইবার ত্রিপুরায় গিয়াছিলেন। তাঁহার অশীতিতম বয়ঃক্রম পূর্তি উপলক্ষে ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮ ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বিশেষ দরবার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার বিশেষ দূত হিসাবে প্রেরিত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ৩০ বৈশাখ উত্তরায়ণে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে এই রাজকীয় সনদ রবীন্দ্রনাথের হস্তে প্রদান করিলেন। ত্রিপুরার রাজপরিবার, বিশেষত মহারাজা বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর মাণিক্যের সহিত নিজের সম্পর্ক বিবৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ মুখে-মুখে বলিয়া ও টাইপ করাইয়া স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাহা সভায় পাঠ করেন।

৫৬. প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, পরে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে উভয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই প্রমথ চৌধুরী ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করেন, যে-পত্রিকা বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। প্রমথনাথের সপ্ততিতম জয়ন্তীর আয়োজন চলিতেছে জানিতে পারিয়া রবীন্দ্রনাথ ৪ এপ্রিল ১৯৪১ মুখে-মুখে বলিয়া তাঁহার জন্য একটি অভিনন্দনপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন এই উপলক্ষে তাঁহার গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হইবে, তখন তিনি ১৩ এপ্রিল উক্ত বিষয়েও একটি অনুচ্ছেদ যোগ করিয়া দেন। প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গল্প-সংগ্রহ' (প্রকাশ : ২০ ভাদ্র ১৩৪৮) গ্রন্থে রচনাটি 'ভূমিকা' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৫৭. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। বর্তমান রচনাটি সম্পর্কে রানী মহলানবিশ তাঁহার 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন : 'অবনীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়স আর ক'দিন পরেই হবে [৭ আগস্ট ১৯৪১]। কবি তাঁর জয়ন্তীর জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকালে রানীকে [চন্দ] বললেন রথীবাবুকে বলতে যে, এটার কথা তিনি যেন ভুলে না যান।

নিশ্চয়ই কলকাতায় এটার আয়োজন করা দরকার। দুপুরে যখন আমি আর সুধাকান্তবাবু [রায়চৌধুরী] কবির ঘরে ডিউটিতে ছিলাম, তখন তিনি মুখে বলে বলে সুধাকান্তবাবুকে দিয়ে একটা প্রশস্তি অবনীন্দ্রনাথের জন্যে লেখালেন।' রচনাটি অবনীন্দ্রনাথ-কথিত ও রানী চন্দ - লিখিত 'ঘরোয়া' (১৩৪৮) গ্রন্থের সূচনায় মুদ্রিত হয়।

## পরিশিষ্ট

এই বিভাগের অন্তর্গত রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের হইলেও তাঁহার দ্বারা লিখিত বা সংশোধিত নয়। রবীন্দ্রনাথ কোনো সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া যাহা বলেন বা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কোনো ব্যক্তির বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে মন্তব্য করেন, তাহা সাময়িকপত্রে বা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার ইংরেজি হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত হয়। কিন্তু ইহার বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের এবং তাহা পাঠকদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া সেগুলি এই 'পরিশিষ্ট' বিভাগে সংকলিত হইল। রচনাগুলি কালানুক্রমে বিন্যস্ত, কিন্তু কোনো ব্যক্তিবিশেষ-সংক্রান্ত একাধিক রচনা একত্রিত করা হইয়াছে।

১. ২৪ পৌষ ১৩১৬ (৮ জানুয়ারি ১৯১০) তারিখে স্কটিশ চার্চ কলেজ হলে কেশবচন্দ্র সেনের ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন, তাহার মর্ম ১ মাঘ ১৯৬৬ সংবৎ (১৩১৬)-সংখ্যা 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

২. ৩০ ভাদ্র ১৩২৪ (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৭) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে যাহা বলেন তাহার চুম্বক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাহা হইতে কার্তিক ১৩২৪-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই পাঠটি এখানে গৃহীত হইল।

৩-৪. ১১ আশ্বিন ১৩২৪ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭) রামমোহন লাইব্রেরিতে রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে যে সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। কার্তিক ১৩২৪-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এই বিষয়ে লিখিত হয় : 'শেষে সভাপতি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুঃখের বিষয় এই সুন্দর বক্তৃতাটি কেহ লিখিয়া লন নাই। তত্ত্বকৌমুদীতে ও সঞ্জীবনীতে ইহার যেরূপ তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু আভাস পাইবেন।' এখানে 'প্রবাসী'তে উদ্ধৃত 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার দুইটি পাঠ স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হইয়াছে।

৫. রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করিবার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ (৬ ফাল্গুন ১৩৩৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলিকাতার নাগরিকদের এক সভা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে যে ভাষণ পাঠ করেন তাহা মার্চ ১৯৩৩-সংখ্যা *The Modern Review*-তে 'Rammohun Roy' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। ভাষণের পরের দিন ৭ ফাল্গুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ভাষণের যে বাংলা মর্ম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখানে সংকলিত হইল।

৬. ১০ আশ্বিন ১৩৪৩ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উপাসনা করেন। সংকলিত রচনাটি তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম।

৭. ২৩ জুন ১৯২৩ নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থানে বঙ্গীয় চতুর্দশ সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

৮. ৬ অগস্ট ১৯৩৮ (২১ শ্রাবণ ১৩৪৫) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বাংলা সাহিত্য সমিতি 'সাহিত্যিকা'র উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ

ভাষণ দেন। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার অনুলেখন অবলম্বনে পরে রচনাটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনাবলীর একটি প্রামাণিক সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ উদ্‌যোগী হয়। এই কার্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুমোদন জানান নিম্নলিখিত পত্রে :

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার আনন্দিত অনুমোদন জানাইতেছি। ইতি ১৫ মাঘ, ১৩৪৪'

এই উপলক্ষে ৯ এপ্রিল ১৯৩৮ (২৬ চৈত্র ১৩৪৪) পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম উৎসব আরব্ধ হয়। উহাতে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি ৩১ মার্চ পরিষদের সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখেন :

'বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসবসভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। দূর থেকে এইটুকু নিবেদন করি যে যাঁর স্মৃতি আপন মাহাত্ম্যকে অবলম্বন করে আছে তিনি আপন কীর্তির দ্বারা দেশকে যে সম্মান দিয়েছেন তারি গৌরব স্বীকারের উপলক্ষকে যেন আমরা যথেষ্ট সমাদরের মধ্যে রক্ষা করি।'

৯. বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ করিবার আশায় রবীন্দ্রনাথ গুজরাট ভ্রমণে গিয়া ৪ ডিসেম্বর ১৯২২ তারিখে মহাত্মা গান্ধী -প্রতিষ্ঠিত সবরমতী আশ্রম পরিদর্শন করিতে যান, গান্ধীজি তখন কারাগারে। আশ্রমবাসীদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিকট ইংরেজিতে একটি ভাষণ দেন ও সেটি ১ জানুয়ারি ১৯২৩ *The Hindoostan* পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাহার একটি বঙ্গানুবাদ মাঘ ১৮৪৪ শক (১৩৩০)-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত হইয়াছিল।

১০. মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে ২ অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সংস্থা মারফত বাণীটি প্রেরণ করেন। গান্ধীজি তখন ইংল্যান্ডে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে একই দিনে একটি টেলিগ্রামও পাঠাইয়া দেন : 'Our combined homage of reverent love to you on the happy occasion of your birthday.' এই দিনই তিনি শান্তিনিকেতন মন্দিরে যাহা বলেন, তাহা 'গান্ধীজি' নামে অগ্রহায়ণ ১৩৩৮-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয় [ দ্র. মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্র-রচনাবলী (সুলভ) চতুর্দশ খণ্ড ]।

১১. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডের নির্বাচন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) প্রস্তাবের প্রতিবাদে গান্ধীজি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ পুনার যারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করিলে উদ্‌বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ ২৪ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন হইতে পুনা অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর সেখানে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে যে সভা হয় রবীন্দ্রনাথ সেখানে বক্তৃতা করেন, 'ভাষণটি রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখিয়া সভা হইবার পূর্বে জেলের মধ্যে মহাত্মাজীর হাতে দেন'।

১২. ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ মহাত্মা গান্ধীর ৬৪তম জন্মতিথি উপলক্ষে পুনার শিবাজি মন্দিরে একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, রচনাটি তাহারই সারমর্ম।

১৩. ২ অক্টোবর ১৯৩৪ মহাত্মা গান্ধীর ৬৬তম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিকদের নিকট ভাষণটি দেন।

১৪. বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সংঘ গান্ধীজয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ উক্ত সংঘের নিকট বাণীটি প্রেরণ করেন।

১৫. ২ অক্টোবর ১৯৩৬ আশ্রমে গান্ধীজয়ন্তী পালন উপলক্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মর্ম।

১৬. ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ গান্ধীজির সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার।

১৭. ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ গান্ধীজি শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসিলে আম্রকুঞ্জে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মর্ম।

১৮. বিশিষ্ট তরুণ চৈনিক কবি সু-সী-মো (Dr. Tse Mon Hsu) ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণের সময়ে তাঁহার সর্বক্ষণের সঙ্গী ও দোভাষী ছিলেন। তাঁহার উপহৃত চা-পানের সরঞ্জাম দিয়া শান্তিনিকেতনে একটি চা-চক্রের উদ্‌বোধন হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার নামকরণ করেন 'সুসীম চা-চক্র' ও তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'হায় হায় হায়/দিন চলি যায়' গানটি লিখিয়া দেন। সংবাদপত্র হইতে জানা যায়, আমেরিকা ও য়ুরোপ ভ্রমণান্তে সু-সী-মো ৫ অক্টোবর ১৯২৮ বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে [৮ অক্টোবর] তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ৯ অক্টোবর কলাভবনের দ্বিতলে সুসীম চা-চক্রে তাঁহার সংবর্ধনা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে যাহা বলেন, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক অনাথনাথ বসু তাহার মর্ম 'শান্তিনিকেতনে চৈনিক সুধী সু-সীমোর অভ্যর্থনা' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পৌষ ১৩৩৫-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে বিমান-দুর্ঘটনায় এই তরুণ কবির জীবনাবসান ঘটে।

১৯. রাজনৈতিক নেতা, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬) ২ ডিসেম্বর ১৯৩২ রাত্রে শান্তিনিকেতনে আসিবার পরে ৩ ডিসেম্বর প্রাতে আম্রকুঞ্জে তাঁহাকে সংবর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া ভাষণ দেন। ৩ ডিসেম্বর তিনি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : 'মালব্যজিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তিনি আজ বিকেলের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। সব দেখে শুনে খুব খুশী হয়েছেন। এখানকার সকলের তাঁকে ভালো লেগেছে। তীক্ষ্ণ তাঁর বুদ্ধি সন্দেহ নেই, অসাধারণ তাঁর যোগ্যতা— কথাবার্তা কইলেই বোঝা যায়।'

২০. ১৯৩২ সালের এপ্রিল-মে মাসে রবীন্দ্রনাথ পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ করেন। এই যোগাযোগের ফলে পারস্যাধিপতি রেজা শাহ পহ্লবী বিশ্বভারতীতে পারসিক সাহিত্য পড়াইবার জন্য কবি ও পণ্ডিত অধ্যাপক আগা পোরে দেবৌদকে (Aga Porc Davoud) নিযুক্ত করেন। তিনি ৯ জানুয়ারি ১৯৩৩ শান্তিনিকেতনে আসিলে আম্রকুঞ্জে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি ইংরেজি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন (দ্র. *Visva-Bharati News*, February 1933)।

২১. বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩) রাঁচিতে অন্তরীণ থাকার সময়ে ২২ জুলাই ১৯৩৩ মধ্যরাত্রে পরলোকগমন করেন। এই সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছাইলে আশ্রমে শোকের ছায়া নামিয়া আসে। ২৪ জুলাই সকাল ৯টার সময়ে সমস্ত ক্লাস ছুটি দিয়া আশ্রমবাসীরা কোনার্কে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের সম্মুখে সমবেত হইলে তিনি এই গুরুতর জাতীয় ক্ষতিতে গভীর মর্মবেদনা ব্যক্ত করেন।

২২. বিখ্যাত আইনজীবী ও দেশনেতা বিঠলভাই জাহেরভাই প্যাটেল (১৮৭৩-১৯৩৩) ২২ অক্টোবর ১৯৩৩ তারিখে ভিয়েনা শহরে পরলোকগমন করেন।

২৩. হজরত মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে একটি বাণী লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার আবদুল্লাহ সুহ্‌রাওবরদির নিকট প্রেরণ করেন। বাণীটি ২৫ জুন ১৯৩৪ (১০ আষাঢ় ১৩৪১) হজরতের জন্মদিনে বেতারে সম্প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি ইংরেজি অনুবাদও পাঠাইয়াছিলেন।

২৪. কালীঘাট কালীমন্দিরে ছাগবলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জয়পুরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ তারিখ হইতে আমরণ অনশনের সংকল্প ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, তিনি যেন রামচন্দ্রকে নিরস্ত হবার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ১৫ ভাদ্র ১৩৪২ (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) রামচন্দ্রকে লেখেন :

'কালিঘাটের মন্দিরে দেবীপূজা-উপলক্ষ্যে পশুবলি নিষেধের উদ্দেশে আপনি যে শোকাবহ অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আপনার দেশবাসী সকলের হইয়া আপনাকে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আত্মজীবন-বলি দ্বারা বহুলোকের গভীর বেদনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে ধর্মেরই দোহাই দিব। জীবজননীর নামে জীবহত্যার অপবিত্রতা নিবারণব্রতে দীক্ষাগুরু ও নেতৃরূপে দেশের লোককে উদ্বোধিত করিয়া দীর্ঘজীবন এই পুণ্যসাধনায় প্রবৃত্ত থাকিবেন এই আশা মনে লইয়া আপনার নিকট হইতে আপনার নিদারুণ পণটিকে ভিক্ষা চাহিতেছি, নিরাশ করিবেন না।' কিন্তু পত্রটি তাঁহাকে না পাঠাইয়া একই দিনে হীরেন্দ্রনাথকে লিখিলেন :

'পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মাকে প্রায়োপবেশন থেকে নিরস্ত করবার অনুরোধ জানিয়ে আপনি আমাকে পত্র লিখেছেন। তদনুসারে অনুনয় করে একটা চিঠি রচনা করেছিলুম। কিন্তু তাঁর মহৎ সংকল্পের তুলনায় আমার অনুরোধটার দৈন্য এতই কৃশ বলে আমার চোখে ঠেকল যে, লজ্জায় সেটাকে আপনাদের কাছে পাঠাতে পারলুম না। তিনি যে ব্রত নিয়েছেন সে চরম আত্মোৎসর্গের ব্রত, আমরা দুর্বলচিত্তে তার ফলাফল বিচার করবার অধিকারী নই। বাংলাদেশে শক্তিপূজায় জীবরক্তপাত রোধ করা সহজ নয় সে কথা নিশ্চিত— এই মহাত্মার প্রাণ উৎসর্গ করার আশু উদ্দেশ্য সফল হবে না জানি, কিন্তু এই উৎসর্গ করারই যে সার্থকতা তার তুলনা কোথায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের সাধারণ আদর্শ অনুসারে চিন্তা করা খাটবে না। তাঁর প্রাণ-উৎসর্গে আমরা বেদনা বোধ করব সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বেদনাতেই সেই উৎসর্গের মূল্য। কালীঘাটের মন্দিরে তাঁর আত্মদানের কী ফল ফলবে জানি নে, কিন্তু এই দান আমাদের ইতিহাসের রত্নভাণ্ডারে নিত্যসঞ্চিত থাকবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মনে পড়ল— নিদারুণতার দ্বারা অভিভূত হয়ে পার্থের মনে যে ক্লৈব্য দেখা দিয়েছিল— পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা জানেন কী তাঁর স্বধর্ম এবং তিনি জানেন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, আমরা কী জানি! প্রথমে যে সকরুণ পত্রটি লিখেছিলুম সে পাঠাতে পারলুম না। ইতি ১৫ই ভাদ্র ১৩৪২'

সম্ভবত এই চিঠিটিকেই বিবৃতির রূপ দিয়া সংবাদসংস্থা 'ইউনাইটেড প্রেস'কে দেওয়া হইয়াছিল (৩ সেপ্টেম্বর), যাহা ৫ সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়।

এই বিষয়ে 'বসুমতী'-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ একটি পত্রে লেখেন : 'শক্তিপূজায় এক সময় নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনও কখনও ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশুহত্যাও রহিত হবে এই আশা করা যায়।' এই পত্রের সহিত তিনি জনৈক প্রশ্নকারীকে লিখিত তাঁহার উত্তরটিও পাঠাইয়া দেন :

'বড়ো চিঠি লেখার মতো শক্তি ও উৎসাহ আমার নেই, সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলি। জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের দুর্বলতা ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেই জন্যে শ্রেয়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্মসাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মানুষের পরিত্রাণের উপায়। নিজেদের আচরণের হেয়তার দোহাই দিয়ে সেই সর্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শকে যদি দূষিত করা যায় তাহলে তার চেয়ে অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। ঠগীরা দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্মের অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিংস্রপ্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ করে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব। এই আদর্শ-বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্মের জন্যেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত; শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই ধর্মের উদ্দেশ্যেই প্রাণ দিতে স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশই রামচন্দ্র শর্মা পালন করছেন। সাধারণ মানুষের হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার অন্ত নেই— স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ রোধ করতে পারেননি— তবুও ধর্ম অনুষ্ঠানে হিংস্রতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গের মতো দুষ্কর পুণ্যকর্ম আর কিছু হতে পারে কি না জানি নে কিন্তু সেই প্রাণ-উৎসর্গই একটি মহৎ ফল। রামচন্দ্র শর্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণ-ঘাতক ধর্মলোভী স্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন করতে বসেছেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি। তিনি মহাপ্রাণ বলেই এমন কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ইতি ২৪ ভাদ্র, ১৩৪২' —দুইটি

পত্র কার্তিক ১৩৪২-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মধ্যস্থতায় বত্রিশ দিন পরে ৬ অক্টোবর রামচন্দ্র শর্মা তাঁহার অনশন স্থগিত রাখেন।

২৫. বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক Rudyard Kipling (১৮৬৫-১৯৩৬) ১৯০৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 'East and West', 'The Flag of England' প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী কবি হিসাবে নিন্দিত হইলেও তাঁহার রচনাকুশলতা ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ মাত্রা যোগ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনা সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরিয়াই সচেতন ছিলেন। ১৩০৯ (১৯০২) সালে লিখিত 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :

'...প্রাচ্য অত্যুক্তির উদাহরণ আরব উপন্যাস এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাডিয়ার্ড কিপলিঙের "কিম্" এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় চিত্রাবলী। আরব্য উপন্যাসেও ভারতবর্ষের কথা আছে, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে তাহা গল্পমাত্র— তাহার মধ্য হইতে কাল্পনিক সত্য ছাড়া আর কোনো সত্য কেহ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, তাহা এতই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিপলিং তাঁহার কল্পনাকে আচ্ছন্ন রাখিয়া এমনি একটি সত্যের আড়ম্বর করিয়াছেন যে, যেমন হলপ-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে, তেমনি কিপলিঙের গল্প হইতে ব্রিটিশ পাঠক ভারতবর্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না।'

ইহা ছাড়া কিপলিঙের প্রবাদপ্রতিম পঙ্‌ক্তি 'East is East, and West is West, and never the twain shall meet'-এর বিরোধিতা করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শক্তির অনেকটাই ব্যয় করিয়াছিলেন।

২৬. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধিপতি পঞ্চম জর্জ (১৮৬৫-১৯৩৬) ৬ মে ১৯১০ পিতা সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পরে ২২ জুন ১৯১১ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯১১ সালে ভারত সফরে আসিয়া তিনি দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করিয়া সাধারণভাবে বাঙালির কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। ২০ জানুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২৭. ২০ জানুয়ারি ১৯৩৬ (৬ মাঘ ১৩৪২) প্রাতে শান্তিনিকেতন মন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে উপাসনা করেন তাহার মর্ম।

২৮. ৭ পৌষ ১৩৪৩ (২২ ডিসেম্বর ১৯৩৬) প্রাতে উপাসনা-মন্দিরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ষট্‌ত্রিংশৎ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রার্থনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব মহর্ষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন।

২৯. প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬) উর্দু ও হিন্দি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মুখ্যত ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক হইলেও তিনি নাট্যকার, জীবনীকার, অনুবাদক, শিশুসাহিত্যিক, নিবন্ধকার ও সম্পাদক রূপেও সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। চৌত্রিশ বর্ষব্যাপী লেখকজীবনে তিনি চৌদ্দটি উপন্যাস, তিনশত গল্প, তিনটি নাটক, দশটি অনুবাদ, ছয়টি শিশুসাহিত্যগ্রন্থ এবং অসংখ্য সম্পাদকীয়, নিবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতিও লিখিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প উর্দুতে অনুবাদ করেন। ৮ অক্টোবর ১৯৩৬ তাঁহার জীবনাবসান হয়। 'প্রেমচন্দ' তাঁহার ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম ধনপত্ রায়।

৩০. মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) উর্দু ও ফারসি ভাষার প্রখ্যাত কবি। 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' এই দেশপ্রেমমূলক গানটির জন্য যিনি বিখ্যাত, তিনিই আবার ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির প্রয়োজন ও সেই উদ্দেশ্যে মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়— এই ভাবনার অন্যতম উদ্‌গাতা। ৯ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে ইন্টারকলেজিয়েট মুসলিম ব্রাদারহুডের উদ্‌যোগে 'ইকবাল দিবস' পালন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭ লাহোরে এই বাণী প্রদান করেন। মূল বাণীটি ইংরেজিতে প্রদত্ত : 'I share with you all India's homage to the poetic genius of Sir Mahomed Iqbal. I have never

ceased to regret that my ignorance of Urdu language has deprived me of the pleasure of reading his works in their elegant original. May he live long to enrich our country's literary heritage.'

৩১. ২১ এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখে লাহোরে স্যার মহম্মদ ইকবালের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বাণীটিও সম্ভবত ইংরেজিতে দেওয়া হইয়াছিল।

৩২. মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হয় ১০ নভেম্বর ১৯৩৮ তারিখে। এই উপলক্ষে ১৮ নভেম্বর বিশ্বভারতীর সকল বিভাগ বন্ধ থাকে। অপরাহ্নে 'শ্যামলী'র সম্মুখে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ মুস্তাফা কামালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

৩৩. বসু বিজ্ঞানমন্দিরের একবিংশতিতম বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস ও জগদীশচন্দ্র বসুর অশীতিতম জন্মোৎসব ৩০ নভেম্বর ১৯৩৮ তারিখে ডা. নীলরতন সরকারের সভাপতিত্বে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের 'স্যার জে. সি. বোস মেমোরিয়াল লেকচার' দিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার লিখিত ইংরেজি বক্তৃতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পড়িয়া শোনান। মূল ভাষণটি ডিসেম্বর ১৯৩৮-সংখ্যা *The Modern Review*-তে প্রকাশিত হয়। রচনাটির বাংলা অনুবাদ অনুষ্ঠানের পরের দিন ১ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩৪. বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ করেন। ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮ ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস -প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শোক-বিবৃতিটি এইরূপ : 'I have lost an old friend for whom I always had a sincere affection and regard. He was one of the few in India who had made for himself a distinct place in the intellectual hierarchy of a large world, but unfortunately, the last stages of his life were clouded by disease that obstructed for him most of the channels of human commerce and prevented him from the proper exercise of his great scholarship. But we cannot forget that generations of our youngmen have received inspiration from his intellectual insight and encyclopaedic knowledge. We offer our homage of respect to his memory.'

৩৫. আইরিশ কবি ও নাট্যকার William Butler Yeats (১৮৬৫-১৯৩৯) ১৯২৩ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে যে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়া ও রবীন্দ্রনাথের *Gitanjali*-র ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইয়েট্‌স্ রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্ত্য জগতে পরিচিত হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ২৮ জানুয়ারি ১৯৩৯ তাঁহার জীবনাবসান হয়। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে লিখিত 'কবি য়েট্‌স্' প্রবন্ধে ইঁহার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন।

৩৬. Lord Brabourne (১৮৯৫-১৯৩৯) স্যার জন অ্যান্ডারসন পদত্যাগ করিলে নভেম্বর ১৯৩৭-এ বাংলার গবর্নর নিযুক্ত হন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ তিনি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন। অত্যাচারী শাসক অ্যান্ডারসনের শান্তিনিকেতন সফরের সময়ে নিরাপত্তার বাড়াবাড়িতে শিক্ষক-ছাত্ররা আশ্রম ত্যাগ করিয়া বনভোজনে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড ব্র্যাবোর্ন তাহা হইতে দেন নাই— তিনি সস্ত্রীক সর্বত্র স্বাধীনভাবেই ঘোরাফেরা করেন, তাঁহার ভদ্রতাগুণে সকলেই মুগ্ধ হন। কিন্তু একটি অপারেশনের পরে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ কলিকাতাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতার কাছে শোকজ্ঞাপন করিতে গিয়া স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের তাঁহার সৌজন্যমূলক ব্যবহারের কথা মনে পড়িয়াছে। একই দিনে বাংলার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারকে তিনি লিখিয়াছেন : 'Lord Brabourne-এর মৃত্যুসংবাদে দুঃখ বোধ করেছি।

তিনি আমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন, তাছাড়া বাংলাদেশের তিনি হিতৈষী ছিলেন সন্দেহ নেই।'

৩৭. চীনের প্রধান ধর্মযাজক তাই-সু একটি প্রতিনিধিদল লইয়া ১৭ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে আসিলে রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইয়া বলেন : 'It gives me great joy to welcome you on this auspicious occasion. You have come as an ambassador of love from your country through dangers and difficulties in order to interchange with their Indian brethren the highest gifts of man. We offer to you and through you to your country the gift of our love.'

৩৮. রচনাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : 'শ্রাবণ-শুক্লাসপ্তমীর দিন (২৫ শ্রাবণ ১৩৪৭) উত্তর-ভারতের ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাসজির মৃত্যুতিথি শান্তিনিকেতনে উদ্‌যাপিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।' (রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ, ১৪০১, পৃ. ২৪৫) ইহার পর তাঁহার ভাষণটি উদ্ধৃত করিয়া তিনি পাদটীকায় লেখেন : '১৩৪৭ সালে শান্তিনিকেতনে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন-অনুষ্ঠিত তুলসীদাসের স্মৃতিবাসরের সভাপতিরূপে গুরুদেব-কর্তৃক কথিত ও রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী -কর্তৃক অনুলিখিত। ২০ আশ্বিন ১৩৬০, বালুচর (পোস্টঅফিস পালং, ফরিদপুর, পূর্ব-পাকিস্তান) হইতে অনুলেখক এই লেখাটি পাঠাইয়াছেন। কবি-কর্তৃক ভাষণটি সংশোধিত বা অনুমোদিত হইয়াছিল কি না জানি না।'

শান্তিনিকেতন হইতে ১৩ আগস্ট ১৯৪০ (২৮ শ্রাবণ ১৩৪৭) ইউনাইটেড প্রেস সংবাদসংস্থা-প্রেরিত অনুষ্ঠানটির একটি প্রতিবেদন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৪ অগস্ট 'অমর কবি তুলসী দাস/ শান্তিনিকেতনে ৩১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত/রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন' শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

## নাটক ও প্রহসন

### যোগাযোগ

মঞ্চাভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'যোগাযোগ' (১৩৩৬) উপন্যাসের যে নাট্যরূপ দান করেন, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পঞ্চম সংকলনে (পৌষ ১৩৮৫) তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

শিশিরকুমারের প্রযোজনা ও পরিচালনায় কলিকাতায় 'নবনাট্যমন্দির'-এ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬ 'যোগাযোগ' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলেন—

মধুসূদন : শিশিরকুমার ভাদুড়ি
কুমুদিনী : কঙ্কাবতী
বিপ্রদাস : শৈলেন চৌধুরী
নবীন : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
মোতির মা : রানীবালা
শ্যামাসুন্দরী : ঊষা

শিশিরকুমারের অভিনয়প্রতিভা ও নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "শিশির ভাদুড়ির প্রযোজনানৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি।"

'নবনাট্যমন্দির'-এ যখন এই নাটকের অভিনয় চলিতেছিল সেইসময় 'নাট্যনিকেতন'-এ নরেশচন্দ্র মিত্র -কর্তৃক নাট্যীকৃত ও প্রযোজিত 'গোরা' নাটকের অভিনয় চলিতেছিল।

'গোরা'-র প্রশংসা অধিকতর হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে সংকলিত হইল। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত-র 'রবিচ্ছবি' গ্রন্থে (১৩৬৮) পত্রটি মুদ্রিত—

"গোরা অভিনয়ের প্রশংসা অনেকেরই কাছে শুনেছি— যোগ্য অভিনেতা নির্বাচন তার একটা কারণ। যোগাযোগে ঠিক তার বিপরীত। অর্থাভাবে শিশির যাকে-তাকে নিয়ে কাজ সারতে বাধ্য হয়, মাঝের থেকে অপযশ হয় লেখার।"

কিন্তু 'যোগাযোগ'-এর অভিনয় দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে মতামত লিখিতভাবে দিয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্টির পরিচয় আছে—

"নব্যনাট্যমন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না— তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতার মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে তবে সেজন্যে নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়িকে দোষ দেওয়া যায় না।

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

দ্রষ্টব্য, অমল মিত্র, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার' (১৯৭৭), প্রকাশক, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

উপন্যাস ও নাটকের কাহিনী-পরিসমাপ্তির মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, সে সম্পর্কে তারাকুমার মুখোপাধ্যায় 'অন্তরালের শিশিরকুমার' গ্রন্থে (১৩৬৮) শিশিরকুমারের উক্তির আকারে যাহা সংকলন করিয়াছেন তাহা হইতে ধারণা হয়, নাটকের সমাপ্তি অংশের পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ মানিয়া লইয়াছিলেন—

'যোগাযোগের শেষটা বদলাতে চাইলুম। কবি রাজি নন আদৌ। আমি বললুম, অপরাজিতা ফুল দিয়ে যে কুমুদিনী স্বামী কামনা করে, সেই চিরকেলে সতীকে বিদ্রোহী করবেন কি করে? কবি বললেন, তুমি আমার কুমুকে হিঁদুটি করতে চাও? ওর সমস্ত বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে জীবনের নাড়ীতে এসেছে বিদ্রোহ। এ তোমার সস্তার বিদ্রোহিনী নয়।

আমি তখন বললুম, তাকে একবার মধুসূদনের ঘরে যেতে তো হবে। শুনে কবি খুব খেপে গেলেন। বললেন, তা তো যাবে। যাবে কি থাকবার জন্য। যাবে ফিরে আসার জন্য।

আমি বললুম, ঐ মধুসূদনের ঘরে তার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করবে কুমু। দৃশ্য শেষ হবে। কথাটায় আরো উগ্র হয়ে কবি বললেন, কখ্‌খনো নয়, তা হবে না। হতে পারে না। আমি বললুম, তাই যদি হয় তবে সমগ্র দর্শকসমাজ খুশি হবে। আমি দক্ষিণাটা ভালো পাব। শুনে কবি যেন অতল গম্ভীর হলেন। বললেন, তুমি তো খুব দুষ্টু লোক হে। তারপর বললেন, যা খুশি করো গে। তোমার যোগাযোগ লোকে কদিন মনে রাখবে? আমার যোগাযোগ বরাবর থাকবে।"

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত অভিনয়ের কপিতে (পাণ্ডুলিপি ২৮৩ক) নাটকের যে পরিসমাপ্তি লক্ষ করা যায় তাহা উপন্যাস, পূর্বোদ্ধৃত শিশিরকুমারের উক্তি কোনোটার সহিতই মেলে না, রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত নাটকের পাঠে তাহা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র নাট্যরূপের এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত ব্যস্ততার সময়ে রোগশয্যায় যোগাযোগের প্রথম তিনটি দৃশ্য লিখেছিলেম, শেষ করবার সময় পেলে দেখতে নাটকের পরিণাম তোমার রচিত নাট্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক

হোত। সতীধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি নাটকটাকে যে পথে নিয়ে গেছ বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শে সেটা হৃদ্য নয়। শিশিরকুমারকে বলেছিলুম যথোচিত শোধন ক'রে ওটাকে গ্রহণ করতে— তিনি কী করেছেন জানি নে। ইতি

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ শুভাকাঙক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হীরেন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপটি শিশিরকুমার নকল করাইয়া লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনান্তে আর একটি কপি প্রস্তুত করাইয়া পরিমার্জনাদির জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি : ২৮৩ক। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'যোগাযোগ' নাটকের যে-সমস্ত পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, সুধীরচন্দ্র কর -কৃত প্রতিলিপি, শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয়ের কপি এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসদন (বর্তমানে রবীন্দ্রভবন) -এর উদ্যোগে প্রস্তুত প্রতিলিপি আছে।

হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'শেষ করবার সময়'-এর অভাবের প্রসঙ্গ জানাইয়াছিলেন এবং 'যথোচিত শোধন ক'রে ওটাকে গ্রহণ' করার প্রসঙ্গও আছে। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে এই শোধনের দায়িত্ব পূর্বেই দিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার অভিপ্রেত পরিবর্তনাদি করিয়া নাটকটি সুসম্পূর্ণ করেন। এই সময়ে [১৯৩৬] প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"... শিশির ভাদুড়ি যোগাযোগের নাট্যীকরণ সম্বন্ধে ধন্না দিয়ে পড়েছিলেন। খানিকটা অংশ পূর্বেই করে দিয়েছিলুম। বাকি অনেকখানিই তিন চার দিনের মধ্যেই লিখে দেবার জন্যে তাঁর আবেদন। দুঃসাধ্য কাজ করতে হয়েছে, এমন একটানা পরিশ্রম আর কখনো করি নি। আমার নিজের বিশ্বাস জিনিসটা ভালোই হয়েছে। খ্রীষ্টোৎসব সপ্তাহে বোধ হচ্ছে অভিনয় হবে— দেখতে যেয়ো। উপযুক্ত অভিনেতা সংগ্রহ করতে পেরেছে কি না সন্দেহ— বিশেষ দক্ষ লোকের দরকার— নইলে শোচনীয় হবে।"

—দ্রষ্টব্য, সাপ্তাহিক 'দেশ', ১০ আশ্বিন ১৩৮২, পৃ. ৬৫৯

'যোগাযোগ' নাটকবিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পঞ্চম সংকলন (পৌষ ১৩৮৫) ও শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী -লিখিত 'সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪০৬) 'যোগাযোগ' শীর্ষক আলোচনা (পৃ. ২০৫-১৫)।

# ব্যঙ্গকৌতুক

## স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক

'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' শীর্ষক কৌতুক নাটিকাটির প্রকাশ 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৫ সংখ্যায়। রচনাটি বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-রচিত 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' (প্রকাশ, 'সাধনা' আষাঢ় ১৩০০। 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থভুক্ত) কৌতুক রচনার নূতন রূপ। দুটি রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' চতুর্থ খণ্ডে (পরিবর্ধিত সং ১৩৭১) 'প্রত্যাবর্তনের পর' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ ঘনায়মান, বিজ্ঞানের গবেষণায় দেবতাদের অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনায় স্বর্গে সকলেই উৎকণ্ঠিত। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র লেখাটি ও 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠকে'র ভাষাটি তুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। 'ব্যঙ্গকৌতুকে' ['প্রাচীন দেবতার নূতন

বিপদ'] আছে— 'দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর স্ট্যাটিস্টিক্স্ দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই।' এই নাটকে ['স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক'] আছে, চিত্রগুপ্ত বলিলেন— 'সুরগুরু কোনোদিন সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি।... মর্তে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নির্ভুল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণবিশারদের মাথায়; এ কাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি অত্যাবশ্যক।' আশা করি, পাঠক এই শেষ বাক্যের দ্ব্যর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন।"

## সুন্দর (নাট্যগীতি)

'সুন্দর' ও 'শেষবর্ষণ' নামে ঋতু-আশ্রয়ী অভিনয়োপযোগী দুটি গীতিকাব্যের রচনাকাল ১৩৩১ বঙ্গাব্দ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ। ২৬ ফাল্গুন ১৩৩১, শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে সন্ধ্যায় বসন্ত-উৎসবে 'সুন্দর' গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের পরিকল্পনা থাকিলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। শেষ পর্যন্ত রাত্রিকালে বর্তমান পাঠভবন -দপ্তরের (পূর্বে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার) দোতলার হলঘরে একটি সংগীত সভার আয়োজন হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্য-রচিত গান 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা' গানটি গাহিয়াছিলেন। 'সুন্দর' ১৩৩১ সালে চৈত্রমাসের শেষ দিনে মঞ্চস্থ হয়। এই 'সুন্দর' এর একটি মুদ্রিত সচিত্র সংগীত-সূচী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। মোট আট পৃষ্ঠার এই পত্রীটির নামপত্রসহ অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য সংক্ষেপে দেওয়া হইল—

সুন্দর/(বসন্তোৎসব)/[লিনোকাট ছবি]/শান্তিনিকেতন/২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩১

১. আজি কি তাহার বারতা
২. তোমায় চেয়ে আছি ব'সে
৩. নাই বা যদি এলে তুমি
৪. ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে
৫. ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে
৬. এ কি মায়া! লুকাও কায়া
৭. মোরা ভাঙব, তাপস, ভাঙব তোমার
৮. ওহে সুন্দর মরি মরি
৯. লহ লহ তুলে লহ
১০. ও কি এল ও কি এল না
১১. কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন
১২. যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়

২৪টি গান লইয়া 'সুন্দর' নামে একটি গীতিসংকলন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় -প্রকাশিত 'ঋতু-উৎসব' সংকলন গ্রন্থে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত হইয়াছিল। 'শেষ-বর্ষণ', 'শারদোৎসব, 'বসন্ত', 'সুন্দর' ও 'ফাল্গুনী' এই গ্রন্থে সংকলিত হয়। উল্লিখিত 'সুন্দর'-এর গীতিসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১. হাটের ধূলা সয় না যে আর
২. বারে বারে পেয়েছি যে তারে
৩. কবে তুমি আসবে ব'লে
৪. আজ কি তাহার বারতা
৫. তোমায় চেয়ে আছি ব'সে পথের ধারে
৬. আমার দোসর যে জন
৭. নাই যদি বা এলে তুমি

৮. ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে
৯. আমার মনের কোণের বাইরে
১০. ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা
১১. জাগরণে যায় বিভাবরী
১২. সে যে বাহির হ'ল আমি জানি
১৩. রাতে রাতে আলোর শিখা
১৪. এ কী মায়া, লুকাও কায়া
১৫. ভাঙব, তাপস, ভাঙব তোমার
১৬. ওহে সুন্দর, মরি মরি
১৭. কত যে তুমি মনোহর, মনই তাহা জানে
১৮. ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
১৯. মন চেয়ে রয়, মনে মনে হেরে মাধুরী
২০. লহো লহো, তুলে লহো নীরব বীণাখানি
২১. ও কি এল, ও কি এল না
২২. কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও
২৩. ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল
২৪. যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দে) জোড়াসাঁকোয় মাঘোৎসবে পূর্ব-রচিত বসন্ত ঋতুর গান লইয়া একটি অনুষ্ঠানসূচী তৈরি করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নামও ছিল 'সুন্দর'। পূর্ব-উল্লিখিত ১৩৩১ বঙ্গাব্দের 'সুন্দর' এবং 'ঋতু-উৎসব' গ্রন্থে সংকলিত 'সুন্দর'-এর সহিত এই 'সুন্দর'-এর বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ইহার একটি মুদ্রিত সূচী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। সূচীটির নামপত্রসহ অন্যান্য জ্ঞাতব্য নিম্নরূপ—

নাট্যবিষয়/সুন্দর/[বিশ্বভারতী সিল]/অভিনয় স্থান/জোড়াসাঁকো, কলিকাতা/
অভিনয় রাত্রি/১৩ মাঘ ১৩৩৫

৩৪ নম্বর সেন্ট্রাল এভিনিউ-স্থিত, কলিকাতা আর্ট প্রেস মুদ্রিত এই পত্রীর মূল্য আট আনা। মোট দশটি গান ইহাতে মুদ্রিত—

১. নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ
২. যদি তারে নাই চিনি গো
৩. আজ দখিন দুয়ার খোলা
৪. ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া
৫. এসো এসো বসন্ত ধরাতলে
৬. কবে তুমি আসবে বলে রইব না ব'সে
৭. কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন
৮. ও কি মায়া, কি স্বপন ছায়া
৯. ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল
১০. এনেছ ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল

১৩ মাঘ ১৩৩৫ এই 'সুন্দর'-এর অভিনয় হয়, পত্রী অনুসারে ধরা যাইতে পারে। শান্তিদেব ঘোষ 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৩৪৯) জানাইয়াছেন, 'অভিনয় হয় দু'দিন, ১৩ এবং ১৫ মাঘ ১৩৩৫।' শেষ দিন, অর্থাৎ ১৫ মাঘ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান এবং আরো কিছু গান ও সংলাপ যোগ করিয়া 'সুন্দর'-এর রূপান্তর করেন। 'রানী'

ও 'বসন্তিকা'— এই দুইটি চরিত্র ১৫ মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত অভিনয়ের নূতন সংযোজন। বস্তুত তাহাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে সংগীতের মর্মার্থই বোঝানো হইয়াছিল। এই দিনের সংযোজিত গানের তালিকা : বিশ্ববীণারবে, তোমায় চেয়ে আছি ব'সে, একটুকু ছোঁওয়া লাগে, শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়, না যেয়ো না, লহো লহো, তুলে লহো।'

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত যে পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে তাহাতে 'রানী' ও 'বসন্তিকা' এই দুটি চরিত্রের স্থলে নুটু (রমা মজুমদার/কর : সুরেন্দ্রনাথ কর-এর পত্নী) এবং অমিতা (অমিতা ঠাকুর : অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী)-র নাম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে গানগুলির একটিমাত্র ছত্রের উল্লেখ করিয়া প্রতিটি গানের স্থল নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমান রচনাবলীতে গানগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

'রবীন্দ্রবীক্ষা' দ্বাদশ সংকলনে (পৌষ ১৩৯১) 'সুন্দর'-এর এই পাঠ বিস্তারিত পরিচিতিসহ মুদ্রিত হয়।

# উপন্যাস ও গল্প

## ললাটের লিখন

'বাঁশরী' নাটকের (১৩৪০) প্রাথমিক গল্পরূপ 'ললাটের লিখন'-এর প্রকাশ 'রবীন্দ্রবীক্ষা' ষষ্ঠ সংকলনে (শ্রাবণ ১৩৮৮)। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত তিনটি খাতা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি; এগুলির অভিজ্ঞানসংখ্যা যথাক্রমে ২৬৮(৪), ২৬৮(৫), ২৬৮(৬)। ২৬৮(৫)-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি এই উপন্যাসের প্রথমাংশের দুই পৃষ্ঠার অতিরিক্ত প্রতিলিপিমাত্র। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উল্লিখিত তিনটি খাতার হস্তলিপি অপরের।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ 'ললাটের লিখন' রচনা করেন। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একাধিক পত্র হইতে রচনার ইতিহাস অনেকাংশে জানা যায়, পত্রগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ অতঃপর সংকলিত হইল—

> "একটা নতুন গল্প চলচে আর দু-তিন দিনে শেষ হবে। সকলে অপেক্ষা করছে,— শেষ হলেই শ্রীমুখ থেকে শুনবে— প্রথম শোনানির জন্য যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে সেই বুঝে ব্যবস্থা কোরো— এর বেশী বলতে সাহস করিনে। ইতি ১৮ এপ্রেল ১৯৩৩ [৫ বৈশাখ, ১৩৪০]
>
> দ্রষ্টব্য 'দেশ', ৯ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ৩১৫

> "...পাঁচ পয়সা গেছে চিঠিতে, টেলিগ্রামে ঠিক জানিনে কত, অন্তত বারো আনা... পুরো লোকসান। যাক্, কাল পড়া হয়ে গেল। যাদের জন্যে পাঁচ পয়সা খরচ করিনি খুশী হয়ে গেছে, বলেচে, পাওয়ারফুল। ফরমাস এসেচে ওটাকে ঢালাই করতে হবে নাট্যে। চেষ্টা করতে বসলুম।"
>
> রচনাকাল : ৮ বৈশাখ ১৩৪০, প্রকাশ : 'দেশ', ৯ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ৩১৫

নাট্যকে রূপান্তরের পরই রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারীকে জানাইলেন—

> "আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কলকাতায় যাচ্ছি। লেখাটা শেষ হয়েছে। যদি কিছুমাত্র ক্লান্তি বা অসুবিধা বা অবকাশ হানির কারণ না থাকে তবে তোমার বৈঠকখানায় ওটা পড়ে শোনাতে পারলে খুশী হব।... পড়তে পৌনে দু'ঘণ্টা লাগবার কথা।"
>
> রচনাকাল : ১৩ বৈশাখ ১৩৪০, প্রকাশ : 'দেশ', ৯ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ৩১৫

বরানগরে 'ললাটের লিখন'-এর নাট্যরূপ 'বাঁশরি' পড়া হইয়াছিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ 'ললাটের লিখন' মূল গল্পরূপের পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে একাধিক পত্রে নির্মলকুমারীকে যাহা লিখিয়াছিলেন, এখানে সেগুলি সংকলিত হইল—

"সঙ্কটে পড়েছি। ভারতবর্ষ-ওয়ালা ফরমাস করেচে সেই 'কপালের [ললাটের] লিখন' গল্পটা অর্থাৎ 'বাঁশরী'র পূর্বজন্মের লীলাটা তাদের আশ্বিনের সংখ্যার জন্যে। রথী কলকাতায় গিয়ে পেটের দায়ে তাদের কাছ থেকে তিনশো টাকার চেক পকেটে করে আমাকে এসে বলে— সেই গল্পটা দাও। আমি বাক্স, তোরঙ্গ, আলমারি, ডেস্ক, বালিশের নীচে, তক্তপোষের তলায়, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে খোঁজ করে পেলাম না— তিনশো টাকা পুনরুদ্‌গার করার মতো সাহস ও শক্তি নেই। এক একবার অত্যন্ত ঝাপসাভাবে মনে হচ্ছে খাতাটা হয়তো বা তোমার করকমলে আশ্রয় পেয়েছে— জোর গলায় বলতে পারচিনে— কেননা স্মরণশক্তির পরে আমার শ্রদ্ধামাত্র নেই। কিন্তু যদি সেখানা তোমার করুণ ছায়ায় রক্ষা পেয়ে থাকে তবে পত্রপাঠ মাত্র রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে মান রক্ষা করো— পোস্টেজের খরচ কত লাগলো জানবামাত্র সেই তিনশো টাকা থেকে তা শোধ করে দেব— এবং কাজ উদ্ধার হলেই খাতাটিকে পুনরায় তোমার হাতে সমর্পণ করে তার খাতাজন্ম সার্থক করে দেব।"

রচনাকাল : ৪ ভাদ্র ১৩৪০, প্রকাশ : 'দেশ', ১৬ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ৪০২-০৩

"তোমাকে একটা জরুরি চিঠি লিখেছিলুম, সেটা কি এখনো তুমি পাওনি? 'বাঁশরী' নাটকের গল্প আকারের প্রথম পাণ্ডুলিপিটা আছে কি তোমার হাতে? তার দাম পকেটে করেছি অথচ মাল চালান করতে পারছি না।"

রচনাকাল : ২৬ আগস্ট ১৯৩৩, প্রকাশ : 'দেশ', ১৬ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ৪০৩

"কয়দিন তোমার চিঠি না পেয়ে আজ সকালে রেগেমেগে কলমের মুখটা তীক্ষ্ণ করছিলুম— এমন সময় তোমার সৌভাগ্যক্রমে চিঠি এল 'শশিভূষণ ভিলা' থেকে। মনে মনে তোমাকে যে সব সম্ভাষণ করেছিলুম সে আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

রচনাকাল : ৩০ আগস্ট ১৯৩৩, প্রকাশ 'দেশ', ১৬ ভাদ্র, ১৩৬৮, পৃ. ৪০৩

'ললাটের লিখন'-এর পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতেছে না; তবে এই কাহিনীর নূতন করিয়া লিখিত 'পুনরুদ্ধার' নামে নাট্যরূপ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বাঁশরী' নামে কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩৪০ সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

'ললাটের লিখন'-এর একটি প্রতিলিপি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত ছিল বলিয়া পূর্ব উল্লিখিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পত্রিকায় প্রকাশ সম্ভবপর হয়।

## গল্প

### [ প্রায়শ্চিত্ত ]

প্রকাশ, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পঞ্চত্রিংশত্তম সংকলনে (২২ শ্রাবণ ১৪০৬)। কিশোরপাঠ্য এই গল্পটির 'প্রায়শ্চিত্ত' শিরোনাম প্রকাশকালে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক অনাথনাথ বসু-র (১৯০০-৬১) সংগ্রহ হইতে এই গল্পের প্রতিলিপি তাঁহার কন্যা শ্রীসুনন্দা বসু/দাস রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন। অনাথনাথ যখন পাঠভবনের অধ্যাপক রূপে কর্মরত

ছিলেন (১৯২৫-) সেই সময় রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তিনি বিদ্যালয়পাঠ্য সংকলন 'পাঠপ্রচয়' দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ ভাগ সম্পাদনা করেন। অনুমান করা যায়, পরবর্তীকালে তিনি কিশোরপাঠ্য একটি গ্রন্থ সংকলনে উদ্যোগী হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিলে, তিনি এই শিরোনামহীন গল্পটি পাঠাইয়াছিলেন। গল্পটি প্রাথমিকরূপ বলিয়াই মনে হয়। অনাথনাথ বসুকে ১৯৩৯ সালে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বয়স হয়েছে সে কথা আর অস্বীকার করতে পারিনে। চিঠি লেখা চিঠি পড়া এখন কষ্টসাধ্য। অত্যন্ত জরুরি ছাড়া কোনো অতিরিক্ত কাজের ভার নিতে ক্লান্ত মন সম্পূর্ণ বিমুখ। গল্প সংগ্রহের প্রস্তাব কিশোরীকে জানাব-- বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থনবিভাগের [ভার] তার উপরে— আমি আর মন দিতে পারিনে। ইতি ১৯।১।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রের সহিত [প্রায়শ্চিত্ত] গল্পের একটি সম্পর্কসূত্র আছে বলিয়া মনে হয়।

# বর্ণানুক্রমিক সূচী

# রবীন্দ্র-রচনাবলী

# সূচী

(ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খন্ড)

**পাঠসংকেত :**

| | |
|---|---|
| ভানু | = ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী |
| সং | = সংযোজন |
| ব্যক্তি | = ব্যক্তিপ্রসঙ্গ |
| গ্র.প. | = গ্রন্থপরিচয় |

# বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্র-রচনাবলী রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণের ১-২৭ খণ্ড ও অচলিত সংগ্রহ ১ ও ২ খণ্ড এই মোট ২৯টি খণ্ডের সমগ্র রচনা, যাহা সুলভ সংস্করণের ১-১৫ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে— বর্ণানুক্রমে তাহার সম্পূর্ণ শিরোনাম-সূচী ও প্রথম ছত্রের সূচী সুলভ সংস্করণের পঞ্চদশ খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। ঐ সূচী অংশে যে ক্রম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে তাহারও বিস্তৃত বিবরণ পঞ্চদশ খণ্ডের বিজ্ঞপ্তিতে আছে।

অতঃপর এযাবৎ রবীন্দ্র-রচনাবলী রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণের ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১ চারটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে— যাহা সুলভ সংস্করণের ১-১৫ খণ্ডের পর ১৬, ১৭ ও ১৮ তিনটি খণ্ডে সংযোজিত হইল।

এই নূতন সংযোজিত তিনটি (ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ) খণ্ডের অন্তর্গত সকল রচনার সূচী সুলভ সংস্করণের অষ্টাদশ খণ্ডে দেওয়া হইল।

এই সূচী দুই ভাগে বিভক্ত— প্রথম বিভাগটি প্রথম ছত্রের সূচী: ইহাতে রচনাবলীর অন্তর্গত কবিতা বা গানের প্রথম ছত্র, উক্ত রচনার শিরোনাম, রচনাটি কোন্ গ্রন্থে বা রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে কত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাহার নির্দেশ আছে। দ্বিতীয় বিভাগটি শিরোনাম-সূচী: রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় রচনার শিরোনাম-সূচী ইহাতে সংকলিত।

সূচীগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হইয়াছে। যে ক্রম ও পদ্ধতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণের পঞ্চদশ খণ্ডে ১-১৫ খণ্ডের সূচীতে অনুসৃত হইয়াছিল এ স্থলেও তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে। পাঠক এ বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য সম্পর্কে পঞ্চদশ খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি দেখিতে পারেন।

মার্চ, ২০০১

# প্রথম ছত্রের সূচী

কবিতা বা গানের প্রথম ছত্র ও শিরোনাম, উক্ত কবিতা বা গান কোন গ্রন্থে এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে ও পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাহার নির্দেশ দেওয়া হইল। শিরোনামহীন রচনার ক্ষেত্রে '-' চিহ্ন ব্যবহৃত।

| প্রথম ছত্র | শিরোনাম | গ্রন্থ/রচনা ।। খণ্ড ।। পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বচন নাহি তো মুখে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৫ |
| বচন যদি কহ গো দুটি | - | রূপান্তর ।। ১৬ ।। ১৪২ |
| বড়োই সহজ | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৫ |
| বড়োর দলে নাইবা হলে গণ্য | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৫ |
| বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৬ |
| বন্ধুগণ, শুন, রামনাম করো সবে | - | রূপান্তর ।। ১৬ ।। ১৫৮ |
| বর্ষণশান্ত পাণ্ডুর মেঘ | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৬ |
| বর্ষ পরে বর্ষ গেছে চলে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৮ ।। ২৩ |
| বলো গো বালা, আমারি তুমি | 'বলো গো বালা' | অনুবাদ কবিতা ।। ১৭ ।। ১১১ |
| বসন্তের ফুল তোরেই | এপ্রিলের ফুল | প্রহাসিনী (সং) ।। ১৬ ।। ২৭ |
| বসে বসে লিখলেম চিঠি | পত্র | কড়ি ও কোমল (সং) ।। ১৭ ।। ৮৫ |
| বহিয়া হালকা বোঝা | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৬ |
| বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর | অস্ত্রবিলাপ | রূপান্তর ।। ১৬ ।। ১২৪ |
| বহুদিন কেন তব সহাস্য | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৮ ।। ২৩ |
| বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা | পরমহংস রামকৃষ্ণ | কবিতা (ব্যক্তি) ।। ১৮ ।। ১১ |
| বাউল বলে খাঁচার মধ্যে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৭ |
| বাঙাল যখন আসে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৮ ।। ৩২ |
| বাঙালির চিত্তক্ষেত্রে, আশুতোষ | আশুতোষ মুখোপাধ্যায় | কবিতা (ব্যক্তি) ।। ১৮ ।। ৮ |
| বাঙালির প্রীতি অর্ঘ্যে | জলধর | কবিতা (ব্যক্তি) ।। ১৮ ।। ১৩ |
| বাক্য আর অর্থ -সম | রঘুবংশ | রূপান্তর ।। ১৬ ।। ১২১ |
| বাক্য তোমার সব লোকে বলে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৭ |
| বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে | - | সংগীতচিন্তা ।। ১৬ ।। ৫৪৬ |
| বাজে নিশীথের নীরব ছন্দে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৭ |
| বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে | - | রূপান্তর ।। ১৬ ।। ১৬২ |
| বাণী আমার পাগল হাওয়ার | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ।। ১৬ ।। ৫৮ |
| বাতাসে অশথপাতা পড়িছে খসিয়া | - | [অনূদিত কবিতা] ।। ১৬ ।। ২১২ |
| বারেক ভালোবেসে যে জন মজে | 'বারেক ভালোবেসে যে জন মজে' | অনুবাদ কবিতা ।। ১৭ ।। ১২৫ |
| বাঁশরি আনে আকাশবাণী | রেশ | বীথিকা (সং) ।। ১৬ ।। ২৪ |
| | - | গ্র. প. ।। ১৬ ।। ৬৮৪ |
| বাহিরে ও ঘরে মোর | - | রূপান্তর ।। ১৬ ।। ১৫৭ |

| প্রথম ছত্র | শিরোনাম | গ্রন্থ/রচনা ॥ খণ্ড ॥ পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে | - | সংগীতচিন্তা ॥ ১৪ ॥ ৫৪৭ |
| যে ছিল মোর ছেলেমানুষ | পুপুদিদির জন্মদিনে | বীথিকা (সং) ॥ ১৪ ॥ ২৩ |
| যে তোরে বাসেরে ভালো | বিসর্জন | [অনূদিত কবিতা] ॥ ১৬ ॥ ১৯৯ |
| যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে | - | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১৪০ |
| যেমন আমি সর্বসহা | - | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১০১ |
| যে মন টলে, যে মন চলে | চিত্তবর্গ | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১০৯ |
| যে মিলনে সংসারের | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৮ ॥ ৩২ |
| যেখানে জ্বলিছে সূর্য | হিমালয় | কবিতা ॥ ১৭ ॥ ৩৭ |
| যেমন-তেমন হোক মোর জাত | - | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১৩৩ |
| যে-লেখা কেবলি রেখা | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৮ ॥ ৩৭ |
| রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে | - | [অনূদিত কবিতা] ॥ ১৬ ॥ ২১০ |
| রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি | 'রানী, তোর ঠোঁট' | অনুবাদ কবিতা ॥ ১৭ ॥ ১২৫ |
| [র]াহু মেঘ হইয়া | - | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১৬৫ |
| রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি | সুপ্রভাত | পূরবী (সং) ॥ ১৪ ॥ ১০ |
| রুদ্র সমুদ্রের বক্ষ | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৪ ॥ ৬৫ |
| রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার | 'রূপসী আমার' | অনুবাদ কবিতা ॥ ১৭ ॥ ১১৩ |
| রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার | নন্দলাল বসু | কবিতা (ব্যক্তি) ॥ ১৮ ॥ ৬ |
| রেণু কোথায় লুকিয়ে থাকে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৪ ॥ ৫৬৫ |
| রৌদ্রী তপস্যার তাপে জ্বলন্ত বৈশাখে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৪ ॥ ৬৫ |
| লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন | - | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১০৬ |
| লিখন দিয়ে স্মৃতিরে কি | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৬ ॥ ৬৬ |
| লিখব তোমার রঙিন পাতায় | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৮ ॥ ১৯ |
| লীলাময়ী নলিনী | নলিনী | অনুবাদ কবিতা ॥ ১৭ ॥ ১১৬ |
| লেখন আমার ম্লান হয়ে আসে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৮ ॥ ৩০ |
| লেখা আসে ভিড় ক'রে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৬ ॥ ৬৬ |
| লেখা যদি চাও এখনি | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৮ ॥ ৩৮ |
| লেখার যত আবর্জনা | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৮ ॥ ৩৩ |
| [লোচ]ন অরুণ, ইহার ভেদ বুঝিতেছি | - | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১৭১ |
| লোভিত মধুকর কৌশল অনুসরি | - | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১৬৬ |
| শক্তিহীনের দাপনি | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৬ ॥ ৬৬ |
| শক্তির সংঘাত-মাঝে | - | স্ফুলিঙ্গ (সং) ॥ ১৬ ॥ ৬৬ |
| শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে | | রূপান্তর ॥ ১৬ ॥ ১২৩ |

# শিরোনাম-সূচী

কবিতা গান নাটক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতির শিরোনাম— কবিতা বা গানের ক্ষেত্রে শিরোনামের সহিত প্রথম ছত্র— রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে ও পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, মূল গ্রন্থ উল্লেখপূর্বক তাহার নির্দেশ দেওয়া হইল।

—

সুলভ সংস্করণ

মূল্য ১৩০·০০ টাকা
ISBN-81-7522-290-5 (V.18)
ISBN-81-7522-289-1 ( Set )